নিবেদিতা রচনা সংগ্রহ

তৃতীয় খণ্ড

বইপত্র ৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ
৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮

প্রকাশক
শ্রী তরুণ চক্রবর্তী
বইপত্র
৮/৩, চিন্তামণি দাস লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯

মুদ্রক
শ্রী রামমোহন বক্সী
জয়কালী প্রেস
কলিকাতা—৭০০০০৬

প্রচ্ছদ
শ্রী পূর্ণেন্দু পত্রী

গ্রাহক মূল্য—পাঁচ খণ্ডে মোট ৬০ টাকা

Nivedita Rachana Sangraha
The works of sister Nivedita
Vol. III

নিবেদন

নতুন করে কাগজের আকাল সুরু হল। বলাই বাহুল্য, এ-আকাল কৃত্রিম। এর সৃষ্টির প্রেরণা আসে বেশী, আরও বেশী মুনাফার লোভ থেকে। শিকার হন সবাই—বিশেষতঃ, ছোট-মাঝারি প্রকাশক সংস্থা এবং অবশ্যই পাঠকেরা। এই আকাল নিতান্তই সাময়িক। কাগজের দাম বাড়ে—আকাল আর থাকে না। এভাবে গত এক বছরের মধ্যেই কয়েক দফা কাগজের দাম বাড়ানো হয়েছে। এই অবস্থা প্রতিকারের কি কোন উপায় নেই?

নিবেদিতা রচনা সংগ্রহের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল কোনরকমে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেই। এই খণ্ডের আকারের সঙ্গে কাগজের আকালের কোন সম্পর্ক নেই। অনুবাদকদের কাছ থেকে সময়মত পাণ্ডুলিপি না পাওয়ায় এই খণ্ডটি আকারে ছোট হল। শেষ দুটি খণ্ড বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হবে।

এই খণ্ডে অনুবাদকার্যে সহায়তা করেছেন সর্বশ্রী মনোরঞ্জন ঘোষ, অহীন্দ্র মিশ্র, জ্যোতির্ময়ী চৌধুরী ও মনোশ্রী লাহিড়ী, এঁদের সকলেই ধন্যবাদার্হ।

৭ই নভেম্বর, ১৯৭৮
৮/৩, চিন্তামনি দাস লেন,
কলিকাতা—৭০০০০৯

বিনীত
তরুণ চক্রবর্তী
প্রকাশক-পক্ষে

সূচীপত্র

RAMAYANA

রামায়ণ-চক্র

খ্রীষ্টান জগতের নারীদের কাছে কুমারী মেরী যেমন পবিত্র, তেমনই হিন্দুধর্মেও অযোধ্যার রানী সীতা পবিত্র। সত্যই, এই এক জগৎ, কেবলমাত্র পার্থিব প্রাপ্তি-জণিত সকল লোভ ও লালসার উর্ধ্বে। কারণ, তিনি নারীত্বের মূর্তিমতী আদর্শ, প্রেম ও দুঃখের জগতে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে তাঁর নিষ্কলংক সতীত্ব ও মহিমার প্রভাব অবিসংবাদিত সত্য। যদিও তিনি সুন্দরী এবং রানী ছিলেন, তবু, তিনি কোনদিন আরাম চান্‌নি। তাঁর জীবনে সাধু ও পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছিলেন প্রাসাদের সব বিলাসিতা অপেক্ষাও আনন্দের কারণ। অরণ্যের প্রতিটি ভাবের সংগে তাঁর পরিচিতি ছিল। তাদের প্রভাত-সূর্যের বন্দনা গান, পাখীদের কলকাকলি, ফুলগুলির পাপড়ি মেলা ও নূতন শিশিরের সজীবতা ও সন্ধ্যার প্রশস্তির সংগে তাঁরও ছিল আত্মার নিবেদন। স্বামীর সিংহাসনে তাঁরও অংশ ছিল, কিন্তু কখনো ভুলতে পারতেন না জনকল্যাণের কথা, ভুলতেন না যে, রাজ্যশাসন নিজের আনন্দের জন্য নয়। তিনি মানুষের সর্বোচ্চ সুখের কথা জানতেন, কিন্তু সুখের মোহে অন্ধ ছিলেন না। তিনি জানতেন, গভীরতম ও তিক্ততম দুঃখের পরিচয়, কিন্তু, দুঃখের মধ্যেও ছিল তাঁর প্রশান্তি। প্রেমে বিজয়িনী, দুঃখে অবগুণ্ঠিকা ও নারীজাতির মধ্যে তুলনাহীনা, এই ছিলেন অযোধ্যার রানী সীতা।

অযোধ্যা নগর

কাশীর উত্তরে গঙ্গা নদী ও হিমালয় পর্বত শ্রেণীর মাঝখানে বিস্তৃত ভূখণ্ডের নাম আজকাল অযোধ্যা, বহুকাল আগে যে এলাকার নাম ছিল কোশল। বোধ হয় সারা পৃথিবীতে এমন সুন্দর দেশ খুব কমই ছিল। এই দেশ ছিল শস্য সমৃদ্ধ, প্রাচুর্য ছিল গবাদি গৃহপালিত পশুর ও অরণ্যের। এই ভূখণ্ডের সকল অধিবাসীর ছিল সমৃদ্ধি ও তারা বাস করতো শান্তিতে। কোশল রাজ্যের মধ্যে ছিল বড় বড় নদী, সুন্দর সুন্দর তীর্থস্থান, আর অনেক বড় বড় সব সম্ভ্রান্ত নগর। কোশলের চারদিক ঘিরে ছিল শক্তিশালী রাজা ও রাজত্বগুলি। কিন্তু সব রাজত্বের মধ্যে অযোধ্যাই ছিল মধ্যমণি ও সব রাজ্যের বিস্তৃত পরিধির মাঝখানে অবস্থিত। সহরগুলির মধ্যে অযোধ্যা ছিল রানীর মতো, তার চারপাশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা ও দুর্গপরিখায় বেষ্টিত, অসংখ্য প্রতীক ও পতাকায় সজ্জিত, বিরাট সব জমকালো বাড়ী ও দুর্গশোভিত। এই ছিল কোশলের রাজধানী অযোধ্যার অপূর্ব মনোহর রূপ। শ্রদ্ধা জানাতে এসে অযোধ্যায় ভীড় জমে থাকতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলির রাজাদের, অবাধ গতিবিধি ছিল ব্যবসায়ী ও শিল্পীদের, যারা আসতো দূর দূর দেশ থেকে। রাজপ্রাসাদ, রাজোদ্যান, বাগান ও ফলের বাগান অযোধ্যাকে ঢেকে ছিল। অযোধ্যা তার সম্পদ ও জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্রাচুর্য ছিল চাল ও মণি মুক্তার, কুয়ো আর ঝরণাগুলি ছিল আখের রসের মত মিষ্টি

জলে পূর্ণ। রাস্তাগুলি ছিল চওড়া, সব সময় সেগুলিকে জল ঢেলে পরিষ্কার রাখা হোত, এবং ফুল ছড়ানো থাকতো এলোমেলো। সত্যই, কোশল দেশের মধ্যে অযোধ্যা ছিল স্বর্গে ইন্দ্রের অমরাবতীর মতো সুন্দর।

অযোধ্যার মতো তার নাগরিকরা ও তাদের ছেলেমেয়েরা ছিল সুন্দর ও প্রিয়। এসব ছাড়াও অযোধ্যার আর একটি জিনিস ছিল, যার মূল্য তাদের কাছে ছিল সকলের উর্ধ্বে। কেমন করে একজন স্বর্গীয় রাজা অতীতে তাদের দেশ শাসন করতেন, সেই স্মৃতি তারা পোষণ করতো মনে মনে। দীর্ঘ বহু যুগ আগে এই অযোধ্যার সিংহাসনে বসে দেশ শাসন করতেন রাম, যিনি ছিলেন স্বয়ং ভগবান। এরূপ কাহিনী প্রচলিত ছিল যে, ভগবান বিষ্ণু ইচ্ছা করেছিলেন, পৃথিবীর মানুষের সামনে একজন আদর্শ রাজার পরিচয় রেখে যাবেন, তাই তিনি নিজে দেহধারণ করে এসেছিলেন মাটির পৃথিবীতে, এবং লক্ষ্মী, তাঁর স্বর্গের স্ত্রী, বিষ্ণুর হৃদয়ের চিরন্তনী নারী, রামের পত্নী সীতার দেহ ধারন করেছিলেন। এবং মাত্র এক পুরুষের মর-জীবনে রাম ও সীতা পরিপূর্ণ পুরুষত্ব ও নারীত্বের আদর্শ পৃথিবীর মানুষের সামনে রেখে গিয়েছেন।

ভাগ্যের পথ রহস্যময়, এবং মানুষ ও দেবতাদের জীবনে কী বিস্ময়কর পার্থক্য! নিশ্চয়ই, এই কারণে এই দুটি রাজকীয় জীবন ছিল দুঃখে পরিপূর্ণ। তবু, এক মুহূর্তের জন্যও রাম এবং সীতা ভুলতে পারতেন না যে, প্রজাপুঞ্জের কল্যাণেই রাজার সর্বোচ্চ মঙ্গল। তাই, আজও অযোধ্যার প্রজা সাধারণের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে রাম রাজত্বের কথা। এবং, তাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দিয়ে প্রার্থনা করে, সেই দিনগুলি আবার ফিরে আসুক।

* * *

যুবরাজ রাম ছিলেন রাজা দশরথ ও রানী কৌশল্যার জ্যেষ্ঠ সন্তান। রাম উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছিলেন ও সবরকম খেলাধুলা এবং বীরত্বের পারদর্শিতায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন। তাঁর সৎ ভাই লক্ষ্মণের সংগে তিনি সে যুগের অন্যতম প্রধান একজন জ্ঞানীর নেতৃত্বে তাঁদের সমগ্র রাজ্যের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে দৈত্য দানব ও দস্যুদের তাদের শক্তঘাটি থেকে সম্পূর্ণ মূলোচ্ছেদ ও ধ্বংস করে দিতে সফল হয়েছিলেন। এই দৈত্য দানবেরা কোশল রাজ্যের সহর ও আশ্রমগুলির শান্তি দীর্ঘকাল ধরে নষ্ট করে আসছিল। এই বিজয় অভিযানের শেষে রাম ও লক্ষ্মণকে মিথিলার রাজা জনক বিরাট সম্মানের সংগে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন ও তাঁর দুই মেয়ে সীতা ও উর্মিলার সংগে বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে তাঁদের বাবা রাজা দশরথও মিথিলায় গিয়ে রাম ও লক্ষ্মণের সংগে মিলিত হয়েছিলেন ও তাঁদের সংগে নিয়ে তাঁর বাহিনীর সংগে ফিরে এসেছিলেন অযোধ্যা।

এর পরের কয়েকটি বছর কী সুখস্বপ্নের মধ্যেই না কেটে গেল! পিতার সকল ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করে যুবরাজরা তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করে আসছিলেন

যোগ্যতা ও মর্যাদার সংগে। বিশেষতঃ রাম তাঁর সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য জনসাধারণের বিশেষ আনন্দের পাত্র ছিলেন। প্রজাপুঞ্জের আনন্দবিধান ও তাদের কল্যাণই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য ও সহরের শাসনকাজের পরিচালনা করতেন যথেষ্ট সতর্কতা ও মনোযোগের সংগে। তাঁর জ্ঞানসমৃদ্ধ মন ও সমগ্র হৃদয় তরুণী পত্নী সীতার হৃদয়ে নিবেদিত ছিল। রাম আনন্দে সীতার মধুর সাহচর্যের মধ্যে কাটাতেন দীর্ঘসময়। সীতা রামকে মুগ্ধ করে রেখেছিলেন যতখানি তাঁর কমনীয়তা দিয়ে ততখানি তাঁর মর্যাদা ও মহত্ব দিয়ে, এবং তাঁর কমনীয়তা অপেক্ষা সততা দিয়ে আরও অনেক বেশি। আর, সীতাও তাঁর পূর্ণ সহানুভূতি ও করুণার শক্তিতে রামের প্রতিটি চিন্তার মধ্যে স্থান করে নিতে পেরেছিলেন। সুতরাং, পত্নীত্বের বন্ধন যেমন ছিল আনন্দের, তেমন কর্তব্যেরও। যারা রাম ও সীতা দুজনকে একসংগে দেখতো, তারা মনে করতো তাঁরা যেন একই আত্মা ও অবিচ্ছেদ্য, যেমন স্বর্গের লক্ষ্মীশ্রী মানুষের কল্পনায় ভগবান বিষ্ণু থেকে অবিচ্ছিন্ন।

এখন, রামকে ধার্মিকতায় পূর্ণ ও অশেষগুণে ভূষিত দেখে বৃদ্ধ রাজা দশরথের মনে আকাঙ্ক্ষা জাগলো, মৃত্যুর আগেই তিনি রামকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করে যাবেন। এই সময় রাজদরবারের জ্যোতিষীরা কতকগুলি অমঙ্গলসূচক পূর্বলক্ষণের আভাস পেয়েছিলেন, যার অর্থ, অদূরে ভবিষ্যতে কিছু অশুভ ঘটনা ঘটতে পারে ও রাজপুরুষদের মৃত্যুও হতে পারে। এইসব শুনে রাজা দশরথ আরও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন ও চিন্তা করেছিলেন, রামের রাজ্যাভিষেক আর দেরী না করে যতশীঘ্র সম্ভব শেষ করা উচিত। সুতরাং, তিনি তাঁর সামনে মন্ত্রীসভাকে ডেকে পাঠালেন ও যখন সব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা ও মন্ত্রীরা সমবেত হলেন, তিনি তাঁদের সকলের কাছে তাঁর মনের কথা খুলে বললেন এবং উপদেশ চাইলেন। তিনি শান্তভাবে বললেন, তাঁর বক্তব্য শেষ করার পর, "এমনও হতে পারে, আমার ব্যাকুল ইচ্ছা ও আমার ক্লান্তি আমার বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। কিন্তু, আমি ভালভাবে বিশ্বাস করি যে, কোন সম্মেলনে উপস্থিত বহুজনের কণ্ঠস্বর থেকে সত্যের অভিব্যক্তিই ঘটে থাকে।"

রাজা যখন কথা বলা শেষ করলেন, তখন সভাগৃহে সংযত শব্দের অনুরণন শোনা গেল, অনেক মানুষ একসংগে মৃদুস্বরে কথা বললে যেমন মনে হয়। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা, ব্রাহ্মণরা, মন্ত্রীমণ্ডলী ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ সকলেই রাজার এই নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে আস্তে আস্তে আলোচনা করছিলেন। অবশেষে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে এসে তাঁরা তাঁদের নিজেদের মুখপাত্র নিযুক্ত করে তাঁর মাধ্যমে ঘোষণা করলেন রাজা দশরথের সব ইচ্ছার প্রতি তাঁদের সহানুভূতি ও সম্মতির কথা। এই ঘোষণার শেষে যখন সমবেত ভদ্রমণ্ডলী তাঁদের সম্মতির প্রমাণস্বরূপ সকলেই দু'হাত জড়ো করে মাথার উপর তুললেন, তখন অনেকগুলি পদ্মফুলের মত মনে হোল। রাজা বর্ণনাতীত আনন্দ ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তিনি সংবাদবাহক পাঠিয়ে রামকে আদেশ দিলেন মন্ত্রণা-সভার সামনে উপস্থিত হতে। রাম উপস্থিত হয়ে যথারীতি

শ্রদ্ধা জানানোর পর রাজা দশরথ তাঁকে পরের দিনই তাঁর ঠিক পরবর্তী উত্তরাধিকারী হিসাবে অভিষিক্ত করার ইচ্ছার কথা জানালেন। তারপর, রাম তাঁকে আবার অভিবাদন করলেন। দশরথ সভা ভেঙে দিয়ে আসন্ন উৎসবের জন্য প্রস্তুত হওয়ার কাজ আরম্ভ করলেন।

সভাসদরা ও উচ্চপদস্থ গৃহ-কর্মচারীরা ছত্রভঙ্গ হতে না হতেই রাজা তাঁর বিশ্রাম কক্ষে ফিরে এসে ছেলেকে আর একবার ডেকে পাঠিয়ে তাঁর সংগে দীর্ঘসময় ধীরস্থিরভাবে নিজের ভবিষ্যৎ ইচ্ছা, আসন্ন রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান ও ভবিষ্যৎ কার্যধারার সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলেন ও শেষে রামকে একথাও স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না যে, আগামীকালের জন্য রাম ও সীতা দুজনেই যেন প্রার্থনা ও তপস্যার মধ্যে আজ রাত্রি যাপন করেন। দশরথের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাম তাঁর প্রাসাদে যাওয়ার আগে তাঁর মা কৌশল্যার কাছে গিয়ে তাঁর আশীর্বাদ ও উপস্থিতি প্রার্থনা করলেন। সেখানে রাজপুরোহিত তাঁকে সেদিনের সান্ধ্য অনুষ্ঠানগুলির জন্য যথাযথ উপদেশ দিলেন ও বাকি সময়টা রাম ও সীতা সেইভাবেই কাটালেন সেদিন।

অভিষেকের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো সারা অযোধ্যা সহরে। রাস্তা-ঘাটে আবেগে উত্তেজিত জনতার ভীড় জমে গেল। প্রতিটি বাড়ী সাজানো হোল দীর্ঘ পতাকায়, সেগুলি উড়তে থাকলো বাতাসে। সহরের ছাদ ও বারান্দাগুলি দলে দলে পাহারাদার ভরে ফেললো। ফুলের মালা, ধূপ ও ঝাড় লণ্ঠনগুলি নিয়ে আসা হোল প্রতিটি রাস্তার শোভাবৃদ্ধির জন্য। এমনকি সহরের স্ফুর্তিবাজ ছেলেরাও খেলাধূলা বন্ধ করে দিয়ে অগামীকাল যুবরাজের সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার আলোচনাতেই মগ্ন হয়ে গেল।

এইসব আনন্দ উৎসবের মধ্যেও দশরথের মনে একটা অদ্ভুত অস্থিরতা। আগের রাত্রে তিনি যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা যে অশুভ লগ্নে জাত, একথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারছিলেন না। তিনি শুধু অভিষেক অনুষ্ঠান দ্রুত শেষ করার জন্য চঞ্চল হয়ে পড়েছিলেন, তার কারণ, তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ভরত এখন সহর থেকে দূরে, যিনি রামের সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের কারণ হতে পারেন, এই অদ্ভুত অশুভ পূর্ব লক্ষণের আশঙ্কা তাঁর মনকে পীড়িত করে তুলছিল। ভরত তাঁর কর্তব্য কর্মে কোনদিন ত্রুটি করেননি, রাজাও কোনদিন তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে করেননি সন্দেহ। তবু, তিনি বুঝতে পারলেন না, কেন, কে যেন তাঁর কানে কানে বলে দিল, ভরতের অনুপস্থিতিতেই রামের রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান মঙ্গলজনক হবে।

দশরথের প্রাসাদে তাঁর ছোট রাণী কৈকেয়ীর মহলে একজন কুঁজী দাসী ছিল, যার স্বভাব ছিল হিংসুটে। কোন কাজে কুঁজী দাসী রাজপ্রাসাদের বাইরে গিয়েছিল, ফিরে প্রাসাদে ঢোকার পথে দেখলো রাজপ্রাসাদ যেন চাঁদের আলোর মতো ঝলমল করছে, গোটা অযোধ্যা সহর ডুবে গিয়েছে কাজের মধ্যে, রাস্তাঘাট ধোয়া পরিষ্কার, তার পর ছড়ানো পদ্মের পাপড়ি, আবার দীর্ঘ পতাকা দিয়ে সাজানো। সে আরও দেখলো,

সদ্য স্নান করা পূজারীর ভীড়, শুনতে পেল সবাই আনন্দে ভজন গাইতে গাইতে চলেছে। সব মন্দিরের দরজার মুখে সাদা রংয়ের গুঁড়ো ছড়ানো, আর, সব জলাধার থেকে চন্দন কাঠের গন্ধ ভেসে আসছে। কোন সন্দেহ নাই, সহরটা যেন অপ্রত্যাশিত আনন্দের উৎসবে মেতে উঠেছে, আর, কুঁজীরও বুঝতে দেরী হোল না, এর আসল কারণটা কী।

এই কুঁজী দাসীর মাধ্যমেই কৈকেয়ী রামের আসন্ন অভিষেকের কথা জানতে পারলেন। প্রথমে এই খবর পাওয়া মাত্র তরুণী রাণী খুব খুসী হলেন ও তাঁর দাসীকে একটি মূল্যবাণ সুন্দর রত্ন উপহারস্বরূপ ছুঁড়ে দিলেন তাঁর আনন্দের প্রমাণ হিসাবে। কিন্তু, কুঁজী জানতো কি উপায়ে তার কর্ত্রীর মন বিষিয়ে দিতে হয়। একঘণ্টা কি দু'ঘণ্টা পরে রামের সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা নিজের মুখে বলার জন্ম দশরথ কনিষ্ঠা রাণীর ঘরে এলেন, রাজাকে অবাক করে দিয়ে ভৃত্যেরা জানালো, রাণীকে যদি পেতে হয়, তবে তাঁকে সেই ঘরে যেতে হবে, যে ঘরে রাণী রাগ করে শুয়ে আছেন।

রাজা সেই ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখলেন, তাঁর প্রেয়সী স্ত্রী খোলা মেঝের উপর পড়ে আছেন স্বর্গচ্যুতা পরীর মতো। তাঁর গলার মালা ও অলঙ্কার দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তিনি। পোশাক পরিচ্ছদও পরিচ্ছন্ন নয়। তাঁর মুখের ভাব ক্রোধের কালো মেঘে ঢাকা, মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারে আবৃত আকাশ ও নক্ষত্রগুলি ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

নরম মেঘে ঢাকা আকাশে যেমন চাঁদ ওঠে, রাজা দশরথও সেইভাবে কৈকেয়ীর প্রাসাদের মধ্যে ঢুকলেন। অরণ্যের মধ্যে বিরাট হাতীর মতো তিনিও তাঁকে খুঁজে বার করলেন সেই ঘরের মধ্যে এবং নম্রভাবে তাঁর কপালে চুলে হাত বুলিয়ে জানতে চাইলেন, রাণীর শান্তির জন্ম তিনি কি করতে পারেন। বারবার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, রাণী যা চাইবে রাজার কাছে তা ব্যর্থ হবে না।

এবার কৈকেয়ী উঠে দাঁড়িয়ে চন্দ্র সূর্য, দিবা রাত্রি, আকাশ, নক্ষত্র, পৃথিবী সবাইকে আহ্বান জানালেন রাজার প্রতিশ্রুতির সাক্ষী হওয়ার জন্যে। এরপর তিনি রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, একবার যুদ্ধের সময় তাঁর শিবিরে সেবা শুশ্রূষা করে আহত রাজার জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি, আর, রাজা প্রতিদানে তাঁকে সে সময় দুটি বর দিতে চেয়েছিলেন। আজ, তিনি সেই দুটি বর দাবী করছেন রাজার কাছে। তাঁর ইচ্ছা, এক বরে রাজা রামকে চোদ্দ বছরের জন্ম বনবাসের আদেশ দিয়ে তাঁকে নির্বাসিত করুন, আর এক বরে ভরতকে উত্তরাধিকারী করে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করুন।

প্রথমেই রাজা ঘৃণা ও ক্রোধের সংগে রাণীর এই উদ্ভট অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। রাজা কৈকেয়ীর স্বাভাবিক আচরণের মাধুর্য ও মর্যাদার সংগে বর্তমানের এই অস্বাভাবিক ব্যবহারের তুলনা করে বিস্ময়ের সংগে ভাবলেন, রাণী পাগল হয়ে গিয়েছেন কি না। শেষে, তিনি অনেক যুক্তি দেখিয়ে ও প্রতিবাদ করে রাণীকে তাঁর অনুরোধ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্ম চেষ্টা করলেন। তাঁর এই তরুণী ও সুন্দরী পত্নীর প্রতি, বিশেষ করে তাঁর তিন রাণীর মধ্যে কৈকেয়ীর মোহিনী শক্তির জন্ম রাজা

যে বিশেষ অনুরাগ পোষণ করতেন, এখন তাঁর মনে হোল এর দ্বারা রামের মায়ের প্রতি তাঁর অবিশ্বাসের কাজ করা হয়েছে। তিনি ভাবলেন, হয়তো তাঁর এই আচরণ বড় রাণীর নিঃসঙ্গ বেদনার কারণ হয়ে থাকতে পারে। তিনি দেখলেন, তাঁর গোটা জীবনটাই একটা ভুল। তিনি ঈশ্বরের করুণার জন্য মনে মনে প্রার্থনা জানালেন।

কিন্তু কৈকেয়ী তাঁর বর্তমানের নিষ্ঠুর মনোভাবের প্রতি অটল থাকলেন। তিনি রাজাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের নীচতার কথা। বারবার তিনি জিদ্ করতে লাগলেন, রাজা যে প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে প্রতিজ্ঞা তাঁকে রাখতেই হবে। কৈকেয়ী সকালেই সংবাদ বাহক পাঠিয়ে রামকে দশরথের সামনে যতশীঘ্র সম্ভব হাজির হওয়ার নির্দেশ পাঠালেন। তিনি নিজেও সেখানে উপস্থিত থাকবেন। যথাসময়ে রাম এসে দশরথের সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম জানালেন। কৈকেয়ী দাঁড়িয়ে ছিলেন রাজার আসনের পিছনে। নিদারুণ মর্ম যন্ত্রনায় জর্জর দশরথ রামের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে জানতে চাইলেন, তাঁর একটি অঙ্গীকার পূরণ করার মত শক্তি রামের আছে কিনা।

রাম বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন, তিনি তাঁর পিতা ও রাজা দুই-ই। তাঁর জন্য তিনি আগুনে ঝাঁপ দিতে পারেন, এমনকি মৃত্যুবিষও পান করতে পারেন। রামের এই মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় পেয়ে স্বামীর কাতর আর্তনাদ ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কৈকেয়ী রামকে ঐদিনই রাজ্য ত্যাগ করে চলে গিয়ে চোদ্দ বছর বনে বাস করার আদেশ দিলেন। রামকে বনে কঠোর তপস্বীর জীবন যাপন করতে হবে, আর এই চোদ্দ বছর ভরত সিংহাসনে বসে রাজ্য শাসন করবে, একথাও জানিয়ে দিলেন কৈকেয়ী রামকে।

এই আদেশ শোনার পর রামের মুখের উপর একবিন্দুও ছায়াপাত হোলনা। এমনকি, সেদিন রাজপ্রাসাদের বাইরে যারা তাঁকে কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছিল, তারাও তাঁর মধ্যে কোনরকম মানসিক কষ্টের এতটুকুও চিহ্ন প্রত্যক্ষ করেনি। রাজার দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে, কৈকেয়ীর সংগে এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত হয়ে রাম তাঁর বাবার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে তাঁকে সান্ত্বনা দেওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা করার পর আনন্দিত মনে বিমাতার কাছে প্রতিশ্রুতি পালনের শপথ নিলেন ও যেমন আনন্দের সংগে এসেছিলেন, সেইভাবেই বিদায় নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে চলে গেলেন।

রাণী কৈকেয়ীর কথা শুনেই রাম বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর কথাগুলি পেছন থেকে অন্য এক অদৃশ্য শক্তির প্রতিধ্বনি মাত্র। রাম কোনদিনই সম্মান দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর নিজের মা ও কৈকেয়ীর মধ্যে কোন পার্থক্য করেননি। কৈকেয়ীও কোনদিন তাঁর স্নেহের জগতে নিজের ছেলে ভরত ও রামের মধ্যে কোন তফাৎ রাখেননি। সেই তিনি, একজন রাজার কন্যা ও রাজার স্ত্রী, স্বাভাবিক ভাবে অপূর্ব স্বভাব ও উচ্চস্তরের মার্জিত রুচিসম্পন্না হয়েও তাঁর স্বামীর উপস্থিতিতে যেরূঢ় ও নির্মম ভঙ্গীতে কথা বলেছেন, তা অতি সাধারণ স্তরের নারীর মতো! রামের কাছে এ অতি দুর্বোধ্য মনে হয়েছে। তিনি সবই অদৃষ্টের খেলা মনে করে ঐ চিন্তা মন থেকে দূরে সরিয়ে দিলেন। তিনি

বুঝেছিলেন, এর উপরে কৈকেয়ী কিংবা তাঁর কারও নিয়ন্ত্রণ নাই। সুতরাং, তিনি প্রস্তুত হলেন। রাজ্যাভিষেকের জন্য ভৃত্যদের বয়ে নিয়ে আসা সারিবদ্ধ জলের পাত্রগুলি দেখে তিনি লক্ষ্মণের সংগে শান্তভাবে হেসে বললেন, বরং আমি নিজে কুয়ো থেকে যে জল নিয়ে এসেছি, আমার সন্ন্যাসব্রত অনুষ্ঠানের পক্ষে তা আরও বেশী উপযোগী হতে পারবে আজ।

রাম ভালভাবেই জানতেন যে, সিংহাসনের জীবন ও আরণ্যের জীবন এই দুটির মধ্যে অরণ্যের জীবন আরও বেশী গৌরবজনক। খুশী মনে দেরী না করেই তিনি প্রাসাদ ত্যাগ করে যেতে প্রস্তুত হলেন। লক্ষ্মণ রামের অনুকূলে দশরথের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করতে পারতেন, নিজের ছেলেকে রক্ষা করার জন্য কৌশল্যা কৈকেয়ীর সংগে শক্তি পরীক্ষায় নামতে পারতেন। কিন্তু রাম, মুহূর্তের জন্যও যাঁর মন একবিন্দু বিচলিত হয়নি, তিনি সব বিরোধিতাকে শান্ত ও সংযত করে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর সিদ্ধান্তই শেষ কথা। রাজার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেই হবে।

সীতা তাঁর অন্দরমহলের ভিতরের ঘরগুলিতে সকালে বেশ কয়েক ঘণ্টা পূজা করে কাটিয়েছেন এবং এখন তাঁর স্বামীর ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তাঁর মনে এই আশা যে, স্বামী যথারীতি রাজ্যাভিষেক শেষ করেই ফিরবেন, তাঁর মাথার উপর ধরা থাকবে রাজছত্র ও অসংখ্য পরিচারক তাঁকে ঘিরে থাকবে। কিন্তু, এসব কিছুই দেখা গেল না। বরং, এ সবের পরিবর্তে রামকে ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে ঢুকতে দেখা গেল। সীতার প্রতি দৃষ্টিতে যেন অপ্রতিরোধ্য আবেগের চিহ্ন। শিথিল ভঙ্গীতে তিনি সীতাকে বললেন, এই তাঁদের শেষ বিদায়। তাঁকে এই মুহূর্তে বনে চলে যেতে হবে ও চোদ্দ বছরের জন্য নির্বাসনে কাটাতে হবে।

স্বামীর কাছ থেকে তাঁকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হবে এই চিন্তায় সীতার দু'চোখ থেকে ফোয়ারার মত জল বেরিয়ে এল। কিন্তু তিনি যখন সব কারণ শুনলেন, তখন তার প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে পেলেন। তাঁর কাছে অরণ্য জীবন কোন ভীতিপ্রদ ব্যাপার নয়, সিংহাসন হারানো নয় কোন দুঃখের ব্যাপার, যদি স্বামীর অনুগামিনী হয়ে তাঁর জীবনের ও সব দুঃখ কষ্টের অংশভাগিনী হয়ে থাকতে পারেন।

শেষে এই ব্যবস্থাই ঠিক হোল। রাম সীতা লক্ষ্মণ তিন জনেই দশরথের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিদায় নিলেন। কৈকেয়ীর হাত থেকে নিলেন কঠোর সন্ন্যাস-জীবনের পোশাক। তারপর তাঁরা চলে গেলেন বনবাসে নির্বাসন জীবনে।

এর কিছুদিন পরে যখন কৈকেয়ীর ছেলে ভরত ফিরে এলেন অযোধ্যায়, দেখলেন, তাঁর বাবা দশরথ শোকে দুঃখে মারা গিয়েছেন। অনুসন্ধান করে ভরত যখন সব ঘটনা জানতে পারলেন, কেন এবং কার জন্য সব শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে, তখন প্রচণ্ড ক্রোধে তিনি সেই কুঁজী দাসীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং মেয়ে হলেও তাকে প্রায় মেরেই ফেলতেন, যদি না সে শেষে মরীয়া হয়ে রাম নাম উচ্চারণ করে পরিত্রাণ পেত।

যখন তরুণ যুবরাজ ভরতকে বলা হোল যে, এ রাজত্ব তাঁরই, তখন ক্রোধে ও লজ্জায় তিনি কোন কথাই বলতে পারলেন না। কারণ, ভরতের চোখে তাঁর দাদা রামের চেয়ে এত প্রিয় আর কেউ ছিলেন না। রামের প্রতি তাঁর আনুগত্য এত গভীর ও পবিত্র ছিল যে, রামকেই তিনি রাজা হিসাবে স্বীকার করে নিলেন।

সুতরাং, ভরত রাজছত্রের ছায়ায় সিংহাসনের উপর রামের পাদুকা যুগল রেখে অযোধ্যা থেকে চলে গিয়ে নন্দীগ্রামে বাস করতে আরম্ভ করলেন, এবং সেখান থেকেই দাদার নামে চালাতে থাকলেন রাজ্য শাসনের কাজ। ভরতের আদেশে রাজ্যের সকলে রামকেই সম্রাট হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে ও রামের মা কৌশল্যাকে মহারাণী রূপে শ্রদ্ধা জানাতে থাকলো। ফলে মহারাজার মায়ের ভূমিকা পালনের কোন সুযোগ বা সুখ পেলেন না ভরতের মা কৈকেয়ী।

বলপূর্বক সীতার বন্দীকরণ

রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনবাসের দিনগুলি কী আনন্দময়ই না ছিল! তাঁরা যেখানেই গিয়েছেন, আশ্রম বাসী সাধু সন্ন্যাসীর দল তাঁদের অভ্যর্থনা জানিয়েছেন ও তাঁরা অরণ্যের জীবন ধারায় অধিকার লাভ করেছেন। এইভাবে তাঁরা দ্রুত অন্যান্য তপস্বীর মতো পাতার তৈরী কুঁড়েঘর ও মেজের উপর পবিত্র ঘাসের গালিচা পেতে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়েছেন। তাঁরা তাঁদের পূজার উপকরণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের ক্ষুদ্র একটি ভাণ্ডারের ব্যবস্থাও দ্রুত করে ফেলেছেন। সীতাও খুব বেশী দেরী না করে, যে কোন সাধারণ কৃষক রমনীর মতো রান্নার কাজে অভ্যস্ত হয়েছেন। তিনি তাঁর সুন্দর দুটি হাত দিয়ে স্বামী ও দেবরকে তাঁর নিজের হাতে রান্না করা খাবার পরিবেশন করতেন। তাঁদের বনবাসের প্রথম বছরগুলিতে প্রায়ই এমন হোত যে, যখন তাঁরা বড় বড় মুনি ঋষির সংস্পর্শে আসতেন, তাঁরা প্রথম দর্শনে রামকে দেখেই স্বয়ং ভগবান বলে চিনে ফেলতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় তাঁদের সাধারণ তপস্বীদের সংগে সাক্ষাৎ ঘটতো, যাঁরা রাম ও লক্ষ্মণের ক্ষমতার কথা জানতেন। তাঁরা প্রায়ই করজোড়ে রাজকুমারদের কাছে প্রার্থনা জানাতেন, বনের দৈত্য দানব ও দস্যুদের হাত থেকে তাঁরা যেন রক্ষা করেন। কারণ, এই সব দস্যু ও দানবরা আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীদের জীবন বিঘ্নসঙ্কুল করে তুলেছিল।

সশস্ত্র রাম ও লক্ষ্মণ বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে সর্বত্র দৈত্যকুল হত্যা এবং তাদের শারীরিক পঙ্গু করে দিতে লাগলেন। এই কারণে, সব অশুভ শক্তি তাঁদের শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। আর, বহুদূরে লঙ্কাদ্বীপে দানবরাজ দশানন রাবণ প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি রামের মৃত্যু ও ধ্বংস ঘটাবেন-ই।

যখন দিনের শেষে রাজ-সন্ন্যাসী দু'ভাই বনের ছায়ায় বসে অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখা দেখতে দেখতে উচ্চাংগের আলোচনা করতেন, আর, সীতা বসে বসে

বনের পাখীদের খাওয়াতেন ও কাঠবিড়ালদের ডেকে তাঁর হাত বা ঠোঁট থেকে খাবার নিয়ে যেতে বলতেন; অথবা তাঁরা সকলে একসংগে মিলে দেখতেন সকালে সবুজ ঘোড়াগুলি ইন্দ্রের রথের আগে আগে চলেছে, তখন সুদূরে দক্ষিণে ঘনাচ্ছে এক অশুভ সংকেত। রাবণের স্বগোত্রীয় জ্ঞাতিদের একজন লক্ষণের হাতে আঘাত পেয়ে বিকৃত চেহারা প্রাপ্ত হয়েছে, একথা কোনক্রমেই ভুলতে পারছে না দশানন।

একদিন সকালে সীতা তাঁর সংসারের কাজে ব্যস্ত, প্রায়ই তিনি আশ্রম কুটিরের ভিতরে ও বাইরে যাওয়া আসা করছেন, সেদিনের পূজার ফুল ও দুপুরের খাদ্য কিছু ফল সংগ্রহ করছেন, হঠাৎ একটু দূরে তিনি দেখলেন একটি ছোট্ট খুব সুন্দর হরিণ যেতে যেতে গাছের ছায়ায় খেলা করছে। হরিণটার গায়ের রং উজ্জল সোনালী। লোমগুলি মনে হচ্ছে আশ্চর্য নরম ও ঘন। হরিণটা এত কাছে যে, তার সূক্ষ্ম খুরগুলো ও নরম কান ও চোখগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সীতার উপর সেদিন সকালে যেন একটা অদ্ভুত জাদুর প্রভাব পড়ে ছিল। কারণ, সব জীবিত প্রাণীর উপর তাঁর এত দয়া যে, তিনি তাঁর স্বামী ও দেবরকে তাদের জীবন রক্ষার জন্য মিনতি জানাতেন, আজ তিনিই হরিণটাকে ধরে দেওয়ার জন্য আগ্রহের সংগে জিদ্ ধরে বসলেন। তিনি দীর্ঘ বহু বছর পরের অযোধ্যাকে তাঁর কল্পনায় দেখে নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিলেন, এই হরিণটা সেখানে রাজপ্রাসাদের পোষা প্রাণী হয়ে থাকবে। শেষে যখন এটি মরে যাবে, তখন এর চামড়ায় পূজার আসন তৈরী করে রাম কিংবা তিনি নিজে সেটি ব্যবহার করেন।

লজ্জানত মুখে ও চুপিচুপি তিনি তাঁর স্বামী ও দেবরকে ডেকে এই ছোট্টপ্রাণীটিকে দেখালেন ও তাঁর ইচ্ছা জানালেন। হরিণটা লক্ষ্মণের মনকে কোনরূপেই আকর্ষণ করতে পারে নি। তিনি অদ্ভুত একটা কিছু সন্দেহ করছিলেন ও রাম এবং সীতাকে সতর্ক থাকার জন্য সাবধানও করে দিয়েছিলেন। কিন্তু, সীতা হরিণটাকে ধরে দেওয়ার জন্য এমন বায়না ধরে বসলো যে, কোন সন্দেহ বা আপত্তি টিকলো না। রামও সীতার আনন্দের জন্য এত বেশী ব্যগ্র হয়ে পড়লেন যে, দেরী না করে তিনি উপযুক্ত পোশাক পরে ও সাজ সরঞ্জাম নিয়ে হরিণটার পিছনে তিনি তাড়া করলেন। যাওয়ার আগে স্ত্রীকে রেখে গেলেন ভাই-এর দায়িত্বে।

হরিণটার গতিভঙ্গী অদ্ভুত। কখনো এত কাছে যে রাম লক্ষ্যভেদ করার জন্য তীর ধনু নিয়ে উদ্যত হতে না হতেই অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো, আবার পরক্ষণেই দেখা গেল অপ্রত্যাশিত লক্ষ্যের কাছাকাছি। ঘন ঘন এরূপ হতে থাকলো, আর রামও তাঁর শিকারের পিছনে ধাওয়া করে অনেক দূরে চলে গেলেন। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, গাছের ছায়াগুলি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আসছিল। শেষ পর্যন্ত শিকারী কৃতকার্য হলেন, তাঁর একটি তীর শিকারের হৃৎপিণ্ডে গিয়ে বিদ্ধ হয়ে গেল। আর, তখনই হরিণের আকৃতি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল মায়াবী দানব মারীচ। মারীচ অবিকল রামের কণ্ঠস্বরে চীৎকার করে উঠলো তিনবার, "হায় সীতা! হায় লক্ষ্মণ!" তার পরেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অনেক দূরে আশ্রম কুটিরে থেকে সীতা রামের এই আর্তনাদ শুনে কেঁপে উঠলেন ভয়ে। তিনি বুঝতে পারলেন না তাঁর স্বামীর কোন বিপদ হোল কি না। তিনি লক্ষ্মণকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন তাঁকে ফেলে রামের অনুসন্ধানে যাওয়ার জন্য। সেদিন সারাক্ষণ ধরে তিনি যেন আভাস পাচ্ছিলেন কোন একটা বিপদ নিকট থেকে নিকটতর হচ্ছে তাঁদের সকলের। তবু, এই বিপদ কোন পথ ধরে আসতে পারে, তার স্পষ্টতর কোন রূপ বুঝতে পারছিলেন না যে, তার উপর সতর্ক থাকবেন। যাইহোক, এখন তাঁর সব আশঙ্কা ও অশুভ পূর্বলক্ষণের অস্পষ্ট ধারণা তাঁর স্বামীর ভাগ্যে চিন্তায় কেন্দ্রীভূত হোল। লক্ষ্মণের মনে অশুভ পূর্বাভাস দেখা দিলেও, এই কারণে সীতাকে একা ফেলে যেতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি কল্পনা করতে পারলেন না রাম কি বিপদে পড়ে তাঁর সাহায্যের প্রয়োজন অনুভব করতে পারেন, কিন্তু তাঁর তরুণী পত্নীর নিরাপত্তার দায়িত্ব তিনি গভীরভাবে অনুভব করলেন। কিন্তু সীতার তীব্র যন্ত্রণা ও সনির্বন্ধ জিদের ফলে, লক্ষ্মণের না গিয়ে কোন উপায় থাকলো না। সুতরাং, রামের সন্ধানে যাত্রা করার আগে লক্ষ্মণ সীতাকে কুটিরের গণ্ডী ছেড়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে এক পা কোথাও যেতে নিষেধ ও সতর্ক করে দিয়ে গেলেন।

লক্ষ্মণ সামান্য কিছুদূর গিয়েছেন কি না সন্দেহ, একজন সাধু এসে ভিক্ষার জন্য দরজার সামনে দাঁড়ালেন। পাছে আতিথেয়তার ত্রুটি ঘটে যায় এই ভয়ে সীতা তাঁর সংগে কথা বলার জন্য ও স্বাভাবিক অতিথিসেবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন। যাইহোক, তিনি কিন্তু মনের মধ্যে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছিলেন। তিনি ভুলতে পারেন নি যে তিনি একান্তই একাকিনী, আর, ঐ ভিক্ষুক তাঁর দিকে মাঝে মাঝে যে ভাবে তাকাচ্ছিল, তাও তিনি অপছন্দ করছিলেন। মনের বিরক্তি গোপন করে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করছিলেন, যে পথে শিকার শেষ করে রাম লক্ষ্মণের সংগে একত্রে ফিরে আসতে পারেন। কিন্তু চারিদিকে কেবল হলুদ বনভূমি ছাড়া আর কিছুই দেখা গেল না। রাম কিংবা লক্ষ্মণ দৃষ্টিগোচরের মধ্যে কেহই নাই।

হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন এতক্ষণ যে ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি তা নন্। ছিন্ন পোশাক ও সাধুর মত চুলের জটা আর কিছু নয়, দানব রাজ দশানন রাবণেরই ছদ্মবেশ মাত্র, যে এসেছে তাঁকে হরণ করে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। হঠকারিতা করে যে সঙ্কটের মধ্যে তিনি নিজেকে টেনে এনেছেন, তাতে আতঙ্কিত হয়েও সীতা তাঁর নিজের সাহস ও স্বামীর প্রতি বিশ্বাসের জোরে মুহূর্তের জন্য বিচলিত হলেন না। তিনি দানব রাজাকে সাবধান করে দিয়ে বল্‌লেন, রাবণ তার হিংসাত্মক আচরণ বজ্রাস্ত্রের পরিচালক স্বয়ং ইন্দ্রের পত্নীকে আরও নিরাপদে দেখাতে পারতেন, রামের পত্নীকে নয়। কারণ, অমরত্বের জন্য অমৃত পান করলেও, তাঁকে অপমান করে কেউ মৃত্যুর হাত থেকে পরিত্রাণ পাবে না।

এই কথাতে রাবণ হঠাৎ তার দশ মাথা ও কুড়ি হাত বিস্তার করে, বিরাট মূর্তি ধারণ করলো। নিজ মূর্তি ধারণ করার পর রাবণ বলপূর্বক সীতাকে ধরে নিয়ে শূন্য আকাশে উড়ে চললেন।

সীতা আর্তকান্নায় চীৎকার করে চারিদিকের সকলকে অভিযোগ জানালেন। নদী, হ্রদ, গাছপালা, এমনকি নীচে যে হরিণটি চরে বেড়াচ্ছিল, কেঁদে কেঁদে তাকেও জানালেন, রাম ফিরে এলে তাঁকে যেন বলে যে, রাবণ তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। তাঁর কান্নায় পর্বতের উপর দীর্ঘ এক যুগের তন্দ্রায় আচ্ছন্ন ঈগল পাখীদের রাজা জটায়ু ঘুম ভেঙে ছুটে এলেন সীতা উদ্ধারে। তিনি যুদ্ধ শুরু করে দিলেন রাবণের সংগে। যতক্ষণ না অস্ত্র ভেঙে পড়লো, শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরে না পড়লো, এমনকি স্বয়ং পক্ষীসম্রাট যতক্ষণ না মৃত্যুতুল্য আঘাত পেলেন, ততক্ষণ তিনি সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত হলেন না। তারপর, সীতা জটায়ুর অসহায় শক্তিহীন দেহের দিকে ছুটে গিয়ে সর্বাংগে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বনের মধ্যে কাঁদলেন। আর নিজেকে রক্ষা করার জন্য রাম ও লক্ষ্মণকে স্মরণ করতে থাকলেন।

সীতা দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর গলার শুকনো মালা পিছন দিকে একটা গাছকে বৃথাই জড়িয়ে ধরেছিল, এমন সময় রাবণ আবার ঝাঁপ দিয়ে নীচে নেমে এসে সীতার চুলের মুঠি ধরে তাঁকে নিয়ে আবার শূন্যে উঠে গেলেন।

আকাশে সূর্যাস্তের মেঘের মতো সীতার গায়ের হলুদ রংয়ের রেশমী ওড়নাটা বাতাসে উড়তে থাকলো। উর্ধ্বাকাশ থেকে অদৃশ্য দেবতারা এই দৃশ্য দেখে মনে মনে আনন্দিত হলেন। কারণ, সীতা বন্দিনী হওয়ার অর্থ রাবণের মৃত্যু, এবং রাবণের ভয়াবহ আতঙ্ক থেকে জগতের মুক্তি।

কিন্তু জনক নন্দিনী সীতাকে আকাশে কালো মেঘের পটভূমিতে বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল দেখালো। তাঁর অলঙ্কারগুলি যখন তিনি খুলে খুলে পৃথিবীর উপর ফেলতে থাকলেন, মনে হোল যেন মহাশূন্য থেকে নক্ষত্রগুলি খসে পড়ছে। তাঁর নূপুর দুটি বৃত্তাকার বিদ্যুৎরেখার মতো উজ্জ্বল আলোয় ঝলক দিয়ে উঠলো। তাঁর গলার হারটিকে দেখে মনে হোল যেন স্বয়ং গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে আসছেন মাটিতে। তাঁর মাথার ফুলগুলি বৃষ্টির মতো ঝরে পড়তে থাকলো পৃথিবীতে, আবার সেগুলি রাবণের ধাবমান গতির প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে উপরে উঠে গিয়ে সারিবদ্ধ জ্বলন্ত নক্ষত্রের মালার মতো একটি নিরানন্দ পর্বতের চারপাশে ঝিকমিক্ করতে থাকলো।

আর, বনের গাছগুলি রাবণের এই শূন্য অভিযানে ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের শাখা প্রশাখা দুলিয়ে যেন সীতাকে চুপিচুপি আশ্বাস দিতে চাইলো, "ভয় করো না! ভয় করো না!" পর্বতগুলির গা বেয়ে নেমে আসা সব জল প্রপাত ও উর্ধ্বাকাশে প্রসারিত বাহুর মতো তাদের উচ্চ শৃঙ্গগুলি যেন সীতার জন্য কাতর বিলাপ করতে থাকলো। জলাশয়গুলিতে পদ্মফুলের দল গেল শুকিয়ে, মাছগুলি ছটপট করতে থাকলো যন্ত্রণায়, বনের সব প্রাণী ক্রোধে আতঙ্কে কাঁপতে থাকলো। রাবণ যখন সীতাকে সুদূর দক্ষিণে তার লঙ্কা-দ্বীপের রাজ্যে নিয়ে চলে গেল, বাতাস আর্তনাদ করে উঠলো, অন্ধকার হোল গভীরতর, আর, সারা জগৎ হাহাকার করে কেঁদে উঠলো।

যাওয়ার পথে সীতা একটি পাহাড়ের চূড়ার উপর পাঁচটি বড় বড় বানরকে বসে

থাকতে দেখলেন। হঠাৎ তিনি মনের মধ্যে আশা পোষণ করলেন যে, এদের সাহায্যে রামের কাছে সংবাদ পাঠানো যেতে পারে। তিনি তাদের মাঝখানে কিছু অলঙ্কার ও তাঁর হলুদ রং-এর ওড়নাটি রাবণের অলক্ষ্যে ফেলে দিলেন।

এদিকে রাম হরিণ শিকার করে দূর বনপথ ধরে আশ্রম কুটিরে ফেরার পথে শেয়ালগুলো তাঁর পিছনে চীৎকার করতে থাকলো। কোন কিছু অশুভ ঘটেছে, এ বিষয়ে তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইলো না। একটু পরেই তাঁর সংগে লক্ষ্মণের দেখা হোল, এবং তিনি জানতে পারলেন যে, কুটিরে সীতা একাই আছেন।

উদ্বেগে বিচলিত হয়ে দুই বীর আশ্রম কুটিরে গিয়ে পৌছলেন। দেখলেন, সীতা নাই। রামের মানসিক যন্ত্রণার বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। প্রথমে তিনি আশার পর আশা পোষণ করলেন ও সীতা যে সত্যই হারিয়ে গিয়েছেন, একথা বিশ্বাস করতে চাইলেন না। কিন্তু, সম্ভাব্য সকল গোপন স্থানে তন্নতন্ন অনুসন্ধান করেও যখন তাঁকে পাওয়া গেল না, রামের ব্যাকুল প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না নিঃশব্দ অরণ্য, জনহীন প্রান্তরে আকুল আহ্বান ফিরে এল কেবল প্রতিধ্বনি হয়ে, তখন রাম এই সিদ্ধান্তে পৌছলেন যে, সীতাকে দানবেরা মেরে ফেলেছে। চরম আত্মগ্লানি ও দুঃখে রাম অচৈতন্য হয়ে গেলেন।

লঙ্কায় বিজয় অভিযান

সীতা হরণের পরের দিন সকাল হোল। রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অনুসন্ধানে প্রায় সারাটা বন মন্থন করে ফেললেন। শেষে সীতার ফেলে দেওয়া কতকগুলি ফুল ও অলঙ্কার তারা কুড়িয়ে পেলেন। রামকে দেখে মনে হোল, তিনি যেন গোটা জগতকে নির্মূল করে দেওয়ার জন্য তাঁর অলৌকিক শক্তিকে জাগ্রত করছেন। তাঁর কোমরে গাছের ছাল ও হরিণের চামড়া শক্ত করে বাঁধা, ক্রোধে চোখ দুটি রক্তাভ, এক অলৌকিক প্রেরণায় দুর্বার হয়ে বনের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর জ্বলন্ত তীর ধনুতে সংযোজন করে টান দিতে উদ্যত হলেন, যেমন করে ধ্বংসের দেবতা শিব সংহার মূর্তি ধারণ করেন। লক্ষ্মণ তাঁর দাদার এমন ভয়ঙ্কার ক্রোধের মূর্তি এর আগে কখনো দেখেন নি। তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন, ধৈর্য ধারণ করতে বললেন ও প্রেরণা দিলেন। বললেন, প্রথমে খুব সাবধান হতে হবে ও শক্তি সংগ্রহ করতে হবে, তারপর সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। তাতে যদি তিনি ব্যর্থ হন, শুধু তখনই জগতের ভিত্তিমূল পর্যন্ত উপড়ে ফেলে আকাশের মৃত নক্ষত্রগুলোর মধ্যে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেবার জন্য ইন্দ্রের জ্বলন্ত বজ্রের মত তাঁর প্রচণ্ড দৈব শক্তিসম্পন্ন তীর তিনি ব্যবহার করতে পারবেন।

লক্ষ্মণের এই কথায় শান্ত হয়ে ও সংঘর্ষের চিহ্ন অনুসরণ করে তাঁরা এগুতে থাকলেন। তাঁরা দেখলেন, ফোঁটা ফোঁটা জমাট বাঁধা রক্ত, রত্নালঙ্কার খচিত তীর ও

সোনার বর্ম থেকে পড়ে-যাওয়া ভাঙা টুকরো ইত্যাদি এই সব। যে জায়গায় রাবণ ও জটায়ুর যুদ্ধ হয়েছিল, তাঁরা অনুসরণ করতে করতে সেই জায়গার দিকে নিকট থেকে নিকটতর হতে থাকলেন। শেষে, ঠিক সেই জায়গাটিতে উপস্থিত হয়ে তাঁরা দেখলেন, পক্ষী সম্রাট তাঁর শেষ নিশ্বাস ফেলছেন। প্রচণ্ড যুদ্ধে তাঁর ডানা দুটি কাটা গিয়েছে। অনেক কষ্টে শ্বাস নিয়ে জটায়ু তাঁর সংগে রাবণের যুদ্ধের সব কথা বল্লেন। তিনি যে করুণ কান্না শুনেছেন তাও বল্লেন। জটায়ু অতি কষ্টে দানবরাজের নামটা বলতে পারলেন, আর বেশী কিছু বলা হোল না। তিনি মারা গেলেন। এই পক্ষীবীরের জন্য রামের হৃদয় কৃতজ্ঞতা ও করুণায় ভরে উঠলো। তিনি ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের সংগে মৃতদেহের সৎকার এমন ভাবে করলেন, যেন মৃতের আত্মা উর্ধ্বলোকে চলে যায়। তারপর এক কেন্দ্র থেকে আর এক কেন্দ্র, এইভাবে এগোতে এগোতে দু' ভাই সীতার অনুসন্ধানে চল্লেন।

বনের মধ্যে যেতে যেতে তাঁরা লাল ও সাদা পদ্মফুল ফুটে-থাকা পম্পা সরোবরের তীরে পৌছলেন। সেখানে দেখলেন একদল বানর ও তাদের নেতা সুগ্রীবকে। সুগ্রীবের স্ত্রী শত্রুর হাতে বন্দিনী হওয়ায় তিনি নিজেই শোকপ্রকাশ করছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার এই, সুগ্রীবের এই সভার মধ্যেই সীতা তাঁর ওড়না ও অলঙ্কার কিছু ফেলে দিয়েছেন। বানরেরা সেগুলি রামকে দেখাবার জন্য নিয়ে এল। এগুলি দেখে রাম অভিভূত হয়ে গেলেন, কারণ, এই অলঙ্কারগুলি ও ওড়নাটি তাঁর প্রিয়তমা পত্নী সীতার। লক্ষ্মণ কেবল তাঁর পায়ের নূপুর দুটিই চিনতে পারলেন। তারপর বানররা তাদের রাজা ও মহান অতিথিদের জন্য সুগন্ধী ও সুন্দর ফুল দিয়ে আশ্রয় রচনা করলো। তারপর তারা সেই ঘরের মধ্যে রাম ও লক্ষ্মণকে নিয়ে পরামর্শ করতে বসে গেল। সবচেয়ে বড় বানর পবন দেবতার পুত্র হনুমান দুটো কাঠের টুকরোর সাহায্যে আগুন জেলে সেই আগুনকে পূজা করলো ফুল দিয়ে। তারপর জ্বলন্ত কাঠের আগুন সযত্নে রাম ও সুগ্রীবের মাঝখানে রেখে তারা তাঁদের চারপাশে ঘুরে এল। এইভাবে তাঁরা বন্ধুত্বের বন্ধনে হলেন আবদ্ধ। কথিত আছে, ঠিক এই সময় বহুদূরে বন্দিনী সীতার বাম চোখ নেচে উঠেছিল আনন্দে। কারণ, তাঁর স্বামী ও বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীবের মধ্যে মৈত্রীর এই বন্ধনটি ভবিষ্যৎ শুভফলের পূর্বাভাস।

রাম এবং সুগ্রীব, দুই সম্রাটের মধ্যে এই চুক্তি হোল যে, প্রথমে বানরদের শত্রু বালিকে বধ করে সুগ্রীবকে তাঁর স্ত্রী উদ্ধার করে এনে দেবেন। এই কাজটা হয়ে গেলেই সুগ্রীব তাঁর পক্ষ থেকে সীতাকে যেখানে গোপনে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেই স্থানটি খুঁজে বার করার দায়িত্ব নেবেন ও রাবণকে পরাজিত করে তার সব শক্ত ঘাটি ধ্বংস করার জন্য রামকে সৈন্যবাহিনী দিয়ে সাহায্য করবেন। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোল, অভিযান বর্ষাকাল বাদ দিয়ে শরৎকাল আরম্ভ হওয়ার সংগে সংগে অতি অবশ্য পরিচালিত হবে।

নীতিগতভাবে সন্দেহযুক্ত হয়েও বানরদের দুই মানুষ বন্ধু তাঁদের চুক্তির শর্ত পূর্ণ করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে বালি বধ করে সুগ্রীবকে তাঁর স্ত্রী ফিরিয়ে দিলেন।

কিন্তু হায়, বানর চরিত্রের অস্থিরচিত্ততা! সুগ্রীবও সোজাসুজি তাঁর বন্ধ আমোদ-প্রমোদে ডুবে গেলেন। রাম দেখলেন, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মূল্যবান দিনগুলো চলে যাচ্ছে, প্রস্তুতির কোন লক্ষণ নাই। তবে, একথা ঠিক যে, রামের এই ধারণা পুরোপুরি সত্য নয়। বানরদের উপদেষ্টা ও সেনাপতি হনুমান তার সম্রাটের কাছে এই অহেতুক দেরীর জন্য যথারীতি আপত্তি তুলেছিল ও তাকে সুগ্রীব সৈন্য সংগ্রহের জন্য পাঠিয়েছিলেন। শেষকালে যখন লক্ষ্মণ তাঁর মনুষ্যোচিত স্পষ্টতা নিয়ে এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখলেন, তখন তাঁদের মিত্রপক্ষ চতুর্দিকে হাজার হাজার বানর সৈন্যের একত্র সমাবেশ দেখিয়ে দিলেন ও আরও নিশ্চয়তা দিলেন যে, বনের আরও বহু এলাকায় দুর্দান্ত সব বানর ও ভালুক ঘাটি গেড়ে বসে আছে। তাদের প্রত্যেকের সংগে একটি করে বাহিনী আছে ও তারা যুদ্ধের জন্য অভিযানের নির্দেশের প্রতীক্ষা করছে।

প্রথম উদ্দেশ্য হোল, সীতাকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেই স্থানটির অনুসন্ধান করা। এজন্য সুগ্রীব বানর দলকে ভাগ করে এক দলকে উত্তর-পূর্ব দিকে, এক দলকে উত্তর-পশ্চিম দিকে ও আর এক দলকে সুদূর দক্ষিণ দিকে অনুসন্ধানের কাজ চালাতে নির্দেশ দিলেন। যাই হোক, তাঁর প্রধান ভরসা বীর হনুমানের ক্ষমতা ও শক্তির উপর, যিনি যাচ্ছেন দক্ষিণ বাহিনীর সংগে। রাম যখন একথা শুনলেন, তিনি তাঁর নাম খোদাই-করা একটি আংটি গুপ্তচর হিসাবে হনুমানকে দিলেন। সীতার সাক্ষাৎ পেলে হনুমান তাঁকে এটি প্রমাণস্বরূপ দেখাবেন।

কিন্তু, বহু সপ্তাহ পবনদেবের পুত্র হনুমানের ব্যর্থ অনুসন্ধান করে চলে গেল। তারপর নিজের শরীরকে বিরাট আকারে পরিণত করে ও মনের সব শক্তিকে একত্র সংহত করে এক লাফ দিয়ে সমুদ্রের ওপারে লঙ্কাদ্বীপে গিয়ে পড়লো হনুমান। এই দ্বীপে রাবণের রাজত্ব। এবার হনুমান একটু থামলো। তার সামনে একটা পাহাড়ের মাথায় ধারণাতীত সৌন্দর্যে উজ্জ্বল একই উচ্চতার সব বাড়ীগুলি ও শূন্যে মাথা উঁচু করে সব মিনার দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখলো, লঙ্কার বিখ্যাত সহরের রূপ, আর, নিজের মনে মনে ভেবে নিল কি উপায়ে সে এর মধ্যে ঢুকবে। শেষ পর্যন্ত সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত করলো হনুমান। তারপর, যখন ঠিক সময়টি এগিয়ে এল হনুমান নিজেকে একটি ছোট্ট বেড়ালের আকৃতিতে রূপান্তরিত করে ঢুকে পড়লো লঙ্কা সহরের মধ্যে।

বাস্তবিকই লঙ্কা নগরী যেন দেবতাদের আবাসস্থল স্বর্গের মতো। এর বহুতল-বিশিষ্ট বাড়ীগুলি ও কারুকার্যশোভিত আবরণগুলি স্ফটিকখচিত। এর ধনুকাকৃতি ছাদ ও তোরণগুলি অপূর্ব ও সবদিক থেকে বিশালতায় চমৎকার! রাস্তাগুলি বিরাট, প্রশস্ত ও সযত্নরক্ষিত। এর বিজয় দুর্গগুলিও বিশাল। আলোক-স্তম্ভগুলিও সুন্দর! বাড়ীগুলি প্রাসাদের মতো, আর, স্মৃতিস্তম্ভগুলি যেন সূক্ষ্ম কারুকার্যময় মার্বেল পাথরের শামিয়ানা। জগতের মধ্যে বিখ্যাত লঙ্কা সহর রাবণের বাহুবলে শাসিত এবং

সত্যই অপূর্ব! ভয়ঙ্কর শক্তিমান রাতের পাহারাদারেরা সতর্ক পাহারা দিয়ে চলেছে লঙ্কা সহরে। এই বিরাট মহিমার সামনে হনুমানের মনটা দমে গেল ও বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। কিন্তু, হঠাৎ যেন তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই আকাশের নক্ষত্রগুলির সংগে পূর্ণচাঁদের আবির্ভাব হোল উজ্জ্বল মহিমায়। হনুমান উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখলো। দেখলো, সাদা শাঁখের কমনীয় দীপ্তি যেন সাদা পদ্মের আভা জড়ানো, স্বর্গের সরোবরে ভাসমান একটি রাজহাঁস।

সে রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লঙ্কার সব বড় বড় লোকের বাড়ী চষে ফেললো হনুমান, কিন্তু সবই ব্যর্থ হোল। বড় বড় সভাগৃহ, কক্ষগুলি ও শয়নগৃহগুলির মধ্যে একটিও তার অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকে বাদ গেল না। হনুমান রাবণের প্রাসাদের মধ্যেও ঢুকতে বাদ দিল না। দশমাথা ওয়ালা রাবণ জানতে পারলো না একটা ছোট্ট হনুমানের এই অনুসন্ধান তার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। রাত্রি শেষের সকালের দিকে হনুমান উঁকি মেরে দেখলো রাবণ তার বিরাট পালিশ করা স্ফটিকের তৈরী শয়ন-বেদীর উপর শুয়ে আছে। কিন্তু, এইসব বিরাট প্রাসাদতুল্য অট্টালিকার বা প্রাসাদের ভিতর কোন একটি কক্ষেও হনুমান সীতাকে দেখতে পেল না।

প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যার রাণী সীতাকে লঙ্কায় প্রবেশের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অশোক কাননে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে ও সেখানে তাঁকে রাখা হয়েছে দানবীদের তত্ত্বাবধানে কড়া নজরের মধ্যে। সীতাকে পীড়ন করার জন্য তাদের উপর নির্দেশ দেওয়া আছে। সীতা ধরিত্রী জননীর কন্যা। তাঁর সম্পর্কে এরূপ কাহিনী আছে যে, তাঁর পিতা তাঁকে শিশু অবস্থায় হলকর্ষণের জমিতে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। তাই, তাঁর কাছে উন্মুক্ত তরুবীথি, উদার আকাশ ও চঞ্চল ঝরণা বিলাসবহুল প্রাসাদের ঘেরা দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকার চেয়ে অনেক বেশী প্রীতিপ্রদ। কিন্তু তাঁর মহিলা প্রহরীদের আচরণ তাঁকে দুঃখের গভীরতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। বন্দিনী অবস্থায় তিনি কোন খাদ্য গ্রহণ করেননি। তার কারণ, বন্দী জীবনের প্রথম দিন রাত্রিতে দেবরাজ ইন্দ্র আলৌকিক শক্তিতে লঙ্কার সবাইকে ঘুমে অচেতন করে দিয়ে স্বর্গের খাদ্য ও পানীয় নিজের হাতে নিয়ে তাঁর কাছে এসেছিলেন। এই খাদ্য ও পানীয় সেবনে নশ্বর মানুষের ক্ষুধা ও তৃষ্ণা চিরতরে দূর হয়ে যায়। সীতা এই খাদ্য স্পর্শ করতে ভয় করছিলেন, কারণ, তিনি যদি স্বর্গের রাজার ছদ্মবেশে বাস্তবে আর কেউ হন! তখন ইন্দ্র তাঁর স্বর্গীয় গুনগুলি সহ মুহূর্তের মত জ্বলে উঠে দেখালেন নিজেকে। এবার সীতা তাঁর হাত থেকে অমর আত্মাদের জন্য নির্দিষ্ট খাদ্য নির্ভয়ে গ্রহণ করলেন। এরপর থেকে সীতা রামের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস তাঁর ক্লান্ত বিষন্ন দিনগুলি কাটিয়ে চলেছেন। এই অবস্থায় হনুমান তাঁকে দেখলো ও এবার নিশ্চিন্ত হোল যে, তার সীতা অনুসন্ধানের অভিযান শেষ হোল।

নদীর ধারে একটি গাছের নীচে বসে একজন মহিলা চোখের জল ফেলছিলেন। তাঁর চেহারা বিবর্ণ ও শীর্ণ। তাঁর পরনে জীর্ণদশাপ্রাপ্ত রেশমী শাড়ী। কিন্তু, তাঁর

আনত মাথা দেখে মনে হয় যিনি রাণীর মতো। আর, তাঁর মাথার ঘোমটা এমন স্বাভাবিক মাধুর্যে বেষ্টন করে আছে, যা লঙ্কার রাক্ষসীদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। অধিকন্তু বানরটি আরও দেখলো, তার সামনে ঐ নতমুখ মহিলাটি অপূর্ব সুন্দরী ও লবণ্যময়ী। তাঁর চমৎকার ভাব-ভঙ্গীর মধ্যে আরও এমন কিছু আছে, যা ভদ্র, নম্র ও সুরুচিপূর্ণ। হনুমান কিছুক্ষণ দম আটকে বসে থাকলো। তারপক্ষে সন্দেহের অবকাশ খুব কমই আছে যে, এই সেই সীতা, রামের বন্দিনী পত্নী, যাঁকে সে এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হনুমান অপেক্ষা করে সীতার দিকে চোখ রেখে নিরীক্ষণ করতে থাকলো। তারপর, হঠাৎ সে একজনকে বাগানের মধ্যে ঢুকতে দেখে উত্তেজনায় শিউরে উঠলো। যাকে সে দেখলো, সে আর কেউ নয়, স্বয়ং দশ মাথাওয়ালা রাবণ! বন্দিনীর সামনে মাথা নত করেই ঢুকলো রাবণ, তারপর দৈত্যরাজ সীতার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসলো। সবুজ ঘাসে-ঢাকা নদীর কিনারায় রাবণ সীতার দিকে মুখ রেখে বসলো, আর, হনুমানও গাছের ডালে বসে এমনভাবে তার কান পাতলো যেন রাবণের প্রতিটি কথা শুনতে পাওয়া যায়।

রাবণের উপস্থিতিতে সীতার বিবর্ণ মুখ আরও শুকিয়ে গেল। হনুমান দেখলো, হাওয়ায় যেমন গাছের সবুজ পাতা কেঁপে ওঠে, সীতাও তেমন ভয়ে কাঁপতে থাকলেন। কিন্তু, রাবণ যখন কথা বলতে আরম্ভ করলো তখন সীতার গালে জ্বলন্ত আগুনের আভা ফুটে উঠল, জ্বলে উঠলো চোখ দুটো। তিনি এমন গর্বিতভঙ্গীতে মাথা তুললেন যে, যেন তাঁকে নয়, রাবণ নিজেকেই নিজে সম্বোধন করে কথা বলছে। রাবণ যত কথা বললো সীতা এমন ভাবে শুনলেন, যেন না শোনারই মতো। উত্তরের আশায় রাবণ অবশ্য একবার অপেক্ষা করলেন। সীতা শুধু বল্লেন, "আমি আপনাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছি, দানবরাজ! আপনি যা করেছেন, আর, এখন যে সব কথা বলছেন, তার জন্য মৃত্যুই আপনার একমাত্র শাস্তি। যে কেবল দেবতাদের উপহাস ও বিদ্রূপ করে, সে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে। আপনিও সেরূপ দুঃসাহসিক স্পর্ধার কাজ করেছেন।"

এই কথাগুলি বলে সীতা আবার বসে পড়লেন। তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন শূন্যে, যেন কিছুই দেখছেন না, কিছুই শুনছেন না কানে।

প্রচণ্ড ক্রোধে আর বিরক্তিতে রাবণ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় রাক্ষসীদের পাঠিয়ে দিয়ে গেল। তারা এসে সীতাকে বেষ্টন করে পীড়ন চালাতে শুরু করে দিল। সেই উৎপীড়নের মধ্যে মনে হোল সীতা যেন নেকড়ে বাঘ বেষ্টিত হরিণ শিশু। তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ক্ষোভে, দুঃখে, রামের বিরহে ভাঙা ভাঙা কথায় তিনি আকুল হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। বন্দিনীর এই দুর্দশা দেখে কিছুটা মজা পেয়ে রাক্ষসী মহিলারা খানিকটা দূরে সরে গেল। ঠিক এই সুযোগটির জন্যই হনুমান এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল, তবু হঠাৎ সীতাকে সম্বোধন করতে তার ভয় হোল, পাছে তিনি চমকে উঠে তাঁর প্রহরী মহিলাদের ডেকে পাঠান! হনুমান, তাই সীতার দৃষ্টি

আকর্ষণের জন্ত নিজেকে নিজে রামের কথা বলতে বলতে চারধারে দৌড়তে শুরু করে দিল।

অবশেষে সীতা মুখ তুলে তাকালেন ও বানরের দিকে লক্ষ্য করে বল্লেন, "প্রিয় বনের ভাইটি! তুমিও কি ঐ প্রিয় নামটি জান?" বানর খুব ভদ্রভাবে বললো, "মা, আমার মনে হয়, আপনিই সেই, যাঁর অনুসন্ধানে আমাকে পাঠানো হয়েছে। যদি তাই হয়, তাহলে আমাকে আপনার সব অবস্থা বলুন!"

মৃদু চাপা গলায় বল্লেন সীতা, "আমি মিথিলার জনক রাজার কন্যা ও দশরথের পুত্রবধূ সীতা। এখানে আমি বন্দিনী। আমার উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছে, দু'মাস পরে এই মৃতুদণ্ড কার্যকরী করা হবে।"

হনুমানও তখন তাঁকে রামের সব কথা বল্লো। বল্লো, "রাম ভাল আছেন, দিবারাত্রি কেবল আপনার উদ্ধারের কথাই চিন্তা করছেন। লঙ্কাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করার জন্ত তিনি বিরাট এক সৈন্তবাহিনীর সমাবেশ করছেন। আর, শেষপর্যন্ত তিনি আমাকেই আপনার অনুসন্ধানের জন্ত পাঠিয়েছেন, ফিরে গিয়ে তাঁকে আপনার লুকিয়ে রাখা স্থানের খবর দিতে হবে।"

এই সব সংবাদ পেয়ে সীতার খুব আনন্দ হোল। তবু তাঁর মন থেকে সব সন্দেহ ঘুচলো না। কারণ, রাবণ ইচ্ছামত যে কোন আকার ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। ইতিপূর্বে সে একবার তাঁর মায়ের রূপ ধারণ করে, আরও একবার স্বয়ং রামের রূপ ধারণ করে হাজির হয়েছিল। রাবণ আশা করেছিল সীতা অন্ততঃ তার সংগে দুটো অনুগ্রহের কথা বলবে। কিন্তু, কোন অলৌকিক উপায়ে বুঝতে পেরে সীতা কোন কথাই বলেননি। এখন তাই, তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না, এই বানরটি সত্যিই এর আসল রূপ কি না। তাঁর ভয় হোল, এও হয়তো মায়াবী দৈত্যের আর এক কৌশল।

এবার হনুমান এগিয়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে রাম নাম খোদাই-করা আংটিটি রেখে দিলেন, যেটি রাম তাকে প্রতীক স্বরূপ দিয়েছিলেন।

দ্রুত আংটিটি তুলে নিয়ে সীতা তাঁর মাথার চুলে লুকিয়ে ফেল্লেন। তাঁর চোখের জল ঝরে পড়লো, আনন্দে কেঁদে ফেল্লেন তিনি। তারপর, ভয়ে ভয়ে কাঁপা কাঁপা আঙুলে তাঁর পরণের পোশাকের মধ্য থেকে একটি কবচ বের করে আনলেন, যে রক্ষাকবচটি রাম দিয়েছিলেন তাঁকে। সীতা হনুমানকে আরও বল্লেন, সে যেন রামকে সেই ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেয়, একদিন বিকালে যখন তাঁরা দুজনে অযোধ্যার রাজোদ্যানে বসেছিলেন, তখন একটা বিরাট বাজপাখি তাঁকে আহত করায় রাম সেই বাজপাখিটাকে হত্যা করেছিলেন। যাই হোক, কবচ ও স্মৃতি দু'রকম প্রমাণ উপস্থিত করে সীতা নিশ্চিন্ত হলেন যে, তাঁর বন্দী জীবনের অবস্থান সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

বাগান ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে মাটিতে নাক ঠেকিয়ে প্রণাম করে বানর

বললো, "মা, আমি কত সহজে আপনাকে আমার পিঠের উপর বসিয়ে প্রভু রামের কাছে নিয়ে যেতে পারি! আপনি আমাকে যা দেখছেন তার চেয়ে আমি আকারে অনেক বড় ও অনেক বেশী শক্তিশালী। আপনাকে পিঠের উপর বসিয়ে এখান থেকে নিয়ে চলে যাওয়া আমার কাছে খুবই সামান্য ব্যাপার!"

বানরের কথা শুনে রাণী সীতা পিছিয়ে গেলেন ও তাঁর মুখের উপর পরিবর্তনের আভাস দেখা গেল। তিনি সেই দিনটির কথা স্মরণ করলেন, যেদিন রাবণ একটা বিরাট শিকারী পাখীর মতো তাঁকে আকাশ পথে সন্ধ্যার ছায়ালোকে ধরে নিয়ে এসেছিলেন। মনের মধ্যে পুরোপুরি দৃঢ় থেকেও তিনি এই অনুগত সেবককে আঘাত দেওয়ার জন্যই একটু দ্বিধার সংগে বললেন, "না, না, স্বয়ং আমার স্বামী ছাড়া আর কেউ আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাক, আমি চাইনা।"

হনুমান বললো, "এ তো খুব ভাল কথা।" সে সীতার উত্তরে খুবই সন্তুষ্ট। হনুমান আরও বললো, আমি মনে করি, আপনাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার গৌরব অর্জনের ইচ্ছা আমার প্রভুও পোষণ করেন তাঁর মনে। আপনার কাছে এসে পৌছতে তাঁর খুব দেরী হবে না। তখন রাজকীয়ভাবে সবকিছুর প্রতিশোধ নেওয়া হবে। কিন্তু, এখন আর বন্য বানর প্রকৃতির রক্ত গরম হয়ে উঠছে। এই স্থান ত্যাগ করার আগে, আমি রাবণের কিছু ক্ষতি করে দিয়ে যেতে চাই।"

দ্রুত একবার লেজটা দুলিয়ে ও আর একবার প্রণাম করে হনুমান চলে গেল। বন্দিনী সীতা আবার পড়ে থাকলেন একা, কিন্তু এবার তাঁর মন আশার আলোয় ভরে উঠেছে। পরের দিন তিনি খবর পেলেন, একটা ভয়ঙ্কর হনুমান এক রাত্রির মধ্যে রাক্ষসদের ফলের বাগানের সব নূতন ফল ধ্বংস করে দিয়েছে ও অসংখ্য পাহারাদারকে হত্যা করেছে। তারপর তাকে এক লাফে সাগর পেরিয়ে পালিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। বিদায় কালে হনুমানের কথাগুলো স্মরণ করে সীতা প্রচ্ছন্ন হাসি হাসলেন।

ইতিমধ্যে রাম শৃংখলার সংগে তাঁর বাহিনীকে সজ্জিত করেছেন ও তাঁর আদেশের কর্তৃত্ব পরীক্ষা করে নিয়েছেন। হনুমান যখন শুভ সংবাদ নিয়ে উপস্থিত হোল, তিনি তখন তাঁর বাহিনীকে সমুদ্রতীরে যাওয়ার জন্য আদেশ দিতে প্রস্তুত। এখন সমস্যা দাঁড়ালো কি উপায়ে বাহিনীকে জল-প্রণালী অতিক্রম করিয়ে ওপারে নিয়ে যাওয়া যায়। রামের তীব্র আবেগপূর্ণ প্রার্থনা ও শক্তির জোরে স্বয়ং সমুদ্র তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন ও লঙ্কার মূল ভূখণ্ডের সংগে যুক্ত করার জন্য সেতু নির্মাণের ভিত্তিভূমির জন্য নিজের তলদেশ উঁচু করে ধরলেন। এবার বানর বাহিনী গাছের ডালপালা, বড় বড় গাছের কাণ্ড, কাঠের গুঁড়ি পাথর ইত্যাদি বয়ে নিয়ে এসে একটা মজবুত আর উঁচু কাঠামো তৈরী করে ফেললো। এমন মজবুত যে লবণাক্ত সামুদ্রিক ঢেউয়ের ধাক্কা সহ্য করার মতো যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন। আর, আজও লোকেরা এই সেতু নির্মাণের কাজে ক্ষুদ্র কাঠবেড়ালের আশ্চর্য ভূমিকার কথা বলে থাকে। তারা সেতুকে মসৃণ করার জন্য বয়ে আনলো ছোট ছোট পাথরের টুকরো, শামুক ও আরও কত কিছু।

এই জন্য, কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে ভগবান রামচন্দ্র স্বয়ং শ্রমিক কাঠবেড়ালদের একটিকে তাঁর হাতে তুলে নিয়ে আদর করলেন ও মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। রামের এই আশীর্বাদের চিহ্নস্বরূপ ভারতীয় কাঠবেড়ালদের কালো লোমের উপর তিনটি সাদা লম্বা দাগ দেখা যায়, যেগুলি বিশ্বস্রষ্টা ভগবানেরই আঙ্গুলের দাগ।

সেতুর নির্মাণ শেষ হয়ে গেলে রামের সৈন্য বাহিনীকে নিরাপদে এপারে নিয়ে আসা গেল। সকলেরই জানা ছিল, এবার তাদের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে লঙ্কা অবরোধ করে রাবণকে ধ্বংস করা ও সীতাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করা।

এদিকে রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী প্রথম থেকেই তাঁর স্বামীকে মিনতি জানিয়ে আসছেন বন্দিনী সীতাকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু, রাবণ কেবল রামের উদ্দেশে ঘৃণা আর অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, আর, নিজের ক্ষমতার দম্ভ করেছেন। যাইহোক, শত্রু পক্ষের সৈন্য যখন সাগর পেরিয়ে এপারে চলে এল, তখন সবকিছুরই পরিবর্তন দেখা গেল। সংবাদটা শোনা মাত্র রাবণ নিজেই ভীষণ ভয় আর ত্রাসে নিজের পায়ের উপর লাফিয়ে উঠলেন। শত্রুসৈন্য এখন তার নিজেরই দরজার মুখে এসে হাজির। একদিনও আগে যে আকাশ মেঘমুক্ত ছিল, এখন তার সবটাই মেঘাচ্ছন্ন, গম্ভীর ও বিষণ্ণ। কারণ, লঙ্কাদ্বীপের সকলেরই জানা আছে, রামের বাহিনীভুক্ত প্রত্যেকটি হনুমানের শক্তির পরিমাণ কতখানি, যে হনুমান্ মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাদের সবগুলি বাগান ধ্বংস করে দিতে পেরেছিল।

এখন, আবার মন্দোদরী রাবণের নিজের ভাইয়ের সংগে একযোগে প্রার্থনা জানাল, "এখনও শহর রক্ষা করার সুযোগ আছে, বন্দিনী বিদেশিনীকে মুক্ত করে দিন! রাম ন্যায়ের পথ ধরে চলছেন, ভাগ্য তাঁর সহায় হয়েই লড়াই করবে।"

রাবণ তার ভাইকে এমন কঠোর ও সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল যে, ক্রোধে তার ভাই সেখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হলেন। কিন্তু, নিজের স্ত্রীকে আশাতিরিক্ত ভদ্রভাবে বললো, "প্রিয়ে, শত্রু আমাদের উপর তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবে, যদি সে তা করতে পারে। তুমি কি চাওনা যে, দয়া ভিক্ষার চেয়ে তোমার স্বামী ও সন্তানেরা বীরের মত মৃত্যুবরণ করুক?"

তখন মন্দোদরী বুঝলেন যে, তাঁর স্বামী তার মনের গোপন কথাটাই প্রকাশ করেছেন যে, সে নিজে ও তার ছেলেরা মৃত্যুবরণ করতে পারে, আর, মন্দোদরী বিধবা ও সন্তানহীনা হয়ে এ জগতে পড়ে থাকবেন একান্তই একাকিনী। তিনি আর কাঁদলেন না, ফেল্‌লেন না এক ফোঁটাও চোখের জল। তাঁর কাজ এখন স্বামী ও সন্তানদের শক্তিবৃদ্ধি করা, তাদের ভীত করা নয়।

কয়েক ঘণ্টা পরে রাম লক্ষ্মণ তাঁদের শিবিরে বসে দেখলেন একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি একদল সৈন্যসহ সন্ধির পতাকা উড়িয়ে তাঁদের কাছাকাছি এগিয়ে আসছেন। কাছে এসে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে বল্‌লেন, "ভদ্র মহোদয়গণ, লঙ্কার অধিবাসীরা সম্পূর্ণ

ভুল পথে চলেছে। আমি আপনাদের সংগে সন্ধি করতে ও সহযোগিতা দিতে এসেছি।"

ইনি রাবণের ভাই বিভীষণ, এসেছেন তাঁর সশস্ত্র বাহিনীকে সংগে নিয়ে।

রাজকুমারদ্বয় বিভীষণকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে গ্রহণ করলেন। ঘোষণা করা হোল যে, লঙ্কা অধিকৃত হলে তাঁকেই শাসনকর্তা নিয়োগ করা হবে।

এরপর খুব কম সময়ের মধ্যেই লঙ্কা আক্রমণ শুরু হোল, এবং একটি প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়, এই অবরোধের সময় লক্ষ্মণ দেখেছিলেন, নগর প্রাচীরের উপর থেকে একজন ধনুর্ধারী বিভীষণকে লক্ষ্য করে তীরবিদ্ধ করে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। রামের অনুজ লক্ষ্মণের তখন শুধু এই কথাটাই মনে এসেছিল যে, পলাতক বিভীষণ তাঁদের আশ্রিত অতিথি।

মানুষ যেমন তার প্রিয়জনকে আলিঙ্গন করতে ছুটে যায়, কাহিনীকাররা বলে থাকেন, লক্ষ্মণও সেইরকম ছুটে গিয়ে বিভীষণের হত্যার জন্য নির্দিষ্ট তীরটি নিজে বুক পেতে নিয়েছিলেন। এর ফলে বিভীষণের জীবন রক্ষা পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু লক্ষ্মণ নিজের জীবনকে ঠেলে দিয়েছিলেন মৃত্যুর মুখে।

লঙ্কা-অবরোধ দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল, কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তার পতন হোল। এখন বাকী থাকলো শুধু দুর্গ আক্রমণ।

অবশেষে রামের হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ হোল। একক সংগ্রামে তিনি রাবণকে নিজের হাতে হত্যা করলেন। দুর্গের সিংহদ্বার খুলে গেল, এগিয়ে এল বন্দিনী সীতা উদ্ধারের সেই বহু প্রত্যাশিত শুভ মুহূর্তটি।

সীতার অগ্নিপরীক্ষা

রামের সমগ্র হৃদয় সীতাকে দেখার জন্য ব্যাকুল বাসনায় উন্মুখ হয়ে ছিল। একদিন সেই সকালে সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে তিনি সীতার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, সেই মধুর জীবনটি আবার ফিরে পাওয়ার জন্য তিনি আকুল হয়ে অপেক্ষা করছিলেন এতদিন। রাম ছিলেন না সাধারণ কোন মরণশীল মানুষের মতো একজন অন্ধ আবেগে চালিত ব্যক্তিমাত্র। অথবা, তিনি ছিলেন না চলমান সময়ের ইচ্ছাধীন দৈবসঞ্জাত কোন খেলার পুতুল। তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে তিনি বুঝেছিলেন, তাঁর সংগে সীতার পুনর্মিলনের বিষয়টি প্রকাশ্যস্থানে হওয়া উচিত ও সীতার পবিত্রতা ও সতীত্ব সম্পর্কে যাতে সাধারণ মানুষের মনে ভবিষ্যতে কোন প্রশ্ন উঠতে না পারে, তার জন্য কিছু প্রমাণ প্রকাশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। প্রজারা যদি সন্দেহাতীতরূপে তাঁকে ভালবাসতে না পারে, তবে সেটা সীতার পক্ষেও সুখের কারণ হবে না। যদি সন্দেহ সংশয়ের সকল মলিনতার অনেক উর্ধ্বে সীতাকে না তুলে ধরা যায়, তবে রামের সংগেও কেউ থাকবে না।

কিন্তু, রামের জন্য প্রথম যে কর্তব্য অপেক্ষা করছিল, তার সংগে এ সব প্রশ্ন সম্পর্কহীন। এই মুহূর্তে তিনি একটি বিজয়ী সৈন্যবাহিনীর প্রধান। তাঁর প্রধান ও প্রথম দায়িত্ব তাঁর নিজের বাহিনীর হাত থেকে লঙ্কার সকল শিশু, নারী, সম্পদসহ সহরকে রক্ষা করা। তাই, তিনি অত্যন্ত দ্রুত বিভীষণকে মুকুট ভূষিত করে লঙ্কার রাজা হিসাবে ঘোষণা করলেন। এই কাজ করার পরেই তিনি হনুমানকে গোপনে ডেকে পাঠিয়ে নির্দেশ দিলেন, সে যেন সহরে প্রবেশের জন্য লঙ্কার নূতন রাজার অনুমতি সংগ্রহ করে। আর, তাকে সীতার সংগে গোপনে সাক্ষাৎ করে এই বিজয় সংবাদটিও জানাতে বললেন।

রাম প্রকাশ্যে এক আনুষ্ঠানিক অনুরোধ বিভীষণের কাছে পাঠালেন যে, তিনি যেন কোশলের রানী সীতাকে ব্যক্তিগতভাবে তাঁর তত্ত্বাবধানে রামের কাছে নিয়ে আসেন। তাছাড়া, সীতাকে আসতে হবে যথার্থ রাজকীয় মর্য্যাদায় পোশাক ও রত্নালঙ্কার পরে। একজন নারী হিসাবে সীতার প্রেমাসক্ত হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা সেই বন্দিনী অবস্থায় দুঃখের পোশাক পরেই তাঁর স্বামীর আশ্রয়ে তখনই যেন উড়ে গিয়ে উপস্থিত হতে উন্মুখ ছিল। কিন্তু, বিভীষণ অত্যন্ত নম্রভাবে সীতাকে তাঁর স্বামীর ইচ্ছায় পবিত্রতার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, আর, তিনিও তৎক্ষণাৎ এই চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তের কাছে নতি স্বীকার করলেন। সত্যই, রাজপুত্রদের কী কঠিন পথেই না চলতে হয়! প্রতিটি পদবিক্ষেপে নিজের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে সীতাকেও তার স্বামীর পাশে গিয়ে দাঁড়ানোর পথ করে নিতে হবে।

অবশেষে রাণী সোনার ঝালর দিয়ে ঘেরা পাল্কীর মধ্যে উঠে বসলেন। এই পাল্কীতে বসিয়ে তাঁকে রামের সামনে নিয়ে যাওয়া হবে। তাঁর আগে আগে উপস্থিতি ঘোষণা করতে করতে চল্‌লেন বিভীষণ নিজে। কিন্তু, সহরের তোরণদ্বারের মুখে অনুরোধ জ্ঞাপক সংবাদ এলো যে, রাণীকে পাল্কী থেকে নেমে খোলা শিবিরের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যেতে হবে রাজার কাছে। এই নির্দেশের গুরুত্ব বিশেষ কিছু বুঝতে পারলেন না রাণী। রাজাকে দেখার আগ্রহে তিনি এতদূর ব্যাকুল ছিলেন যে, অন্যান্য তুচ্ছ বিষয়ে তাঁর মন এতটুকুও ছিল না। সীতা তাঁর আসন থেকে নেমে প্রশস্ত রাস্তার উপর দাঁড়ালেন। তাঁর চারপাশে ডাইনে বাঁয়ে সব সৈন্যসামন্ত। পরিপূর্ণ শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে বসে আছেন রাম, তাঁর মুখমণ্ডল গম্ভীর ও প্রশান্ত। সকলের উৎসুক চোখ সীতার ওপর নিবদ্ধ, শৈশব থেকে আজকের এই মুহূর্তটি পর্যন্ত যাঁর মুখ প্রকাশ্যে কেউ দেখেনি কোনদিন। রাণীর সংকুচিত ও সংবেদনশীল মনের পক্ষে এই বিব্রত অবস্থার কথা হৃদয়ে উপলব্ধি করতে এতটুকুও দেরী হোলনা বীর বিভীষণের। রাজা ও রাণীকে একান্ত সাক্ষাতের মধ্যে আলাপের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য তিনি জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার নির্দেশ দিতে উদ্যত হলেন। এমন সময় রাম হাত তুলে তাঁকে নিষেধ করে হুকুম দিলেন, "সবাই থাকুক! এটি এমন একটি ঘটনা, যখন সমগ্র বিশ্ব জগৎটাই নারীর আব্রু হয়ে দাঁড়ায় এবং সকলেই তাঁকে নিষ্পাপ দৃষ্টিতে দেখে থাকে। ইতিমধ্যে

ধীর পদবিক্ষেপে রাণীর মহিমায় একটু একটু করে সীতা এগিয়ে এলেন রামের কাছে। তাঁর চোখ দুটি দিয়ে স্বামীর মুখমণ্ডলের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি স্পন্দন তিনি যেন শুষে নিচ্ছিলেন। রাম তাঁকে অভ্যর্থনার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, কিন্তু, সকলে দেখলো রামের দৃষ্টি সীতার উপর নিবদ্ধ নয়। তাঁর মাথা নীচু করে চোখ দুটির দৃষ্টি রেখেছেন নীচে মাটির উপর। আর, তখন সম্পূর্ণ রাজকীয় মর্যাদায় অপরূপ লাবণ্যবতী রাণীকে কী সুন্দরই না দেখাচ্ছিল। যদিও তাঁর দেহে রাজরাণীর বহু মূল্যবান অলংকার শোভিত ছিল, তবুও, তাঁর সমগ্র অবয়ব ঘিরে এমন একটি ভাব ছিল যে, যারা দেখছিল, তাদের সকলেরই মনে হচ্ছিল, এই সেই নারী, যাঁর শুদ্ধতা, মহৎ অন্তর, নম্রতা ও স্বামীর প্রতি অনুরাগ সমগ্র দেশের সম্মান ও সমর্থনের পক্ষে যথার্থরূপে উপযুক্ত। তাঁর মধ্যে নারীত্বের এই আদর্শও মহৎ গৌরবের প্রকাশ দেখে সেদিন উপস্থিত সকলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে অবণত হলেন।

স্বামীর ইঙ্গিতে কয়েক পা দূরে রাণী স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, এবং রাম উপরে চোখ তুলে তাঁকে সম্বোধন করে বল্‌লেন, "যথার্থ কারণেই রাবণের পরাজয় ও ধ্বংস হয়েছে, অযোধ্যার সম্মানও উপযুক্তরূপে সুউচ্চে প্রতিষ্ঠিত। এখন, স্বামী থেকে এতদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা রাণীর বিচার্য বিষয় তিনি কোথায় এবং কার তত্ত্বাবধানে বাস করতে পছন্দ করবেন।" তারপর রাম মুহূর্তের জন্য সীতার মুখের উপর সম্বোধন করে ও কোমল আবেগে বিচলিত হয়ে বল্‌লেন, "ভদ্রে! তোমার ইচ্ছা সর্বতোভাবে পূর্ণ করা হবে। কিন্তু, রাবণের প্রাসাদে থাকার জন্য তোমার সুনাম মলিন হয়েছে, এই কারণে তোমার পুরাতন অবস্থায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়।"

রামের এই কথায় আকস্মিক ব্যথা ও বিস্ময়ে সীতা থমকে দাঁড়ালেন, যেন কেউ তাঁকে ছুরিকাহত করেছে। তারপর উন্নত মহিমায় তিনি তাঁর মাথা তুল্‌লেন, তাঁর চোখের জল ঝরে পড়ছে, ঠোঁট দুটি কাঁপছে অনিচ্ছাসত্ত্বেও। তবু, তাঁর কণ্ঠস্বর বেজে উঠলো মধুর ঝংকারে। তিনি বল্‌লেন, "আমার চরিত্র সম্পর্কে সত্যই ভুল ধারণা হতে পারে, এমন কি স্বয়ং রামও যখন আমার চরিত্র গৌরব সম্পর্কে ভুল করতে পারেন, তখন আমার আর কিছুই করার থাকে না। আমার প্রভু, আমার স্বামী নিজেই বলছেন, লঙ্কায় আমি বন্দিনী থাকায় অযোধ্যার সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্যই তিনি আমাকে উদ্ধার করেছেন, তাহলে, তাঁকে সব কষ্ট থেকে মুক্তি দেওয়া আমার উচিত ছিল আগেই। যদি জানতাম যে, তাঁর উদ্দেশ্য অন্যরকম ছিল, তাহলে আমার পক্ষে মৃত্যুবরণ করা কত সহজই না ছিল। লক্ষ্মণ, তুমি যাও, আমার জন্য চিতার আগুন জ্বেলে দাও! আমি মনে করি, আমার জীবনে যে দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে, এইটিই তা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়।

তাহলে সীতার মুখ যে কে তাঁর তত্ত্বাবধান ও সংসার-স্থাপন সম্পর্কে এই ইচ্ছাই প্রকাশিত হোল! বিস্ময়ে ক্রোধে লক্ষ্মণ তাঁর দাদার মুখের দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে একটি নীরব ইশারা পেয়ে তিনি দ্রুত এগিয়ে গেলেন চিতা সাজাতে। সবকিছু ধ্বংসের শেষ মুহূর্তে মৃত্যুর মতো গম্ভীর আর বিষাদময় রামের

মুখমণ্ডল। কেউ তাঁকে একটি কথাও বলতে সাহস করলো না। সীতার দু'গাল বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছে, তবু, তিনি নিশ্চল পাথরের মতো মূর্তিমতী ধৈর্যের রূপ ধরে দাঁড়িয়ে থাকলেন সেখানে।

কাঠগুলি স্তূপীকৃত করে সাজিয়ে যখন আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হোল সীতা তাঁর স্বামীর চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করলেন। রাম দাঁড়িয়েছিলেন নিজের জায়গায় নত মস্তকে। সকলেই স্পষ্ট অনুভব করলেন সীতার হৃদয় যেন মাধুর্যে ভরে উঠছে। তারপর জ্বলন্ত চিতার কাছে এগিয়ে দুটি হাত জোড় করে তিনি দাঁড়ালেন প্রার্থনার ভঙ্গীতে। বল্লেন, "হে অগ্নিদেব, তুমি জগৎ সমূহের সাক্ষী! আমার অন্তর চিরকাল শুদ্ধ তুমিই জানো, তুমি আমাকে রক্ষা করো! হে পবিত্র অগ্নিশিখা, তুমি আমাকে স্থান দাও!"

এই কথাগুলি বলে জ্বলন্ত চিতার চারপাশে তিনবার প্রদক্ষিণ করে নির্ভীক চিত্তে জগতের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সীতা আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলেন। সীতার অগ্নি প্রবেশ দেখে সকলের মনে হোল যেন সোনার তৈরী বেদীতে সোনার প্রতিমা পা রাখলেন। উপস্থিত সকলে এই দৃশ্য দেখে করুণ বিলাপ ধ্বনিতে হায় হায় করে উঠলো।

কিন্তু, কী আশ্চর্য! সীতার পা আগুনে স্পর্শ করার সংগে সংগে স্বর্গ থেকে ভেসে এল মধুর দৈববানীর মধ্যে রামের গৌরব-গাথা। আর, তারপর আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন স্বয়ং অগ্নিদেব। সীতাকে ডান হাতে নিয়ে জ্বলন্ত আগুনের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে তিনি তাঁকে রামের কাছে এনে দিলেন। আনন্দে রামের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

অগ্নিদেব বল্লেন, "হে রাম! সীতা আপনার, একান্তই আপনার। আপনারই অনুগতা, চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে আপনারই অনুরাগিণী ও বিশ্বস্তা। আমি, যেহেতু সকল পাপ পুণ্যের সাক্ষী, আমি বলছি, আপনি তাঁকে আবার গ্রহণ করুণ!"

রাম সীতাকে গ্রহণ করে বল্লেন, প্রিয়ে, তোমার চরিত্র সম্পর্কে আমার মনে সত্যসত্যই কোন সন্দেহ ছিল না। তবুও সকলে উপস্থিতিতে তোমার এই অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন ছিল। তুমি আমারই। আমি তোমাকে ত্যাগ করতে পারি না। আর, তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্নও হতে পারি না। যেমন সূর্য তাঁর নিজের রশ্মি থেকে পারেন না বিচ্ছিন্ন হতে।"

রাম ও সীতা দুজনে নব বিবাহিত দম্পতির মতো উঠে দাঁড়ালেন, স্বয়ং অগ্নিদেবের সাহায্যে। উপস্থিত সকলের মনে হোল, স্বর্গের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে অকস্মাৎ। আর, তাঁরা দেখলেন, দশরথ রথের উপর থেকে আশীর্বাদ করে রাম ও সীতাকে অযোধ্যার রাজা রাণীরূপে অভিবাদন জানালেন।

বাস্তবিক, তাঁদের চোদ্দ বছরের নির্বাসন জীবনের সমাপ্তি ঘটতে চল্লো এবার। রামও এই দৃশ্য দেখে বুঝতে পারলেন, তাঁর রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ না হওয়া

পর্যন্ত তাঁর মৃত পিতার আত্মার শান্তি হতে পারে না। তাই, লঙ্কা থেকে যত শীঘ্র সম্ভব বিদায় নেওয়ার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। দু'একদিনের মধ্যে সেনাবাহিনীর মধ্যে নানারকম ধন দৌলত ও পুরস্কার বিতরণ করে সাদা রাজহাঁস বাহিত রথে চড়ে আকাশ পথে সীতাকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত অযোধ্যায় এসে পৌছলেন।

তারপরের দিনগুলিতে রামের শাসন কালে কোশল রাজ্য সুখ শান্তি ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো। বিধবাদের দুঃখ দুরে চলে গেল। বন্য প্রাণী কিংবা রোগ ব্যাধি থেকে মানুষের আর কোন ভয় থাকলো না। দস্যুর অত্যাচার কিংবা অন্যান্য অসুবিধার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে মানুষ নিরাপদে বাস করতে থাকলো। কেউ কারও প্রতি হিংসার মনোভাব পোষণ করতো না। গাছে গাছে ফল ও ফুলের প্রাচুর্য। মানুষ যখনই প্রয়োজন বোধ করতো, তখনই বৃষ্টিপাত হোত, আর বাতাসের গতিও ছিল সুখপ্রদ। রামের শাসনাধীনে সব মানুষ হয়ে উঠলো ধার্মিক ও সত্যবাদী। তাঁর রাজ্য সকল রকম সৌভাগ্যের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে উঠলো।

কী সুন্দরই না হোত, যদি এইভাবেই গল্পটি শেষ হতে পারতো! মহাকবি বাল্মীকিরও সেই ইচ্ছা ছিল। শত শত বছর ধরে লোকেরা এই কাহিনীর পরিণাম এই ভাবেই জেনে এসেছিল। কিন্তু পরবর্তী কোন যুগে নূতন করে উপসংহার রচিত হোল। রচনা করলেন কোন এক অজ্ঞাত লেখক। এই শেষ অধ্যায় বড় করুণ ও বিষাদময় এই কাহিনীর মধ্যে বলা হয়েছে, সীতার সেই কঠোর অগ্নি পরীক্ষা অযোধ্যা থেকে বহুদূরে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য জনসাধারণের পক্ষে যথেষ্ট সন্তোষজনক ছিল না। তাদের মধ্যে যে সন্দেহের গুঞ্জনের কথা রাম আগেই তাঁর দূরদর্শিতা দিয়ে বুঝতে পেরেছিলেন তা শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়লো। রাম যখন তা শুনতে পেলেন, তিনি বুঝলেন যে, এই অনিবার্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করা অর্থহীন, বরং, তাঁর এবং সীতার এরপর থেকে আলাদা বসবাস করাই শ্রেয়ঃ। প্রজাপুঞ্জের কল্যাণের জন্য রাজাকে যে কোন প্রকার ত্যাগে প্রস্তুত থাকতে হবে, এবং, রাম এও অনুভব করলেন যে, রাজার সম্পর্কে প্রজাসাধারণের মনে যদি কোন ভুল ধারণা থাকে, তবে তার ফলে কোন মঙ্গল হয় না। রাম যদিও মনে মনে এই বীরত্বপূর্ণ সদিচ্ছা পোষণ করলেন, কিন্তু সীতার মুখের উপর তাঁকে বিদায় জানাবার মতো শক্তি তাঁর ছিল না। তিনি তাই সীতাকে লক্ষ্মণের তত্ত্বাবধানে পাঠিয়ে দিলেন সুদূর গঙ্গাতীরে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে দীর্ঘ তীর্থবাসের জন্য। সেখানে লক্ষ্মণ তাঁকে শেষ বিদায় জানিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলেন।

সীতার এই বিচ্ছেদ বেদনা কী মর্মান্তিক! প্রকৃতপক্ষে তাঁর একটিমাত্র সান্ত্বনা ছিল এই যে, তিনি ও রাম পরস্পরকে চিনেছিলেন। দু'জনে দুজনের উদ্দেশ্যে যে শেষ কথা জানালেন, তাতে এই বিচ্ছেদ যেন পবিত্র প্রতিজ্ঞায় অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে থাকলো। যদিও সীতা বুঝতে পেরেছিলেন, স্বামীর সংগে তাঁর এই বিচ্ছেদ চিরকালের। এরপর, তাঁদের সম্পর্ক হয়ে থাকবে আত্মার সংগে আত্মার, কেউ আর কারও মুখ এজীবনের মতো দেখার আশা করতে পারবেন না।

পিতৃসদৃশ বাল্মীকি মুনির আশ্রমে, তাঁর অভিভাবকত্বে সীতার বিরহভারাতুর জীবনের কুড়িটি বছর চলে গেল। সীতার দুটি যমজ সন্তান বাল্মীকি মুনিকে তাদের ঠাকুরদার মতো শ্রদ্ধা করে বড় হয়ে উঠলো। এইভাবে কুড়ি বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে অযোধ্যায় রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সংবাদ এসে পৌছলো মহর্ষির আশ্রমে। ইতিমধ্যে বাল্মীকি রামায়ণ রচনার কাজ শেষ করে রামের দুই ছেলে লব ও কুশকে শিখিয়ে ফেলেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যজ্ঞ উপলক্ষ্যে ছেলে দুটিকে তিনি অযোধ্যায় সংগে নিয়ে যাবেন, তারা তাদের বাপের সামনে সেখানে রামায়ণ কাব্যের গান গেয়ে শোনাবে।

রামায়ণ গান শেষ হওয়ার অনেক আগেই রাম বুঝতে পেরেছিলেন, বালক দুটি তাঁরই সন্তান। এই কাব্য রচনায় লেগেছিল দীর্ঘ বহুদিন, কিন্তু রাম ও তাঁর সভাসদরা এই বিরাট কাব্য শেষ পর্যন্ত শুনলেন পরম আগ্রহে। তারপর, দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাম মহর্ষি বাল্মীকিকে বললেন, "হায়, সীতা যদি এখানে থাকতো! কিন্তু, সে আর দ্বিতীয়বার পরীক্ষা দিতে কিছুতেই সম্মত হবে না!' বাল্মীকি বললেন, "আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করব।" বাল্মীকির সব কিছুর ওপরে দীর্ঘদিনের মনের স্বপ্ন স্বামী স্ত্রী দুজনকে আবার একত্র করা, তাঁদের সুখী করা।

রাম বিস্ময়ের সংগে সংবাদ পেলেন যে, সীতা অযোধ্যায় উপস্থিত হওয়ার পরদিনই দ্বিতীয়বার প্রকাশ্য জনসমক্ষে পরীক্ষায় সম্মত আছেন। তবে, এবার তিনি শপথ করবেন, আগের মতো সেই কঠিন অগ্নিপরীক্ষা নয়।

সকাল হোল। রাজা, তাঁর মন্ত্রী পরিষদ, সহকারীরা সব যে যাঁর আসনে বসে আছেন। দেশের সব এলাকা থেকে সব স্তরের ও শ্রেণীর বিভিন্ন মর্যাদার বিরাট জনতাকে সীতার পরীক্ষার সময় উপস্থিত থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাল্মীকিকে অনুসরণ করে সীতা এসে উপস্থিত হলেন সভায়। তাঁর দু'চোখে জল; করযোড়ে, নতমুখে, নিজেকে ঘোমটায় আবৃত করে তিনি পায়ে হেঁটে এলেন। তাঁকে দেখে সহজেই বোঝা যাচ্ছিল যে, তাঁর সমগ্র মন যেন রামের চিন্তায় ধ্যানমগ্ন। উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে প্রশান্তি ও আনন্দের গুঞ্জন শুরু হোল। কিন্তু পরমূহূর্তে কি ঘটবে তখন তাদের মধ্যে একজনও কেউ কি এতটুকুও কল্পনা করতে পেরেছিল।

বাল্মীকি সীতাকে সভার মধ্যে রামের কাছে পৌছে দেওয়ার পর রাম সীতাকে তাঁর নিজের বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে শপথ করার আহ্বান জানালেন উপস্থিত সকলের সামনে। এরপর সকলেই অনুভব করলো একটা ঠাণ্ডা সুগন্ধ বাতাস বইতে শুরু করেছে, যেন নিকটে কোথাও স্বর্গ থেকে দেবতারা এসে উপস্থিত হয়েছেন। কেউই সীতার উদ্দেশে রামের কথাগুলির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে প্রস্তুত নন্।

সীতা—সেই সমুন্নত মহিমায় ও নম্রতায় অচঞ্চল আত্মা সারা জীবন তাঁর পক্ষে যতখানি সম্ভব দুঃখের বোঝা বহন করেছেন। পরিপূর্ণ মাধুর্য ও পরিপূর্ণ আনুগত্যের প্রতীক সীতা জীবনের কুড়িটি বছর স্বামীর বিরহে নিঃসঙ্গ একাকীত্বের বেদনা বহন

করেছেন, এতটুকু আপত্তির গুঞ্জন তোলেননি। কিন্তু আজ সবকিছুই সমাপ্তি হতে চললো। তিনি কেঁদে উঠলেই, "ওগো আমার দৈব জননী! তুমি ধরিত্রী দেবী, যদি আমার অন্তরে একমাত্র রাম ছাড়া আর কারও চিন্তা না করে থাকি, আর একথা যদি সত্য হয়, তবে আমার সতীত্বের ধর্ম রক্ষার জন্য তুমি আমাকে গ্রহণ করো! যদি আমার চিন্তায়, কথায় ও কর্মে অবিরাম আমার স্বামীর মঙ্গল কামনা করে থাকি, তবে আমার সেই পুণ্যের জন্য, মাগো ধরিত্রী! তুমি আমাকে তোমার কোলে আশ্রয় দাও!"

সীতার এই ক্লান্ত করুণ কান্নার ধ্বনিতে একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটলো। পৃথিবী দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল, এবং একটি বিরাট রত্নমণ্ডিত সিংহাসন ভূগর্ভ থেকে উঠে এল উপরে। সিংহাসনটি ধারণ করে আছে পাতালের সর্পরাজগণ তাদের মাথায়। আর, সেই অপূর্ব সিংহাসন আলো করে বসে আছেন স্বয়ং ধরিত্রী দেবী। তাঁর প্রসারিত দুটি হাত দিয়ে আদরের কন্যা আশ্রয় ভিখারিণী সীতাকে কোলে টেনে নেবেন তিনি। এমন সময় তাঁদের দুজনের মাথার উপর স্বর্গ থেকে ফুল ঝরে পড়লো। সীতাকে নিয়ে ধরিত্রী দেবী পাতালে চলে গেলেন। এই সময় সীতার গৌরব ও মহিমা ঘোষণা করে স্বর্গ থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর। যখন সকলের চোখের আড়ালে অযোধ্যার রাণী সীতা ও ধরিত্রী দেবী অদৃশ্য হয়ে গেলেন তখন এক মুহূর্তের জন্য সমগ্র বিশ্বজগত এক পবিত্র শুদ্ধতায় স্থির প্রশান্ত হয়ে গেল।

একটি হৃদয় কিন্তু এই শান্তিময় পরিবেশের অংশীদার হতে পারলো না। দুঃখে রামের হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। সীতা তাঁর প্রতি যেমন অনুরাগিনী ছিলেন, তিনিও তেমন সীতার প্রতি অনুরাগী ছিলেন। যে সব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে রাণীর উপস্থিতিও সাহসের প্রয়োজন দেখা দিত, সেই সব অনুষ্ঠান সম্পাদনের জন্য সীতার সোনার মূর্তি করিয়েছিলেন তিনিও সেই মূর্তিকে পাশে রেখে তাঁর কাজ শেষ করতেন। যতদিন না সেই সময় উপস্থিত হোল, যে সময়ের পরে মানুষ আর থাকতে পারে না, ততদিন এই ভাবেই চললো সবকিছু।

তারপর একদিন সময় ঘনিয়ে এলো। রাম এবং তাঁর ভাইরা এ জগতকে বিদায় জানিয়ে অযোধ্যার বাইরে নদীতীরে গিয়ে তাঁদের দিব্য দেহে প্রবেশ করলেন। এ জগতের মানুষ আর কোনদিন তাঁদের দেখতে পেল না।

যুগের পর যুগ চলে গেছে, সেই দিনগুলির কাহিনী স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে, কারণ, তাঁদের সময়কার কোন কিছুই এ পৃথিবীতে আজ আর বেঁচে নাই।

কৃষ্ণ-চক্রের কাহিনী

কৃষ্ণ-চক্রের কাহিণী

ভারতীয় শিশু কৃষ্ণের জন্ম

"দেবকীর পরম স্বর্গীয় আনন্দ!"

মথুরার অত্যাচারী রাজা কংসের দুষ্ট প্রকৃতি ও নিপীড়ন মূলক ব্যবহার মানুষের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। স্বয়ং পৃথিবী তার অন্যায় ও অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে কেঁদে উঠলেন। যারা আর কংসের অত্যাচার সহ্য করতে পারলো না, তাদের সান্ত্বনার জন্য ঐ অত্যাচারীর নিধন সম্পর্কে একটা দৈববাণীর গুজব নিয়ে কানাকানি শুরু হয়ে গেল। এই দৈববাণীর উৎস সত্যই অত্যন্ত বিস্ময়কর।

কংস তার বোন দেবকীকে খুবই স্নেহ করতো, আর, তার বন্ধু ও সম্রান্ত পারিষদদের মধ্যে অন্যতম বসুদেবকেও ভালবাসতো খুব। কংস দেবকী ও বসুদেবের মধ্যে বিয়ে দিতে সচেষ্ট হোল, আর, বিয়ের শেষে নিজেই তাদের রথের সারথি হয়ে বসুদেবের বাড়ীতে বর কনেকে পৌছে দিতে গেল। কিন্তু, পরে দৈববানী ভেসে এল আকাশ থেকে" হে অত্যাচারী কংস, এই সম্পত্তির অষ্টম সন্তান তার বার বছর বয়সে নিজের হাতে তোমাকে বধ করবে!" এই দৈববাণীর ফলে ভগ্নী ভগ্নীপতির জন্য কংসের ভালবাসা পরিণত হোল ঘৃণায়। সংগে সংগে কংস রথের ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে দিল মথুরার দিকে। আর, মথুরা পৌছেই নিজের প্রাসাদের নীচে মাটির গর্তে অন্ধকার কারাগারে নিক্ষেপ করলো তাঁদের। সেখানে তাঁদের সারা জীবন কাটাতে হবে বন্দীদশার মধ্যে। তাহলে তাঁদের প্রতিটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংগে সংগে তাকে হত্যা করতে সুবিধা হবে কংসের।

এই ভাবে তাঁদের সাতটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হোল, এবং প্রথম থেকে জন্মের সংগে সংগে এক একটিকে একই উপায়ে হত্যা করে এলেও একটিকে কংস বধ করতে পারলো না। বলরামকে গোপনে অন্যত্র সরিয়ে দিয়ে রাজাকে সংবাদ দেওয়া হোল যে, এবার মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। যাইহোক, এবার সেই দৈববাণী সফল হওয়ার দিকে সময় এগিয়ে এসেছে। দেবকী ও তাঁর স্বামী তাঁদের কারাগারে বসে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন, সেই শিশুটির জন্মলাভের জন্য, যিনি মানুষের পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে আসবেন।

বাইরে বাতাসের আর্তনাদ, বৃষ্টি পড়ছে অবিরাম। বন্যার মতো স্ফীত হয়ে উঠেছে যমুনার জল। রাত্রির এই দুর্যোগের মধ্যে পবিত্র শিশু-কৃষ্ণ পৃথিবীতে আসবেন। কম্পিত বুকে দেবকী ও বসুদেব মথুরার অন্ধকার কারাগৃহে অপেক্ষা করছেন তাঁদের অষ্টম সন্তানের ভূমিষ্ঠ লাভের জন্য। তাঁরা জানতেন, দৈববাণী অনুসারে এই শিশুটিই অত্যাচারী কংসের হত্যাকারীরূপে নির্দিষ্ট। ঠিক এই কারণেই কি

তাঁরা আজ কারাগারে বন্দী নন্? নিজেদের মধ্যে তাঁরা নিদারুণ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন, কি দিয়ে তাঁরা আসন্ন নবজাতককে অভ্যর্থনা করবেন? এটাও তাঁরা খুব ভালভাবেই জানতেন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংস নিজে কারাগারে ঢুকে শিশুটিকে নিজের হাতে বধ করবে। চার পাশে কারাগারের নিষ্ঠুর দেওয়ালের মধ্যে তাঁরা আবদ্ধ, বাইরে ঝড়ের গর্জন তাঁদের প্রতীকার প্রতিটি মুহূর্ত কী ভয়ানক সংকটপূর্ণ! অভাগিনী দেবকীর বুকের মধ্যে একদিকে আশা ও মাতৃ হৃদয়ের স্নেহ, আর একদিকে বিষাদ ও ভয়ের কালো মেঘ।

ধীরে ধীরে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা কেটে গেল। তারপর, প্রাসাদের বাইরে যখন প্রহর ঘোষণার জন্য বেজে উঠলো ঘণ্টাধ্বনি একটার পর একটা, দেবকী ও বসুদেবের অন্তর ভরে উঠলো আনন্দে, কারণ, ঠিক সেই বহু প্রত্যাশিত শিশুটি তাঁর মায়ের গর্ভ থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এলেন। মুহূর্তের জন্য শিশুটিকে নিজের কোলে নিয়ে দেবকী ভুলে গেলেন আগামী সকালের কঠিন পরীক্ষার কথা, ভুলে গেলেন, তাঁর এই শিশু সন্তানটির জন্য অপেক্ষা করে আছে নিষ্ঠুর মৃত্যু। শুধু অফুরন্ত মাতৃ স্নেহে নবজাতক শিশুটি অভিষিক্ত হলেন।

তাঁর জন্মমুহূর্তে শিশুর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত আলোয় কারাকক্ষ মৃদু আলোকে ভরে উঠলো। মায়ের কোলে শায়িত শিশুর পিছনে দেবকী ও বসুদেব দুজনেই দেখলেন, চারিটি বাহুর প্রসারিত উজ্জ্বল রেখা। তাঁর এক হাতে শঙ্খ, আর এক হাতে চক্র, তৃতীয় হাতে গদা ও চতুর্থ হাতে তিনি ধারণ করে আছেন প্রস্ফুটিত পদ্ম। তাঁরা জানতেন, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম জগতের পরিত্রাতা ভগবান বিষ্ণুর চিহ্ন। তাঁরা নবজাতককে নারায়ণ রূপে প্রণাম ও পূজা করলেন। প্রণাম শেষ হওয়ার সংগে সংগে আর একবার তাঁদের উপর নেমে এল মায়ার আবরণ এবং শিশুটি এবার তাঁদের নিজের সন্তানরূপেই দেখা দিলেন।

যাইহোক, এবার তাঁরা একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন। প্রথমে তাঁরা নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। ভাবলেন, বাইরে থেকে ভেসে আসা বৃষ্টি ও বাতাসের শব্দ হতে পারে। কিন্তু এবার তাঁরা কান পেতে স্পষ্ট শুনতে পেলেন এই কথাগুলি, "ওঠো! শিশুকে নিয়ে এখনই চলে যাও গোকুল গ্রামে গো-পালকদের প্রধান নন্দের বাড়ীতে। সেখানে এই শিশুকে রেখে তার বাড়ীতে এখনই যে কন্যা সন্তানটি জন্মেছে, তাকে এখানে নিয়ে চলে এসো।"

এর কী অর্থ হতে পারে? কারাগারের একজন অসহায় বন্দী, যাঁর কারাকক্ষের বাইরে যাওয়ার কোন উপায় নাই, তিনি কেমন করে যমুনার দূরবর্তী তীরের একটি গ্রামে শিশুটিকে নিয়ে যাবেন? কি করেই বা বসুদেব এই কারাকক্ষের দরজা খুলবেন? যদিও এসবই সম্ভব হয়, তিনি কেমন করেই বা এই অসময়ে যমুনা নদী অতিক্রম করতে সক্ষম হবেন? তবু, এক অবোধ্য আবেগের শক্তি তাঁদের উপর ভর করলো। কারণ, আগামী সকালেই শিশুর অদৃষ্ট সম্পর্কে তাঁদের আশংকা ও ভয়ের

অন্ত ছিল না। সুতরাং, বসুদেব সেই অদৃশ্য থেকে আসা নির্দেশবাণী অনুসরণ করাই ঠিক সাব্যস্ত করলেন। তিনি নিজের পোশাকের নীচে ঢেকে শিশুটিকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ও কারাকক্ষের দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তারপর বিস্মিত হয়ে দেখলেন, দরজার খিল সরে গেল, তালাগুলি খুলে গেল, আর শেকলগুলি শিথিল হয়ে পড়ে গেল, এবং নিজে থেকেই ভারী দরজাগুলি সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। কারাকক্ষের দরজার বাইরে পাহারাদার ও সৈনিকরা গভীর ঘুমে অচেতন, তারা কেউই জেগে উঠলো না। বসুদেব শিশু কৃষ্ণকে তাঁর পোশাকের মধ্যে ভালভাবে ঢেকে নিয়ে খোলা রাস্তায় গিয়ে পড়লেন।

কারাগারের ভিতর থেকে যেমন মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে বাইরে বৃষ্টি ও বাতাসের গতি তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত ও ক্রুদ্ধ বাতাসের গর্জনের মধ্যে বসুদেবের মন বিষন্ন চিন্তার বোঝায় ভারী হয়ে উঠলো। মনে হোল যেন অশুভ লক্ষণের পূর্বাভাস। দূরে সামনে বিরাট বিস্তৃত খরস্রোতা নদী, বসুদেব ভাবলেন বিস্মিত হয়ে, কি করে তিনি নদীর ওপারে পৌছবেন।

এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে তিনি একটি শেয়াল দেখতে পেয়ে সেই বন্য প্রাণীটিকে তাঁর পথপ্রদর্শক হিসাবে অনুসরণ করতে মনস্থ করলেন। নদীতীর পর্যন্ত শেয়ালটার পেছন পেছন চলতে থাকলেন। তারপর শেয়ালটা নদীর মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে এসে নেমে গিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলতে থাকলো, আর, বসুদেব পায়ে পায়ে সেই পথ ধরে নদীর অপর পারে পৌছে গেলেন। লোকেরা বলে থাকে, এই দেব শিশুকে রক্ষা করার জন্যেই স্বর্গের রাণী ও বিশ্বজননী দুর্গা সেই রাত্রে পৃথিবীর মাটিতে নেমে এসেছিলেন শেয়ালের ছদ্মবেশে।

এমনও বলা হয়, বসুদেবের হাতে শিশুটি পরপর এমন ভারী হতে থাকলো যে, একসময় তিনি তাঁর হাত থেকে পড়ে গেলেন। শিশুটি জলের মধ্যেই তলিয়ে যেতেন, কিন্তু বসুদেব তাঁকে উদ্ধার করে আবার নিরাপদে রক্ষা করলেন। এর কারণ; মা যমুনাও ব্যাকুল হয়েছিলেন, স্বয়ং ভগবানকে একবার একমুহূর্তের জন্য তাঁর কোলে নিতে।

অবশেষে বসুদেব এই দুর্লভ রত্নটিকে নিয়ে গো-পালকদের রাজা নন্দের বাসস্থান গোকুলে এসে উপস্থিত হলেন। নন্দের বিরাট বাসভবনের দরজা তাঁর চোখের সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। বন্দীশালার সেই দৈববাণীর নির্দেশমত তিনি যেভাবে এতখানি পথ অনুসরণ করে এসেছেন, ঠিক সেইরকম খোলা দরজা দিয়ে আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে দেখলেন প্রথম ঘরটিতে আলো জ্বলছে। ঘুমন্ত মা ও একটি সদ্যোজাত শিশুর বিছানার পাশেই প্রদীপটি জ্বালানো। খুব ধীরে ধীরে বসুদেব নীচু হয়ে শিশু দুটিকে পরিবর্তন করে নিলেন। তিনি যে শিশুটিকে বয়ে নিয়ে এসেছেন, তাকে নন্দের ঘুমন্ত স্ত্রীর বিছানায় শুইয়ে দিয়ে সেই বিছানার ওপর থেকে ছোট্ট শিশু-কন্যাটিকে তুলে নিলেন তাঁর কোলে। তারপর, চুপিচুপি যে পথ ধরে এসেছিলেন, সেই পথ

ধরে মথুরা সহরে কংসের কারাগারে ফিরে গিয়ে নিজের স্ত্রী দেবকীর হাতে তুলে দিলেন সেই শিশু কন্যাটিকে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে গো-পালকরা যখন দেখলো যে তারা যে শিশুটিকে কন্যা মনে করেছিল, আসলে সেই শিশুটি একটি বালক, তখন তাদের মধ্যে বিরাট আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। কারণ, এই রহস্যের ব্যাখ্যা একমাত্র আনন্দ উৎসবের মধ্যেই তারা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সেদিন নন্দের বাড়ীতে কোন খাদ্যবস্তুই ছিল না। মহিলারা যখন শুনলো এই সংবাদ, তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে তাদের হাতের সব দুধ ও দইর পাত্র মাটিতে পড়ে ভেঙে গিয়েছিল। তারপর, আনন্দের ধুম পড়ে গেল। নন্দের বাড়ীতে এসে হাজির হোল হাজার হাজার লোক। তাদের প্রত্যেককে খাওয়ানো হোল, আর, তাদের অর্থ দান করা হোল। ভারতে এইটিকে নন্দের ভোজনোৎসব বলা হয়। সকলেই বিশ্বাস করে এই উৎসবের আগের দিন চিরকাল বৃষ্টি হয়ে থাকে।

একই সকালে কংস শুনলো যে আগের রাত্রে কারাগারের মধ্যে দেবকী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছে। অত্যাচারী কংস ক্রোধে ভয়ঙ্কর রূপ ধরে সদলবলে প্রহরীসহ সেই অন্ধকার কারাকক্ষে এসে হাজির হোল। যে শিশু তাকে বধ করার জন্য জন্মেছে, তাকে সে নিজের হাতেই হত্যা করবে।

রাজা বিস্মিত হয়ে দেখলো, শিশুটি আদৌ কোন পুরুষ শিশু নয়, বরং, কন্যা। কংস যদি একটু কম শয়তান ও কম অত্যাচারী হোত, তাহলে এইখানেই নিজেকে দমন করতো। কারণ, কদাচিৎ কল্পনা করা যায় যে, এই কন্যাটি তার বার বছরের বালিকা বয়সে কংসের মত একজন পুরুষকে বধ করতে সক্ষম হবে। তাছাড়া, দৈববাণীতে বালিকার কথা নয়, বালকের উল্লেখ করা হয়েছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। কিন্তু, এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপারে কংসের ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। সে শিশুটির পায়ে ধরে কারাকক্ষের দেওয়ালে আছড়ে মেরে ফেলার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু, তার স্পর্শের সংগে সংগে সকলে বিস্ময়ের সংগে দেখলো শিশুটি তার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে গিয়ে তাঁদের মাথার অনেক উপরে এক উজ্জ্বল দেবী মূর্তিতে পরিণত হয়ে বলে উঠলো বিদ্রুপের ভঙ্গীতে, "তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।"

তারপর সেই উজ্জ্বল আলোক মূর্তিটি বিলীন হয়ে কোন পথে অদৃশ্য হয়ে গেল কেউ বলতে পারলো না।

এরপর থেকে অত্যাচারী কংশের অন্তর ক্রোধে ও প্রতিহিংসায় জ্বলতে থাকলো দীর্ঘকাল ধরে। কৌশলে দেবতাদের পরাভূত করা ও বালক কৃষ্ণকে বধ করার জন্য তার জ্বলন্ত প্রতিশোধ স্পৃহার কোন বিরাম ছিল না।

অলৌকিক শৈশবাবস্থা

অত্যাচারী কংস জানতে পারলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ হত্যাকারী জন্মেছে, আর, মথুরা রাজ্যের কোথাও না কোথাও সে বড় হচ্ছে। তখন তার সভাসদ্দের পরামর্শে প্রত্যেকটি নবজাত শিশুকে হত্যা করার মনস্থ করে রাজ্যের সর্বত্র চর পাঠিয়ে দিল। কংসের অধীনে তারজ্ঞাতি ও আত্মীয় কুটুম্বদের মধ্যে এমন সব শক্তিশালী লোক ছিল, যারা ইচ্ছা করলে যে কোন সময় যে কোন রূপ ধারণ করতে পারতো। এমনকি তারা আকাশপথেও উড়ে যেতে পারতো।

এদের মধ্যে কয়েকজনকে রাজ্যের সর্বত্র নির্দোষ শিশু হত্যার জন্য কংস গোপনে পাঠিয়ে দিল। এদের মধ্যে একজন ছিল পুতনা। সে সহর, গ্রাম, জঙ্গল সব জায়গায় ঘুরে ঘুরে শিশু হত্যা করে বেড়াত। একদিন সন্ধ্যার দীর্ঘ ছায়ার মধ্যে পুতনা গোকুলে এসে ঢুকলো। গোকুলে ঢোকার আগে পুতনা ধারণ করলো এক অপরূপ সুন্দরী নারীর বেশ। তাকে দেখে লোকেরা মনে করলো কোন এক দেবী তাদের দলপতি নন্দের পুত্র সন্তানকে। এদিক ওদিক ঘুরে গোপনে পুতনা নিঃসন্দেহ হোল যে, গোকুলে নন্দের বিরাট বাড়ীতে যে শিশুটি জন্মেছেন, তিনিই কনিষ্ঠতম। পুতনা এবার নন্দের বাড়ীতে ঢুকে শিশু কৃষ্ণকে দেখলো। পুত্না যখন নীচু হয়ে শিশুটিকে তার দু হাতের মধ্যে তুলে নিতে চাইল, তখন শিশুকৃষ্ণ তার মতলব বুঝতে পেরে চোখ দুটি বন্ধ করলেন। এই মুহূর্তে পুতনাও তাকে কোলে তুলে নিল। আর আর যে সব মেয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিল বা বসেছিল, তাদের মনে কোন সন্দেহ এল না। তারা শুধু এই নবাগতার বাইরের সৌন্দর্য ও মধুর ব্যবহারটুকু দেখলো। তারা স্বপ্নেও কোনদিন ভাবতে পারেনি যে, এই সুন্দরী নারী আসলে একটি রক্তচোষা ধাই, আর তার স্নেহের অর্থ সব শিশুর পক্ষেই মৃত্যু ; তার বুকটা কঠিন আবরণের নীচে ঢাকা একটা ধারালো অস্ত্রের মত। অনেক আদর যত্ন করার পরে পুতনা শিশুকে তার বুকের দুধ খাওয়াতে চেষ্টা করলো। তার বুকে দুধ ছিল না. ছিল মৃত্যুর ভয়ঙ্কর বিষ। কিন্তু, শিশুকৃষ্ণ তাঁর ছোট্ট মুখটি দিয়ে বুক স্পর্শ করে একটা মৃদু টান দিলেন মাত্র, যেমন আর সব শিশুরা করে থাকে। আর, তৎক্ষণাৎ ডাইনির জীবনবায়ু বেরিয়ে এল তার শরীরের ভিতর থেকে। বিকট চীৎকার করে সে পড়ে গেল মাটিতে। সংগে সংগে তার ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেল, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তার রূপ। রক্তচোষা ডাইনির মৃত্যুযন্ত্রনার আর্তনাদ শুনে প্রত্যেকে ছুটে এল সেখানে। এসে দেখলো, অলৌকিক শিশুটি হাসতে হাসতে হাত পা ছুঁড়ে খেলা করছেন, যেন, তাঁর রহস্যময় শক্তির স্পর্শে শিশুঘাতিনী শত্রুর নিধন সম্পর্কে একেবারেই কিছুই জানেন না।

কিন্তু, কংসের কাছে যখন তার চরের এই মৃত্যু সংবাদ পৌছলো ; সে আরও জানলো যে, পুতনা শিশুটিকে বধ করতে পারেনি, তখন তার মনে নিশ্চিত ধারণা হোল, এইটিই সেই দৈববাণীর নির্দিষ্ট শিশু। কংস মনে মনে দৃঢ় সিদ্ধান্ত করলো, এই শিশুকে বধ করার জন্য সে চেষ্টার কোন ত্রুটিই রাখবে না।

নন্দের রাণী ও শ্রী কৃষ্ণের পালিকা মাতা যশোদার চেয়ে সুখী মহিলা আর কেউ ছিল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি তাঁকে তাঁর কোলে নিয়ে, খাইয়ে, খেলা করে ও ঘুম পাড়িয়ে কাটাতে লাগলেন আনন্দে। তাঁর বিরাট শক্তি অথবা তিনি কে, এ বিষয়ে যশোদার মনে কোন প্রশ্ন নাই। তাঁর কাছে কৃষ্ণ শিশু সন্তান ছাড়া আর কি ?

একদিন যশোদা কোন কাজে কোথায় একটু দূরে চলে গেলেন। যাওয়ার আগে তিনি কৃষ্ণকে শুইয়ে দিলেন একটি অনেক দিন ধরে পড়ে-থাকা অকেজো গরুর গাড়ীর তলায় মাটির ওপর। এই অকেজো গরুর গাড়ীটা এখন দই মাখন ইত্যাদি তৈরীর জন্য দুধের সব বড় গামলা রাখার আসনে পরিণত হয়েছে। ধুলো থেকে আড়াল করার জন্যে পাত্রগুলির উপর ঘাস-পাতা দিয়ে ঢাকা, আবার সকলের উপর বাঁশের তৈরী মাদুর দিয়ে আচ্ছাদন রচনা করা হয়েছে। এরই নীচের ছায়ায় শুয়ে আছেন শিশু কৃষ্ণ, তাঁর চারদিকে উঠোনের মধ্যে খেলা করছে আরও সব ছেলে-মেয়েরা। এমন সময় শকট দৈত্য এসে গাড়ীর মধ্যে ঢুকে বসলো। তার মতলব, গাড়ীটাকে সহজে ফেলে দিলে শিশুটিকে একেবারে পিষে মেরে ফেলবে, যাতে সকলে এটাকে দুর্ঘটনা বলে মনে করে। কিন্তু, ক্ষুদ্র শিশুটি যে স্বয়ং ভগবান! তাঁর কিছুই বুঝতে বাকী থাকলো না। কোন কিছুতেই তাঁকে প্রতারিত করা যায় না। শকট দৈত্য যখন তার মতলব হাসিল করতে সচেষ্ট হোল, কৃষ্ণ তাঁর ছোট্ট পা দিয়ে গাড়ীটাতে লাথি মারলেন, আর, সেটা গিয়ে একেবারে শূন্যে আছড়ে পড়লো খামারের অন্তপ্রান্তে। সংগে সংগে মারা গেল অসুর শকট। গোলমাল শুনে অবাক হয়ে চারদিক থেকে লোকজন ছুটে এসে দেখলো, শিশুটি জীবিত। দেখে তাদের আনন্দের সীমা থাকলো না। কিন্তু, যখন তারা সব ঘটনা আর সবাইর কাছ থেকে শুনলো, তখন তারা কি বিশ্বাস করলো ? শিশু কৃষ্ণ তখন ঠিক ঠিক হামাগুড়িও যে দিতে পারেন না! কেবল যশোদা হাসিতে অশ্রুতে তাঁর মনের সব আনন্দ বুকে চেপে রেখে অনুভব করলেন, গভীরে এমন কিছু রহস্য আছে, যা কারও বোঝার সাধ্য নাই। অদ্ভুত ধরনের সব বিপদ তাঁর এই ছোট্ট শিশুটির জীবন বিপন্ন করে তুলতে চাইছে, কিন্তু, কোথাও যেন এই শিশুর মধ্যে বিস্ময়কর জ্ঞান আর শক্তি লুকিয়ে আছে। মায়ের পক্ষে এই ব্যাপারগুলি গ্রহণ করা সহজ।

একদিন যশোদা তাঁকে কোলে নিয়ে মাতৃত্বের সব মমতা ঢেলে দিয়ে আদর করছিলেন, তিনি অনুভব করলেন, শিশুটি যেন তাঁর কোলে পর্বতের মতো ভারী হয়ে উঠেছে। তিনি বাধ্য হয়ে তাঁকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন। ঠিক সেই সময়, মুহূর্তের মতো একটা কালো মেঘ তাঁদের দুজনকে ঢেকে ফেল্‌লো। তারপর, মেঘটা যখন চলে গেল, যশোদা দেখলেন, শিশু কৃষ্ণ তাঁর মাথা ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছেন উপরে একটা ঘূর্ণাবায়ুর গলা জড়িয়ে তিনি আরও দেখলেন, গোকুলের আকাশ বাতাস সবকিছু ঝড় আর ধুলোতে কালো হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, ঝড়ের প্রচণ্ড গতি, মনে হোল যেন সেই

শক্তিটির হাতে বাধা প্রাপ্ত হোল, যে শক্তিকে ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। শিশুটিকে ধরার জন্ম বিভ্রান্ত মা ও অন্যান্য সব মহিলারা কেঁদে কেঁদে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছিল। যাইহোক, উদ্বেগের ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলি কেটে যাওয়ার পর গোকুলের আকাশে নেমে এল শান্ত স্তব্ধতা। তারপর নীচে নামতে নামতে গোকুলের মাঝখানে পড়ে গেল সেই ঝড়ের দৈত্যটা। তার হত্যাকারী শিশু কৃষ্ণ তখনও তার গলা টিপে ধরে আছেন!

বাস্তবিকই, যশোদার চিন্তা করার মতো অনেক অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকলো। এদিকে শিশু যখন চার হাত পায়ে হামাগুড়ি দিতে শুরু করলেন, তখন তাঁকে সামলানো দায় হয়ে উঠলো। শিশুটি সব সময় খেলা করতেন কাদা মাটি নিয়ে, কাদা মাটিতে মাখামাখি হয়ে মুখের মধ্যে মাটি পুরে দিয়ে খেতেন। যশোদা অগত্যা রাগ করে তাঁকে শাস্তি দিতে বাধ্য হতেন। একদিন শাস্তি দেওয়ার পর কাঁদবার জন্ম শিশু কৃষ্ণ যখন তাঁর মুখখানি হাঁ করলেন, তখন তাঁর সেই খোলা মুখের হাঁর মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র রূপের প্রকাশ দেখে স্তম্ভিত বিস্ময়ে যশোদার প্রায় ভাব সমাধি হওয়ার মতো অবস্থা হোল। ঐটুকু শিশুর মধ্যে অসীম বিশ্বচরাচর! এ দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি তাঁর চোখ দুটি বন্ধ করলেন। তারপর একসময় দেবতারা দয়া করে তাঁর সামনে মায়ার আবরণ টেনে দিলেন, চোখ খুলে সেই ঐশ্বরিক সত্তাকে তিনি আবার দেখতে পেলেন সন্তানরূপে। শিশুটি তাঁরই সন্তান ছাড়া আর কিছু নয়।

ছোট্ট দুটি হাত সবসময় কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতো আর তাঁর মগজে সব সময় কোন না কোন দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলা করে বেড়াত। একদিন যশোদা সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকার জন্ম একটা লম্বা দড়ি দিয়ে শিশু-কৃষ্ণের কোমরে বেঁধে দড়ির আর এক প্রান্ত একটা গরুর গাড়ীর চাকার ভাঙা চক্রনেমীর সংগে বেঁধে দিলেন। ফলে কোমরে লম্বা দড়ি-বাঁধা শিশুটি একা একা খেলা করবেন, কিন্তু দূরে কোথাও চলে যেতে পারবেন না। একটু দূরে দুটো প্রাচীন গাছ দাঁড়িয়েছিল। গাছ দুটোর মধ্যে খুব বেশী ব্যবধান ছিল না। যেহেতু, দড়িটা লম্বা, তাই শিশুটি মনের সুখে হামাগুড়ি দিয়ে খেলা করতে পারবেন, এই ভেবে যশোদা তাঁর দুষ্টু ছেলে সম্পর্কে খুবই নিশ্চিন্ত মনে সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

কাছাকাছি কেউ নাই, শিশুটি এদিক ওদিক হামাগুড়ি দিতে দিতে ঐ দুটো বিরাট গাছের মাঝখানের ফাঁক দিয়ে এক সময় সত্যি সত্যি এগিয়ে গেল! তাঁর এগোতে থাকার ফলে দড়িতে বাঁধা চক্রনেমীটিও পেছনে টানা হয়ে শেষ পর্যন্ত ঐ গাছ দুটোর মাঝখানের ফাঁকে গিয়ে শক্ত হয়ে আটকে গেল। বেশী কিছু করতে হোল না, তিনি একটু মৃদু হেঁচকা টান দিতেই ঐ দুই বিরাট বনস্পতি বিরাট শব্দে অকস্মাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল। কাছেই দুইহাত ও দুই হাঁটুর উপর ভর দিয়ে হামাগুড়ি দেওয়া কৃষ্ণ নীরবে হাসতে থাকলেন। তাঁর এতটুকুও ভয় নাই।

কিন্তু, এবার একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে গেল। বজ্রপাত হয়েছে, এই ভেবে বহুলোক ছুটে এল সেখানে। আর, তাদের সকলের চোখের সামনে ভেঙে-পড়া গাছ দুটি থেকে বেরিয়ে এলো দু'জন উজ্জ্বল পুরুষ। তারা বর্ণনা করলো, কেমন করে যুগ যুগ ধরে, তারা অভিশপ্ত হওয়ার ফলে, ঐ দুটি গাছের মধ্যে তাদের বন্দী জীবন কাটিয়েছে। আজ স্বয়ং ভগবানের স্পর্শে তাদের সেই বন্দীদশা ঘুচে গিয়ে তারা অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তি পেল। অদৃশ্য হয়ে চলে যাওয়ার আগে তাদের আত্মার মুক্তিদাতাকে তারা প্রণাম ও অর্ঘ্য নিবেদন করে গেল।

আর একদিনের ঘটনা। একটি মহিলা নন্দের বাড়ীতে এল ফল বিক্রী করতে। কিছু ফল পাওয়ার জন্য কৃষ্ণের ইচ্ছা হোল খুব। শিশু কৃষ্ণ তখন চলতে শিখেছেন। তিনি বাড়ীর মধ্যে ছুটে গিয়ে একমুঠো চাল নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু, চালগুলি তাঁর আঙুলের সব ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়তে থাকলো। ফল বিক্রেতা মেয়েটি কৃষ্ণকে দেখে এত খুসী ও তাকে দাম দেওয়ার জন্য তাঁর এই অপটু চেষ্টা দেখে যে এতদূর মুগ্ধ হয়েছিল যে, সে কোন দাম না নিয়েই সবগুলি ফল তাঁকে দিয়ে দেওয়ার জন্য জিদ্ করতে লাগলো। যাইহোক, শেষ পর্যন্ত তাকে পরাস্ত হয়ে বালকের মুঠোর চাল নিতে রাজী হতে হোল। বালক কৃষ্ণ যখন তার ঝুলির মতো করে তৈরী ওড়নার এক কোণে তাঁর হাতের অবশিষ্ট চালগুলি ঢেলে দিতে থাকলেন, তখন দেখা গেল, প্রতিটি চালের কণা ফল বিক্রেতার ঐ ঝুলির কাপড়ের সংগে স্পর্শ হওয়া মাত্রই এক একটি রত্নে পরিণত হয়ে গেল।

বালক কৃষ্ণের আর একটি প্রিয় খেলা ছিল, তাঁর গ্রাম্য বন্ধুদের বাড়ীর গব্যশালায় ঢুকে তাদের সহযোগিতায় যে দুধ মাখন চুরি করা। তাঁর এই চুরি চুরি খেলা সকলেরই ভাল লাগতো, কিন্তু পাছে তিনি সত্যি সত্যি চোরে পরিণত হয়ে যান, এই ভয়ে সব গৃহিণীরা দল বেঁধে যশোদার কাছে অভিযোগ করতে এলো। যশোদা বালককে খুব তিরস্কার করলেন, তারপর তাঁর দধি মন্থনের দড়ি দিয়ে তাঁর ছোট্ট দুটি হাতের কব্জিতে বাঁধতে শুরু করলেন। কিন্তু সবটুকু দড়ি তাঁর ছোট্ট দুটি কব্জিতে জড়াতে গিয়ে দু আঙুল পরিমাণ অভাব পড়ে গেল। তিনি আর একটি দড়ি নিয়ে আগের দড়িটির সংগে জুড়ে নিলেন, তাতেও ঐ একই ফল হোল। তখন তিনি আবার একটি দড়ি নিলেন, আবার একটি, তারপরে আবার একটি, কিন্তু প্রতিবার ঠিক ঐ দু'আঙুল পরিমাণ দড়ির ঘাটতি থেকেই গেল। গব্যশালার সব দড়ি জোগাড় করে একটির পর একটি জুড়েও, তবু স্বয়ং ভগবানের দুটি হাত বাঁধার মতো যথেষ্ট দীর্ঘ হোল না। এবার যশোদা সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের সংগে সমগ্র বিশ্বচরাচরের দৃশ্য অনুভব করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু, বালক কৃষ্ণ যখন দেখলেন যে, এখানে ওখানে তাঁর মা দড়ি জোগাড় করতে করতে খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন, আর, তাঁর হাত দুটি বাঁধার ব্যর্থ চেষ্টায় রীতিমত পরিশ্রান্ত, তখন তিনি ভাল ছেলের মতো আত্মসমর্পণ করলেন। তৎক্ষণাৎ একটি দড়ি পাওয়া গেল, যেটি দিয়ে তাঁর মা ছোট্ট হাত দুটি বেঁধে ফেলতে সক্ষম হলেন।

এইভাবে তাঁর সাত আট বছর বয়স পর্যন্ত সময় কেটে গেল। তারপর সব গো-পালকরা গোকুল থেকে চলে গেল বৃন্দাবনের বনে। এবার কৃষ্ণকে তাঁর দাদা বলরামের সংগে তাঁদের বাবার পশুপাল নিয়ে মাঠে চরাতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হোল।

তারকা চিত্রাবলী

সোনালী শৈশবের দিনে তারা ঘেরা আকাশের প্রতি আদিম মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধায় ফিরে যাবার স্বপ্ন দেখেছি আমরা অনেকেই। প্রাচীন কালে, বিশেষতঃ দক্ষিণের উষ্ণ দেশগুলিতে যে সব দেশে দিনটা ছিল যন্ত্রনা-বিশেষ, রাতটি ছিল আনন্দময়, তখন নিশ্চয় চিন্তাশীল মনগুলো সূর্যাস্তের সম্ভাবনায় উন্মুখ হয়ে উঠত একটা মহান বইয়ের উন্মোচন হবে তখনকার দিনের একমাত্র সে বই—এই প্রত্যাশা নিয়ে। আমরা যাকে সভ্যতা বলে জানি, তার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্মাদনা হ্রাস পেয়েছে এ কথা অনস্বীকার্য। ঈষ্টারের দিনক্ষণ দিয়ে কোন মতদ্বৈধ দেখা দিলে আজকের ইউরোপের অধিবাসী আমরা একটা চার্চকে বিভক্ত করতে আর পারি না।

আদিম বিজ্ঞান ছিল একান্ত ও অবিচ্ছিন্নভাবে তারকা-পর্যবেক্ষণের সঙ্গে জড়ানো। তার পিছনে ছিল একটি মাত্র সরল কারণ যে, মানুষ খুব শিগগীরই চেয়েছিল দিনক্ষণ ঠিক করতে। মনুষ্যত্বে জেগে উঠবার পথে আমরা যে সব বিশাল পদক্ষেপ করেছিলাম, এটি যে তার মধ্যে চতুর্থ, এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বিশেষ। সর্ব প্রথম এসেছিল ভাষার সংজ্ঞা ও সংগ্রহ, তারপর এল প্রস্তর খণ্ড গুলোকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে দেখার প্রবণতা, আবার দীর্ঘ ব্যবধানের পর এল আগুন আবিষ্কার এবং এ সবের শেষে এল বৎসর গণনা। আজকাল মহাবিশ্ব সম্পর্কিত আমাদের ঘষা-মাজা তত্ত্বগুলো নিয়ে সময়-পরিমাপের অনিবার্য যন্ত্র হয়ে উঠেছে সূর্য ঋতুতে ঋতুতে, প্রহরে প্রহরে সূর্যের অগ্রগতির ধাপে ধাপে ছায়ার দৈর্ঘ্যের পরিবর্তনশীলতাই আমরা লিখে রাখি। এই অভিজ্ঞতা-সিদ্ধ ধরণে এই জাতীয় কোন কিছুই হয় তো বা রয়েছে দণ্ড, স্তম্ভ, ইত্যাদিকে প্রাচীন কালে পবিত্র বলে গণ্য করার পিছনে। এ বিষয়ে বিশাল বৈজ্ঞানিক একটি তত্ত্বের শীর্ষবিন্দু হিসেবে সময়-বিচারের ক্ষেত্রে সূর্যই হয়ে দাঁড়িয়েছে চাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কেননা, নির্দিষ্ট কিছু নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে পূর্ণিমার চাঁদের সমকালীন যোগাযোগ দিয়ে বৎসর গননা সৌর গণনার উদ্ভবের অনেক আগেই যথেষ্ট পুরোন হয়ে এসেছে।

এক নজরে দেখা যাক এই প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটল কেমন করেন। বিভিন্ন জাতি-গুলি যতই সংগঠিত ও সংহত হয়ে উঠতে লাগলো স্থূল সময় পরিমাপের সাধারণ

বিজ্ঞান ততই রূপান্তরিত হতে থাকলো বিশাল এক পৌরোহিত্যের কার্যকলাপ ও রহস্যময়তায়। সমগ্রভাবে বছর এবং তার বিভিন্ন অংশ পূজিত হতে লাগলো। আবর্তনশীল বছরের উৎকণ্ঠিত গননাতে তাঁদের কতখানি দায়িত্ব ছিল। প্রাচীন এই অবস্থার সাম্য নিঃসংশয়ে মেলে গ্রীসের মহিলারা তাঁদের বাৎসরিক পবিত্রতার উৎসবকে কতটা সন্ত্রাসের চোখে দেখেন সেই দৃষ্টিভংগীর মধ্যে। বিশেষ বিশেষ দিনের পুনরুদয়ের নিঃসংশয়তা একদা নিরূপিত হত চান্দ্রমাসের সাহায্যে। বিভিন্ন হিন্দু উৎসব তাই চান্দ্রমাসের হিসেবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। বর্ষপঞ্জী তৈরীর কাজে এখনো পর্যন্ত এর প্রাচীন ধর্মীয় চরিত্রের কিছু কিছু লক্ষণ বজায় আছে। এ ভাবেই প্রাচীনকালের বিজ্ঞান বাঁধা ছিল ধর্মের সঙ্গে এবং সূর্য ও চাঁদের রহস্য আবছাভাবে উপলব্ধ হবার আগেও পর্যবেক্ষণ করা হত তারকাদের।

মধ্য রাত্রির আকাশের প্রতি মানুষের আদিম সম্ভ্রমবোধ সব সময়েই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এমন ভেবে নেওয়া অবশ্য ভুল হবে। সেই সুদূর অতীতের দিনগুলোতে মানুষের কাছে চিন্তাশীলতা ও পবিত্র মহিমার জগতের চাইকে এই নীল ও রুপোলী পৃষ্ঠা ছিল অনেক বেশি আপনার, এমন কি, ক্রমবর্দ্ধমান অনুসন্ধিৎসা ও ক্রমসম্প্রসারমান জ্ঞানের চাইতেও। এটা ছিল এক বিশাল ছবির বই—এক মন-জুড়ে থাকা আশ্চর্য কাহিনীর মত। নিশা সমাগমের মুহূর্তটিতেই কেমন তার কল্পনারাজ্য জুড়ে থাকা আধা দৈবী সত্তারা সকলে নীল পর্দার পরিপ্রেক্ষিতে জ্বল জ্বল করতে থাকতেন। কত শিগগীরই তাঁরা চিনে ফেললেন আকাশ পথ পাড়ি দেওয়া বীরটিকে যাঁর পিছনে পিছনে আসছে তাঁর সারমেয়টি। কালপুরুষ—নক্ষত্রপুঞ্জের এই বাংলা নামটির মধ্যেই কিন্তু তার প্রাচীন তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়।

সমুন্নত সেই বীরদের জগৎটি সম্বন্ধে কার্যকারণের বিভিন্ন বিচিত্র সংযোগ সত্যরূপে দৃঢ় ভাবে নির্দিষ্ট হয়েছিল। স্বর্গীয় অর্থনীতিতে নির্দিষ্ট নক্ষত্র-পুঞ্জের বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে বিভিন্ন জাতির মধ্যে ধর্মতাত্ত্বিক মতদ্বৈধ দেখা দিত। বহুকাল ধরে মানুষ এক অতিকায় পাখীর স্বপ্ন দেখে এসেছে যে পাখীর ডানা ছিল মেঘ, যার সঞ্চরণ অনুভূত হত বায়ু রূপে; সে কিনা বৃত্তাকার গতি পথে চালিয়ে নিয়ে যেত সূর্য ও বিভিন্ন তারকাদের। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের মুহূর্তগুলোতে মানুষ যখন সাগ্রহে স্বর্গলোক খুঁজে বেড়াত কিংবা ঋতুর বাঁকে বাঁকে যখন আবহাওয়া কিংবা বন্যা থেকে বোঝা যেত কেমন শস্য হবে, তখন যদি সন্ধ্যাবেলা সুদূর সূর্যালোকের অপূর্ণ প্রেক্ষাপটে আবছা ভাবেও কোন পাখীর বিশাল দেহরেখা দেখা যায়, তাহলে বিলীয়মান আলোকের কারারক্ষী হিসাবে স্বর্গীয় ঈগল পাখী গারুদা বা অ্যাকুইলাকে বাধা দেবে কে? কোন জাতি হয়ত সপ্তর্ষি পুঞ্জের তারকাগুলিকে মনে করত সূর্যদেবের শয্যা, আবার অন্য কোন জাতি হয়তো মনে করতো এই তারকাপুঞ্জটি সূর্যদেবের বলগা। প্রাচীন পুরান কাহিনীর অনেক সুন্দর সুন্দর গল্পই হয়তো এভাবে প্রমাণিত হবে মূলত জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনার সরল ও গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি বলে; উদাহরণ স্বরূপ, হেরাক্লিসের

বহু সংখ্যক কাজই ছিল বস্তুতঃ তাঁর নক্ষত্রপুঞ্জগুলির কাহিনী! অ্যাডমেট্রুসের গৃহে অ্যালসেস্টিস্ বস্তুতঃ প্রত্যাবৃত্ত হয়েছিলেন কিনা জানা নেই, কিন্তু বাস্তবে সূর্য ফিরে এসেছিলেন তারকাদের মধ্যে তাঁর নিজের জায়গাটিতে অথবা অ্যাণ্ড্রোমিডা ও ক্যাসিওপিয়ার মধ্যবর্তী জায়গায়। পার্সিয়ুস সর্বদাই নায়ক ছিলেন কিনা, এমন আরো অনেক প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর সম্ভবতঃ কোনদিনই মিলবে না। এই বিরাট বিষয়টির এক এক কোণ থেকে সম্ভবতঃ আমরা কিছু কিছু জিনিস ধরতে পারব। কিন্তু পুরাণের মনস্তাত্ত্বিক উদ্ভবের সম্পূর্ণ কাহিনীটির পাঠোদ্ধার হয়তো কোনদিনই হয়ে উঠবে না। একটা জিনিস কিন্তু নিশ্চিত। শুরুতে তারকাদের স্বর্গরাজ্য বা জ্যোতির্ময় সত্তাদের মহান মঞ্চটি ছিল একটা গোলমেলে জগৎ। মানুষের কিছু কিছু চকিত উপলব্ধি ঘটেছিল। কেননা সে নির্দিষ্ট কোন তারকার উপর আরোপ করেছিল সব-নির্বাচিত চরিত্র—সে কাজটা ছিল বিস্ময় বোধ ও ধার্মিকতার স্বেচ্ছাচারী কাজ। কিন্তু মানুষ সমগ্র বিষয়টিকে ছকে উঠতে পারে নি। শিশুদের রূপকথায় বৃদ্ধা জননী হবার্ডের সঙ্গে সিণ্ড্রেলার দেখা হয়, কথাবার্তা হয়; আবার দুজনের সঙ্গেই দেখা ও গল্পসল্প হয় ক্যাপ্টেন টম থাম্বের অথবা গুডি-টু সুন্ এর; সবটাই হয় এক আনন্দময় অসম্ভবের এক বিশাল ওলাপোড্রিডার প্রেক্ষাপটে; সেখানে আমরা যেমন নিখুঁতভাবে সংগঠিত, সংহত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাবের খোঁজ করি না, তেমনি তারকা বিশ্ব সম্পর্কিত মানবের আদিমতম ধ্যানধারণার কাব্যিক রূপগুলোতেও এ ধরণের কোন প্রত্যাশা রাখা উচিত নয়। সাদৃশ্য ও পরোক্ষ উল্লেখের প্রদোষালোকে কোন না কোন সূত্র অথবা জটের মধ্যে যদি কিছু পড়ে যায়, তা থেকে এই সব ধারণার প্রথম উন্মেষ, উদ্ভব ও তার সময় সম্পর্কে কোন নিশানা পাওয়া যায় এমন সব ব্যাখ্যা ও উল্লেখ খুঁজে পাওয়া গেলেই যথেষ্ট মনে করা উচিত।

মধ্য রাত্রির আকাশ-নিরীক্ষা অথবা সময়ের পরিমাপ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন বিন্দু থেকে সুরু করেছিল একথা স্পষ্টতই প্রতিভাত। কোন উপজাতি হয়তো বা আর্গো নক্ষত্র পুঞ্জের জ্ঞানোপাস নক্ষত্রটিকে অগস্ত্য নামে ডেকে তার যাত্রাপথ পর্যবেক্ষণ করবে। আকাশের শয়করা যে সব ধ্যানমগ্ন আত্মা, চিন্তারাজ্যে তন্ময় এবং এমন একটি জ্যোতি দ্বারা জ্যোতির্ময় যা সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরা ওয়াকিবহাল নন—এই বিশেষভাবেই ভারতীয় ভাবাদর্শটি নিশ্চয়ই ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে; কিন্তু অগস্ত্য নামাংকিত নক্ষত্রটিকে অগস্ত্য-মুনি বলে চূড়ান্তভাবে মেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নক্ষত্রটির সাহায্যে যারা বছরের হিসাব করতেন, তাঁরা অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের চোল, চের ও পাণ্ড্য গোষ্ঠী প্রমুখ উপজাতিগণ এই নক্ষত্রটিকে তাঁদের দেবত্বে উন্নীত কোন এক পূর্বপুরুষ বলে ভাবতে সুরু করলেন হিমালয়ের কোন একটি উপত্যকায় অগস্ত্য-মুনি নামে একটা প্রাচীন গ্রাম রয়েছে। এটি কি কোন প্রাক-ইতিহাস যুগের উপজাতীয় বাসভূমি, না কি এই উৎসর্গীকরণের পিছনে আছে এমন কোন রহস্য যা আমরা ভেদ করতে অক্ষম?

হিন্দু ধর্মের লোক কাহিনীতে এই অগস্ত্য নক্ষত্রটির নাম সুপরিচিত। একটি কাহিনী অনুসারে দেখা যায়। তিনি নাকি সমুদ্র পান করেছিলেন। আরেকটি কাহিনী অনুসারে তিনি কোন মাসের পয়লা তারিখে দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন, হিমালয় থেকে মহাসাগরের দিকে তাঁর যাত্রাপথে তিনি বিন্ধ্যপর্বত পেরিয়ে যান। এদিকে, আবার অনেকদিন ধরেই হিমালয় ও বিন্ধ্য এই দুই পর্বতমালার মধ্যে বিরোধ চলছিল এই নিয়ে যে কার মাথাটা বেশি উচুতে উঠবে। উচ্চাশামত্ত বিন্ধ্য পর্বতমালা মর-জগতের অধিবাসীদের চোখের আলো কেড়ে নেবে বলে শাসাচ্ছিল। এমন সময় মহর্ষি অগস্ত্য যখন এ-পথদিয়ে যাত্রা করছেন, তখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বিন্ধ্য পর্বত মালাকে মাথা হেঁট করতেই হ'ল। অমনি, সেই সুচতুর বৃদ্ধ মহর্ষি বললেন—"বোকা, বোকা বাছারা! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এমনিভাবেই থাকো।" হায়! দক্ষিণ বেলাভূমিতে পৌঁছে সেই যে তিনি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন, আর কোনদিনও ফিরে এলেন না, এজন্য আজ অবধি বিন্ধ্য পর্বতমালা মাথা হেঁট করে রয়ে গেল। এই কাহিনীর প্রসঙ্গেই মাস পহেলায় যে ব্যক্তি যাত্রা করে, সেই যাত্রাকে অগস্ত্য-যাত্রা বলা হয়ে থাকে, তার মধ্যে এই ইঙ্গিত নিহিত থাকে যে সে ব্যক্তি অগস্ত্যের মতোই আর নাও ফিরতে পারে। এদিকে আবার উত্তর থেকে দক্ষিণ অভিমুখে এই যে যাত্রা, পরিশেষে সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া, এবং যে পথ দিয়ে তিনি এসেছিলেন, সে পথে আর কোনদিনও প্রত্যাবৃত্ত না হওয়া—যদিও তাঁকে আবার কোন তারা ঘেরা নিশীথে উত্তর দিক থেকে বিন্ধ্য পবতের মাথার উপর দিয়ে যাত্রা করতে দেখা যায় সামগ্রিক ভাবে এই চিত্রকে বিচার করে দেখলে মনে হতে পারে যে কোন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের দিগন্ত সীমার নীচ দিয়ে পেরিয়ে যাওয়ার সে জ্যোতি বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ, সেটাই হয়তো এই লোকপ্রিয় ব্যাখ্যার জনক।

কিন্তু অগস্ত্য নক্ষত্রই মানবের একমাত্র আদি নক্ষত্র পূর্বপুরুষ নন। সপ্তর্ষি নক্ষত্র পুঞ্জের সাতটি তারকাকে দিয়ে আদিম কল্পনা লীলায়িত হয়েছে। মারাত্মক তীরটি নিয়ে অদ্ভুত সব গল্প বলা হয়ে থাকে—বছরের শেষে বন্য শিকারীটি যে তীর ছুঁড়ে সূর্যকে বধ করেছিল। মানুষ চিরকাল ধরেই ভালোবেসে এসেছে বৃষরাশীর মাথার উপর কৃত্তিকা গোষ্ঠী—চয়নরত রমনীবৃন্দের অথবা নৃত্যপরা কুমারীদের কোমল আলোককে যাঁদের মধ্যে কিরণ বিকিরণ করছেন স্বর্গের রাণী রোহিনী। উত্তরের মুকুট সব রূপা অরুন্ধতী হচ্ছেন ভাগ্যোদয় সূচক তারকাদের আরেকটি। লুব্ধক বা কুকুর তারাও হচ্ছেন এমনই আরেকজন; মনে রাখতে হবে যে, এই সব ক্ষেত্রের যে কোনটিতেই ব্যক্তি সত্বার আরোপ সহজ কতকগুলো রূপান্তরের ধাপ পেরিয়ে পূর্ব-পুরুষ উপাসনা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নর-জগৎ থেকে উদ্ভূত পুরুষ দেবতাদের মধ্যে ধ্রুবতারাকেই বলা হয়ে থাকে প্রাচীনতম; পুরোন দিনের পুরান কাহিনীতে বিভিন্ন জায়গায় তাঁকে যেমন-ভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে কিঞ্চিৎ হাস্য রসের ছোঁয়া। নক্ষত্র সংস্থানের

শীর্ষদেশে তাঁর নিঃসঙ্গ একক অবস্থিতির দরুনই হয়তো বা ধ্রুবতারাকে এক পদ বিশিষ্ট এক দেবতারূপে কল্পনা করা হয়েছে। অষ্ট্রেলিয়ার বন্য উপজাতি গোষ্ঠীর দ্বারা অর্চিত হন তারকা-দেব টুরুন বুলুন যিনি কৃত্তিকা গোষ্ঠীর প্রভু এবং রক্ষক, যিনি আবার এক চক্ষু ও এক পদ বিশিষ্ট—এ থেকেই অনুমান করা যেতে পারে এই ধারণা কত সুপ্রাচীন। এরপর আর ওডিন, অথবা এক চক্ষু বিশিষ্ট সাইক্লপস্ কিংবা স্বর্গের কর্মকার হেফাইষ্টন্ তারা খোঁড়া পা নিয়ে আমাদের বিস্মিত করতে পারেন না। প্রাচীনতর ফ্রিগিয়া দেশ থেকে গ্রীকধারণায় অনুপ্রবিষ্ট সেই গভীর কোমল এশীয় ধারণার মহান দেব প্যানের একটি ছাগলের পা কল্পনার আদি উৎস হচ্ছেন আবার এই খঞ্জ পদ দেবতাটি। বিশ্বাস করা শক্ত হলেও কিন্তু বলা হয়ে থাকে যে এই ধ্রুবতারা দেবকে এক সময় ছাগলের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হ'ত। তাই ঋগ্‌বেদে রয়েছে অজ—একপদ সম্বন্ধে অসংখ্য উল্লেখ, সে নামের অনুবাদ হয়—এক, একপদ বিশিষ্ট ছাগল, অথবা অজাতক একপদ কেউ। সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয় যে, দ্বিতীয় অর্থটাই সঠিক এবং এটি নির্দেশ করছে সূর্যকে। এবং মহান দেবতা প্যান এবং তাঁর একটি ছাগল-পা এই ধরণীর অস্তিত্ব না থাকলে তুলনামূলক পুরাণশাস্ত্রকেও উপরিউক্ত ক্ষেত্রে একমত হতে হ'ত। বাস্তবিকই এই ব্যাখ্যাকে সম্পূর্ণ অবহেলা করা সম্ভব হয় যখন আমরা বেদে পড়ি—"এক পা যাঁর তিনি দুই পা বিশিষ্ট সকলকে একেবারে নগ্ন করে দিয়েছেন।" আধুনিক মনের কাছে এ উক্তির উদ্দিষ্ট হিসাবে ধ্রুবতারার চাইতে সূর্যকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হবে। কিন্তু প্রাচীন উদ্গাতা হয়তো বোঝাতে চেয়েছিলেন যে যার একটি মাত্র পা, সেই তিনিই ঈশ্বরের কাছে এবং মহাবিশ্বের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছিয়েছেন। এই অর্থে মহাবিশ্বের শীর্ষবিন্দু অজ—একপদ সর্বদাই মহাসাগরের এবং গভীর সমুদ্রের ড্রাগন—বৃষ্টির মেঘ এবং সমগ্র জীবজগতের গর্ভদেশ বলে যাকে মনে করা হয় এবং দক্ষিণ আকাশের বিশাল ও অমেয় অতুলের ব্যক্তিরূপ যাঁর উপর আরোপিত তাঁর বিপরীতে স্থাপিত। এভাবে আমরা উত্তর-দক্ষিণ দুদিকের এক জোড়া দেবতাকে পাচ্ছি।

কিন্তু অজ একপদ বলতে যদি একপদবিশিষ্ট ছাগলকেই বাস্তবিক বোঝানো হয়ে থাকে এবং সে নামে যদি ধ্রুবতারাকেই উদ্দেশ করা হয়ে থাকে তাহলেও, কিন্তু এটা ভেবে নেওয়া ঠিক নয় যে, তাঁর উপাসনার আমরা আর কোন এবং স্থূলতর চিহ্ন খুঁজে পাবো না। ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বারবার দেখা গেছে যে ধর্মতত্ত্বের নতুন কোন ঢেউ যখনই এসেছে, তখনই সেই ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত পুরোন কোন তত্ত্বের পুনরালোচনার সংঘটক। পরবর্তী কালের অনুসন্ধিৎসুদের পক্ষে এটা একটা সৌভাগ্যবিশেষ, কেননা এটা ছাড়া অধিকাংশ প্রাচীন ধারণার ক্ষেত্রেই আমরা কোন দিন সূত্র পেতামনা। এমনই একটা বিন্যাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে নেওয়া যেতে পারে দক্ষের কাহিনীটি। আর্য ও সংস্কৃত-মূলক দৃষ্টিভংগীর প্রবক্তারা মনে করেন যে আবহাভাবে বলতে গেলে ব্রহ্মাই ছিলেন বিশ্বের স্রষ্টা। কিন্তু একথাও মনে রাখতে

হবে, তাকে পবিত্র ও পূজনীয় মনে করেন এমন লোকেদের মধ্যে আবার গড়ে উঠল বাস্তব অস্তিত্বের দ্বৈতসত্তা ও অন্তর্নিহিত অশুভ বা মন্দ সংক্রান্ত দর্শন। এবং এই তত্ত্বকে ঘষামাজা করতে গিয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের মূর্ত সত্তা শিব বা মহাদেব নামক একজন নতুন দেবতার নাম জনপ্রিয় হয়ে উঠল। কিন্তু মহাবিশ্বের বিবর্তনে এ সকল বিভিন্ন দৈবীসত্তার ভূমিকা কি? এটা হচ্ছে এমন এক বিশ্ব যেখানে ভালো নিয়ে আসে মন্দকে, মন্দ নিয়ে আসে ভালোকে এবং মন্দ ছাড়া ভালো শুধু পারিভাষিক পরস্পর বিরোধিতা মাত্র। তাহলে সেই মহান দেবতাকে কি করে এমন সর্বনাশা জিনিসের জন্য দায়ী করা যায়। সরল সত্য,—যায় না। সেইজন্য পুরাণ কাহিনীটি সম্প্রসারিত হয়ে দাঁড়াল যে ব্রহ্মা আদিতে মানব জাতির পূর্বসূরী হিসাবে সৃষ্টি করলেন চারজন রূপবান যুবাকে এবং তাঁরা মানস সরোবরের তীরে বসে উপাসনা করতে লাগলেন। সহসা তাঁদের কাছে শিব এলেন এক বিরাট হাঁসের রূপ ধরে—ইনি হচ্ছেন সেই পরমহংসের প্রতিরূপ যে পরমহংস মুক্ত আত্মার উপাধি। যাইহোক তিনি এদিক ওদিক সাঁতরে সেই চারজন যুবাকে এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে—তাঁদের ঘিরে থাকা এই জগৎ হচ্ছে মায়া ও বন্ধন—এবং তাঁদের পলায়নের একটি রাস্তাই আছে—তা হ'ল পিতা হতে অস্বীকার করা। যুবা পুরুষেরা একথা শুনলেন, উপলব্ধিও করলেন, তাই তাঁরা ধ্যানে সমাহিত হয়ে সেই স্বর্গীয় সরোবরের তীরেই রয়ে গেলেন—তাঁহাদের পলায়নে বিশ্বের কোন কাজে তাঁরা আর লাগলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রজাপতি নামে সৃষ্টির আটজন দেবতাকে সৃষ্টি করলেন, তাঁরাই এই বিশ্ব নামক তালগোলটির নির্মাতা।

ভাবাদর্শের ইতিহাসই সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের একমাত্র ইতিহাস যাকে বিস্ময়কর স্পষ্ট-ভাবে চিহ্নিত করা যায়। ব্রহ্মার ইতিহাসের এই বিন্দুতে, অর্থাৎ যেখানে তিনি প্রজাপতি-গণকে সৃষ্টি করছেন—সেটা আবার এমন একটা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে, যার প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টি-প্রক্রিয়াতে শিবের ভূমিকাটিকে তুলে ধরা, সেখানে স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হচ্ছে যে আমরা আকস্মিকভাবে মুখোমুখি হচ্ছি প্রাচীনতর এক মহাবিশ্বতত্ত্বের সমগ্র অংশটির। উল্টো বিষয়টি হচ্ছে এই যে, পুরাণের এই প্রথম তাঁদের কাছে এযাবৎকাল পরিচিত ধারণা সমূহের তুলনায় অধিকতর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ধারণামালা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছেন; গল্পটি যতই এগোতে থাকে বিষয়টি ততই তর্কাতীত হয়ে উঠতে থাকে। নতুন কোন সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট বেমানান তবে বিরাট এক পদাধিকারের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক হয় এমন এক দৃঢ় প্রত্যয় রয়েছে নতুন প্রজাপতিদের মধ্যে একজনের—তা হচ্ছে এই যে তিনিই হচ্ছেন মনের ও দেবগণের মহাপ্রভু। অত্যন্ত বিরক্তি ও ক্ষোভের সঙ্গে সেই প্রজাপতি দেখতে পেলেন যে তাঁর পদমর্যাদা ও ভারিক্কী চালচলনকে শিব অথবা মহাদেব নামে পরিচিত এক দেবতা মোটেই পাত্তা দিচ্ছেন না। এই অভিযোগের আকস্মিকতা ও সামান্য এই ব্যাপারটির অপ্রত্যাশিততার মধ্যে আমরা পেলাম অতিরিক্ত একটি ইঙ্গিত যে এক্ষেত্রে আমরা হিন্দু শাস্ত্রের নতুন এক দেবতার প্রবর্তনের ব্যাপার আলোচনা করতে যাচ্ছি। তাঁকে দেবতাদের পারিবারিক

বৃত্তের একজন সদস্য করে নেওয়া হবে এমন এক কৌশলে যা যুগপৎ প্রাচীন অথচ চির নবীন। দক্ষ নামক মুখ্য প্রজাপতি আহত অভিমান থেকে মহান দেব শিবের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড সংঘাতের পরিকল্পনা করলেন। কিন্তু সতী নামে দক্ষের এক কন্যা ছিলেন, যিনি কিনা নারী জনোচিত ধার্মিকতা ও ভক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহস্বরূপা। এই কুমারীর সমগ্র মন প্রাণ আবার গোপনে সেই মহান দেবের প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধায় উৎসর্গীকৃত। এদিকে ইনি আবার পিতার শ্রেষ্ঠতমা অনূঢ়া কন্যা। তাঁর বিবাহের ব্যবস্থার পক্ষে আর বেশি দেরী করা যায় না। সেই জন্য ঘোষণা করা হল যে তাঁর স্বয়ম্বর (রাজকন্যারা যেভাবে নিজেদের স্বামী নির্বাচন করে থাকেন) অনুষ্ঠিত হবে ; সুযোগ্য সব দেবতা ও রাজপুত্রদের নিমন্ত্রণপত্র পাঠানো হল তাই। একমাত্র শিবকেই আমন্ত্রণ জানানো হল না, অথচ সতীর সমগ্র হৃদয় তাঁকেই অমোঘভাবে নিবেদিত! এই বরমাল্য হাতে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়ে সতী চূড়ান্ত এক আবেদন জানালেন। মালাটিকে শূন্যে নিক্ষেপ করে তিনি বললেন—"সত্যিই যদি আমি সতী হই তাহলে হে শিব তুমি আমার মাল্য গ্রহণ করো।" এবং তৎক্ষণাৎ উপস্থিত সকলের মধ্যে শিবকে দেখা গেল গলায় তাঁর সেই বরমাল্যটি।

এভাবে সুরু হওয়া বিবাহ পর্বটি যথাযথভাবে চুকল ; বলা হয়ে থাকে যে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হবার মুহূর্তে সতী যখন বধূবেশে এই মহান দেবের সামনে দাঁড়িয়ে তখন শিব তাঁর দিকে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন—"তোমার ধ্রুবতারাকে দেখে নাও।" এই মৈত্রী সূত্রের দরুণ আবার দক্ষের সঙ্গে তাঁর সংঘাত তীব্রতর ও তিক্ততর হয়ে উঠল। সতীর নাম মুছে দেওয়া হল তাঁর পরিবারের তালিকা থেকে। পিতার গৃহে পরবর্তী আর কোন উৎসব অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হ'ত না। এদিকে, মহান দেব ও তাঁর পত্নীর পার্বত্য স্বর্গ কৈলাসে যখন খবর পৌছোল যে দক্ষ এক অসাধারণ ও অভূতপূর্ব যজ্ঞ ও উৎসব অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছেন,—সতী নারীজনোচিত আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে মনস্থির করলেন এই উপলক্ষে তিনি তাঁর আশৈশব বাসভবনে যাবেন এবং কোন নিষেধ শুনবেন না। বৈরাগ্যের ছিন্নবস্ত্রসহায় ভূষিতা তিনি সমবেত নারিজনদের উচ্চ হাস্যরোলের মধ্যে প্রবেশ করলেন উৎসব কক্ষে। তার আত্মীয় পরিজনেরা তখন দৈবী ক্ষমতা, দীপ্তি ও বিশ্বের ভোগবিলাসে মত্ত। যাঁর আশীর্বাদ সতী যাচ্ঞা করছিলেন সেই তাঁর পিতা কিন্তু সতীকে অভ্যর্থনা করলেন প্রচণ্ড ক্রুদ্ধভাবে এবং তাঁর অনুপস্থিত স্বামীর উদ্দেশ্যে কুৎসা বর্ষণ করে। হয়তো বা এই দৃশ্যটির করুণ রসের দরুণই এই প্রাচীন কাহিনীটি ভারতবর্ষে এতকাল ধরে প্রাণবন্ত হয়ে রয়েছে। পরিবারের আদর্শবাদে রয়েছে দ্বন্দ্ব ও ট্র্যাজেডী ; পিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সতী তাঁর নারীমনোচিত গর্ব ও ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ নিয়ে—তাঁর প্রিয় পতি দেবতার সম্মান তিনি বাঁচাতে চান—এই ছবিটির মধ্যে আমরা এমনই একটি সংঘাত করুণরসের সন্ধান পাই। দক্ষ কিছুতেই চুপ করবেন না, সতীও পতিনিন্দা শুনে তাঁর যে দেহ কলুষিত

হয়েছে সেই দেহ আর রাখবেন না। তিনি আর তাঁর পিতার কন্যা হয়েও থাকতে চাইলেন না, মৃত অবস্থায় তিনি পতিত হলেন পিতার চরণপ্রান্তে।

কৈলাসে শিবের কাছে এ খবর পৌঁছল। ধ্যান ও উপাসনায় নিমগ্ন ও সমাহিত মহান দেবকে জাগিয়ে তোলা সহজ হয়নি। কিন্তু একবার যখন এই খবরটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করলেন তাঁর ক্রোধ ও বেদনা কোন সীমা মানল না। তিনি বিরাট একদল যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে, তাদের সেনাধ্যক্ষ বীরভদ্রের পিছন পিছন সারিবদ্ধ করে নিয়ে রওনা হলেন দক্ষের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে তিনি সতীর দেহ খুঁজে নিয়ে আসবেন। দুঃখে অধীর শিব সসম্মানে সতীর দেহ কাঁধে তুলে নিয়ে দৃশ্যপট ছেড়ে যেতে উদ্যত—তাঁর চেলাচামুণ্ডারা এদিকে দক্ষের প্রাসাদ ধ্বংস করতে ও এই বিপর্যয়ের মুখ্য কারককে হত্যা করতে এগিয়ে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে সতীর জননী শিবের পায়ে ধরে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইলেন, মহান দেবতা শিবও তৎক্ষণাৎ তা মঞ্জুর করলেন। তাঁর অনুচররা তাঁর আদেশ পালনে তৎপর হলেন কিন্তু দক্ষকে ইতিমধ্যেই শিরশ্ছেদ করে হত্যা করা হয়েছে। এখন যজ্ঞক্ষেত্র থেকে একটা ছাগলের মুণ্ডু ছাড়া আর কিছু পাওয়া গেল না। অগত্যা সেটাকেই সেই মুণ্ডহীন দেহটিতে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। প্রজাপতি আবার বেঁচে উঠলেন, কিন্তু মানবদেহে তাঁর একটি ছাগমুণ্ড!

প্রাচীনতর সৃষ্টিদেবতার কন্যার সঙ্গে দেবতাদের মধ্যে নবাগত দেবতার পরিণয়ের কাহিনী এখন যথেষ্ট পুরোন। এক্ষেত্রে একটা জিনিসই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তা হচ্ছে যে দক্ষ ইতিমধ্যেই এতো পুরোন হয়ে গিয়েছিলেন যে, তার ছাগ-মুণ্ডের উৎস বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল এবং তখনকার নতুন যে জগৎ শিবকে গ্রহণ করেছিল, তাদের কাছে এর একটা ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। হয়তো বৌদ্ধধর্মের জন্মের পূর্ববর্তী যুগে তিনি যথেষ্ট সুপরিচিত ছিলেন কিন্তু ভারতবর্ষের আগাগোড়া বেশ ঐ ধর্মমতে প্রচারের দরুণ ততদিনে জ-গণ নিশ্চয়ই এতটা শিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের দেব দেবীদের ক্ষেত্রে মহাজাগতিক শক্তির রূপকমাত্রতে সন্তুষ্ট না হয়ে তাঁদের উপর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরিত্র আরোপ করতে চাইছিলেন। এভাবে শিক্ষা পেয়ে জনসাধারণ সম্ভবতঃ দক্ষের ধারণাতে প্রত্যাবৃত্ত হলেন এমন একটা জায়গায় যার তাৎপর্য তাঁরা ভুলেই গিয়েছিলেন।

এই পবিত্র নাটকটির দ্বিতীয়াংকে প্রাচীনতর আরো কিছুর চিহ্ন পাওয়া যায়, শিব যেখানে বেদনায় অধীর হয়ে মৃতা সতীর দেহ পিঠে করে নিয়ে চতুর্দিকের সবকিছু ধ্বংস করে সমগ্র পৃথিবী পরিক্রমণ করে বেড়াচ্ছেন। মাটির রস গেছে শুকিয়ে, তরুলতা শুকিয়ে যাচ্ছে, ফসল যাচ্ছে নষ্ট হয়ে। মহান দেবতার দুঃখের ভারে সমগ্র প্রকৃতি কম্পমানা। মানবজাতিকে বাঁচাবার জন্য তখন এগিয়ে এলেন বিষ্ণু। শিবের পিছন পিছন গিয়ে মাঝে মাঝে তাঁর চক্র ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তিনি সতীর দেহকে খণ্ড খণ্ড করে ফেললেন। যতক্ষণ না মহান দেব ভারমুক্ত বোধ করে একাকী কৈলাসে

ফিরে গেলেন তাঁর চিরন্তন ধ্যানে পুনর্বার নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। কিন্তু সতীর দেহ বাহান্নটি খণ্ডে বিভক্ত হ'ল এবং যে যে জায়গায় এক একটা টুকরো মাটি স্পর্শ করল, সে সব জায়গায় মাতৃকা পূজার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই সেই তীর্থের অভিভাবক স্বরূপ শিব নিজে দীপ্ত হয়ে থাকেন ভক্তের চোখের সামনে।

উত্তরের শীতঋতু নিয়ে অপূর্ব গ্রীক পুরাণ কাহিনীতে মহান দেবী ডিমিটার যে ভাবে পার্সিদোনকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন, তার সঙ্গে উপরিউক্ত সমগ্র কাহিনীর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে; কিন্তু সতীদেহের বাহান্নটি খণ্ড অনিবার্যভাবেই মনে করিয়ে দেয় আরেকটি মৃতদেহের বাহাত্তরটি খণ্ডের কথা—ওসিরিসের যে মৃতদেহটি আইসিস খুঁজে বেড়িয়েছিলেন ও পরিশেষে বিব্লসে সাইপ্রেস বৃক্ষের তলায় খুঁজে পেয়েছিলেন। বলা হয়ে থাকে যে প্রাচীনতম বছরে ছিল ছুটি ঋতু অথবা বাহাত্তরটি সপ্তাহ। তাই, ওসিরিসের দেহ সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম গণনাযোগ্য একক সমেত সমগ্র বছরকে চিহ্নিত করত। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গল্পটিতে আমরা আবার পাচ্ছি এমন একটা সংখ্যা যা কিনা বছরের সপ্তাহগুলোর সংকেতবাহী। সতীর দেহখণ্ড হচ্ছে বাহান্নটি। তবে কি তিনি আমাদের বর্তমান বছর গণনার ঐতিহাসিক মূল স্বরূপ কোন প্রাচীন ব্যক্তি-সত্তা আরোপের প্রতিশোধ?

আমরা জানি যে সাধারণভাবে দেবীরা দেবতাদের বাহু পূর্ববর্তিনী। একথা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে ইজিপ্টের প্রাচীনতর পুরাণকাহিনী সমুদয়ে রমণীরাই অধিকতর সক্রিয়। এক রমণীই এক পুরুষের মৃতদেহ অনুসন্ধান করছেন এবং বহন করে বেড়াচ্ছেন। অন্যান্য আরো কতকগুলো বিষয় ছাড়াও স্বামী স্ত্রীর দেহ খুঁজে বেড়াচ্ছেন এবং বয়ে বেড়াচ্ছেন এই তথ্যটি থেকেই বোঝা যায় যে শিব ও সতীর কাহিনীটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

আজকের দিনের হিন্দুদের মধ্যে অল্প জনাকয়েক অনুসন্ধিৎসু ছাড়া অনেকেরই অজানা রয়ে গেছে পুরাণ নামক বৃহদায়তন সাহিত্যে কত শত কাহিনী সুপ্ত রয়েছে। অথচ উদ্ভবের সময়ে এগুলোর প্রতিটিরই নিশ্চয়ই গুরুত্ব ছিল, সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখলে নিশ্চয়ই এগুলোর ঐতিহাসিক রহস্য উদঘাটন করা যায়। শনিকে কেন্দ্র করে এমনি এক বিচিত্র কল্পকথা রয়েছে। বিশ্বজননীর জ্যেষ্ঠ পুত্র গণেশের জন্ম হলে সব দেবতারা ও উপদেবতারা তাঁর দোলনার কাছে এসেছিলেন দেখতে। শুধু একজন আসেন নি, সে শনি। অবশেষে এই বিষয়টি মহাদেবীর নজরে পড়ল, তখন তিনি শনির অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। তিনি শুনতে পেলেন যে শনি তাঁর সন্তানের বিপদ ঘটাবার আশংকা করেছেন কেননা এ কথা সকলেরই জানা আছে যে, শনি কারুর মাথার দিকে দৃষ্টি দিলে সেটা পলকে ভস্মীভূত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে। সহজ গরিমা বশতঃ জগজ্জননী মৃদু হাসলেন। সংবাদদাতাকে তিনি আশ্বস্ত করে বললেন যে শনির এই ক্ষমতা তাঁর সন্তানের কোন ক্ষতি ঘটাবে না,—এই বলে তিনি শনিকে সাদর সম্ভাষণ করে আমন্ত্রণ পাঠালেন। কিন্তু সমবেত

সকলে আতংকিত হয়ে দেখলেন যে, শনি শিশুটির দিকে দৃক্‌পাত করা মাত্র শিশুটির মস্তক ঘিরে আগুনের শিখা জ্বলে উঠ্‌ল। কতখানি ক্ষমতা শনির, তা এইবারে দেখা গেল—কেউ যা অনুমানও করতে পারেননি।

এই বিয়োগান্তক ঘটনায় জগন্মাতা বিশেষ ভাবে বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর অতিথিকে বেশ কড়াভাবেই হুকুম করলেন তাঁর শিশুটির মাথা ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু শনি মৃদু মধুর হেসে তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে শিশুটির মস্তকের আর কোন অস্তিত্বই নেই। সেটি ভস্মাকারে তাঁদের সামনে পড়ে আছে। "তাহলে কোন ভৃত্যকে পাঠিয়ে বল যে সর্ব প্রথম যার সঙ্গে দেখা হবে তার মাথাটা যেন আমার কাছে নিয়ে আসে!" —জননী এই আদেশ জারী করলে শনির এ আদেশ পালন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিলনা। শনির ক্ষমতা শুধু তারই উপর প্রযোজ্য যে কোন না কোন দোষ করেছে। তাঁর চর এমন কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না যে অন্যমনস্ক ভাবেও কোন না কোন অপরাধ করেছে। এমন সময় হঠাৎ সে দেখতে পেল একটা হাতী উত্তর দিকে মাথা করে শুয়ে রয়েছে। এই তুচ্ছ অপরাধটির জন্য সে শনির এলাকায় পড়ে গেল এবং ভৃত্যটি ক্ষিপ্র বেগে তার মাথাটি কেটে নিয়ে সেটিকে শিশুর ধড়ে বসিয়ে দেবার জন্য ফিরে এল। গণেশের দেহে হাতীর মাথার কারণ এটিই।

এখানে দুটো তিনটে বিষয় লক্ষণীয়। অবশ্যই এ কাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল শনির ক্ষমতা প্রদর্শন এবং ফলত তাঁকে প্রসন্ন করার প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করা। কিন্তু, সচরাচর যেমনটি হয়ে থাকে, সমন্বয়ের প্রতি ভারতীয় অনুভব অনুসারেই অল্পবিস্তর স্বগায় সম্মানের যে কোন নতুন দাবীদারকেই তাঁর পূর্ববর্তী বিশ্বাসের কোন না কোন অসামনঞ্জস্য ব্যাখ্যা করতে হয়। তাই সে বিশ্বাসের সঙ্গে শনি এভাবে সংযুক্ত, যে বৃক্ষটিতে কলম করা হল নতুন বিশ্বাসটি, তা হ'ল ভারতে লোকপ্রিয় যাজকীয় ও সংহত পূজার্চনাসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম গণেশ পূজা। একমাত্র এই তথ্যটিই শনিকে প্রসন্ন করা বিষয়টির প্রাচীনতা প্রতিপাদনের পক্ষে যথেষ্ট। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে গণেশের মূর্তির সে অংশটি আমাদের এতখানি বাঁধা লাগায় ও অসমঞ্জস্য বলে বোধ হয়, সে ব্যাপারটা শনি ও অন্যান্য গ্রহের অনুপ্রবেশের সময়েও ছিল এমনই ব্যাখ্যাতীত। রক্তবর্ণ দেহের উপর শ্বেত মস্তকের রূপক ব্যাখ্যা আদিতে যে কি ছিল, মেঘের সীমার নীচে অস্তায়মান সূর্যের প্রতীক এটি ছিল কিনা, সে কথা বহুকাল আগেই বিস্মৃতির আড়ালে চাপা পড়েছে। গণেশের সন্তান সন্ততিগণ তাঁর দৈবী ক্ষমতা সম্পর্কে কোন রকম সন্দেহ পোষণ না করেই তাঁর উদ্ভব সম্পর্কে যে কোন ব্যাখ্যা মেনে নিতে প্রস্তুত। যখন গ্রহদের অধীশ্বর দেবগণ সম্পর্কে ভীতি থেকে সুরু হল তাঁদের প্রসাদ যাচ্ঞা নব আরব্ধ সেই গ্রহ-অর্চনার সঙ্গে এল উপরি উল্লিখিত ব্যাখ্যাটি। বহু-বহু যুগ আগেই শান্ত স্বভাব গণেশের উপাসনা সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহে ছড়িয়ে পড়েছে, এখন তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল বৈদেশিক সূত্রে এর জন্মভূমিতে শনি-ভীতি। এই গ্রহ উপাসনার মূল কেন্দ্র চ্যালডীয়া কিনা কে বলবে?

সমস্ত উপকথাগুলির আধ্যাত্মিকতা সম্পাদনের সাধারণ প্রক্রিয়াটির সঙ্গে আমাদিগের মধ্যেই সংযুক্ত হল গ্রহদের ভাগ—এরই একটা তাৎপর্যময় দৃষ্টান্ত হচ্ছে মহাভারতের আদিপর্বে কচ ও দেবযানীর কাহিনী। এখানে আমরা অতি-প্রাচীন একটি টুকরো পাচ্ছি; কেননা কাব্যিক আখ্যান হিসাবে এই কাহিনী অতি প্রাচীন একটি কুলুজী সংক্রান্ত সম্বন্ধের সঙ্গে শিথিল ভাবে যুক্ত—এর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে 'সারা' ও 'হাগর' এর সেমিটিক বৃত্তান্তের যার, মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অসবর্ণ বিবাহ, বহু-বিবাহ, মাতৃ তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং কোন নারীর প্রস্তাবের প্রতি পুরুষের বাধ্য-বাধকতার আদর্শ। এই পুরাণ কাহিনীটির এ সকল বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই চূড়ান্ত পর্যায়ের সম্পাদকের কাছে বিশেষভাবে অসংগতি পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করার জন্য অ-কাব্যিক ভাবে বহু সময় ও শব্দ ব্যয়িত হয়েছে যুক্তি-তর্কে। কিন্তু নতুন উপস্থাপনার মধ্যে প্রাচীন কোন কাহিনীকে ঢোকাবার জন্য এই সাজিয়ে গুছিয়ে নেবার ব্যাপারটা একটা সাধারণ ঘটনা আর এই সব যুক্তি তর্কই বলে দেয় ঘটনাগুলো প্রথম ঘটার সময় কতখানি সহজ ও স্বাভাবিক ছিল। শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ব্রাহ্মণ তনয়া হয়েও কিভাবে বিশেষ কোন রাজকীয় বা অসুর রাজপুত্র ও উপজাতি গোষ্ঠীর আদি-জননী হয়ে উঠলেন বা যে রাজার সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয় তিনি কেমন করে আরো তিনটি বিশুদ্ধ অসুর-গোষ্ঠীর বা রাজবংশের পূর্বপুরুষ হলেন—এসব জিনিস নিশ্চয়ই পরিবার ও গোষ্ঠীর বহুমূল্য বংশ-তালিকার বিষয় ছিল। জাতীয় দৃষ্টিভংগী থেকে ঐতিহাসিক বিবরণী লেখকের পক্ষে এগুলোকে তাঁর মহাকাব্যিক ধারাবিবরণীর প্রতিটি পর্যায়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়াটা হয়তো বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু মহাভারতের শেষতম সম্পাদকের কাছে কবি হিসাবে হয়তো আগ্রহের বস্তু হয়েছিল এমন একটা বিষয় যা আমাদেরও আগ্রহী করে তোলে—সেটা হচ্ছে যৌবনে দেবযানীর জীবনে একটি রোমান্স যা তাঁকে রাজার সঙ্গে পরিণীতা হলেও গ্রহবিন্যাসের কন্যা বলে চিহ্নিত করে রাখে।

এইসব পুরাণ কাহিনী আসছে সেই যুগ থেকে যখন দেব ও দানব ('অসুর') গণের মধ্যে সর্বদা চলতো প্রাধান্যের লড়াই। এই অসুর ছিলেন কারা? তাঁরা কি ভারতে বহুকাল প্রতিষ্ঠিত কোন অধিবাসী গোষ্ঠি ছিলেন, নাকি তাঁরা ছিলেন উত্তর পশ্চিম থেকে আগত নতুন হানাদার গোষ্ঠী? লক্ষণীয় এই যে তাঁরা কিন্তু আদিম উপজাতিগণের সঙ্গে এক-পর্যায়ভুক্ত হননি, অথবা তাঁরা দস্যু বা দাস বলেও উল্লিখিত হননি। এখনও এদেশে গ্রামাঞ্চলে রয়েছে প্রাচীন একটি ধাতু-শ্রমিক জনগোষ্ঠী যাঁরা হয়তো নামের ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে যেমন, তেমনি রক্তের দিক দিয়েও এই অসুরদের প্রতিনিধি। আসীরিয়া এই নামটিই তাঁদের বিদেশী উৎসের সম্ভাবনার একটি বিশ্বস্ত সাক্ষী। সে যাই হোক, দেবযানীর কাহিনী থেকে অবিসংবাদীভাবে ফুটে ওঠে একটা জিনিস যে অসুরেরা ছিল ইন্দ্রজালে পারদর্শী। বলা হয়ে থাকে যে, তারা তাঁদের যজ্ঞ-সম্পাদনকারী পুরোহিতের কাজ করার জন্য একজন ব্রাহ্মণকে

যোগাড় করে, ধোঁয়াটে ভাবে যিনি শুক্র গ্রহের মূর্ত্তরূপ। অপরপক্ষে দেবগণ—অর্থাৎ সম্ভবতঃ সংস্কৃতভাষী আর্যেরা এই একই দায়িত্বের ভার ন্যস্ত করেছিলেন আরেকজন ব্রাহ্মণের উপর—যিনি বৃহস্পতির প্রভাব ও শক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ। "শুক্র সর্বদাই রক্ষা করেন অসুরগণকে অথচ তাদের প্রতিপক্ষ আমাদের কখনো রক্ষা করেন না", দেবগণের এই বিক্ষুব্ধ উক্তির মধ্যে সমর্থন পাওয়া যায় এই সব নামের গ্রহগত পরোক্ষ উল্লেখের। অন্য একটি জনগোষ্ঠীর আর্চবিশপ আমাদের রক্ষা করছেন না কেন এই অভিযোগ আনবে না কেউ। কিন্তু উভয় পক্ষ দ্বারা সম্মানিত কোন দৈবীসত্তা শুধু এক পক্ষের উদ্দেশ্যে রক্ষাকারী প্রভাব বা শক্তি নিয়োগ করছেন এমন অভিযোগ খুব অযৌক্তিক নয়।

শুক্রাচার্যের সমস্ত ঐন্দ্রজালিক শক্তির মধ্যে প্রধান ছিল মৃতের পুনরুজ্জীবনের মতো অসাধারণ ক্ষমতা। এই শক্তির সাহায্যে দেবগণের হাতে নিহত সমস্ত অসুরগণকে তিনি বাঁচিয়ে তুলতেন তাই অসুরেরা কখনো হীনবল হয়ে পড়ত না। অপরপক্ষে তাদের শত্রুরা প্রতিটি নিহত যোদ্ধার হানিতে হীনবল হয়ে পড়ত।

অবশেষে দেবগণ বুঝতে পারলেন এই সর্তে লড়াই জেতার কোন আশা নেই। তখন তাঁরা দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচের কাছে গিয়ে বললেন, দেবতাদের গুপ্তচর হয়ে অসুরদের সর্বোচ্চ পুরোহিত শুক্রাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে এই বিদ্যা শিখে আসতে। দেবতারা এমন কি এই অতি মন্দ ইঙ্গিত দিলেন যে, বৃদ্ধ ঋষি শুক্রাচার্য ও তাঁর সুন্দরী তরুণী কন্যা দেবযানী এই উভয়ের প্রতি আচার ব্যবহারে মনোযোগী ও স্নেহশীল হলে কচের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অনুকূল হবে।

কচ তাঁর জাতির এই কূটনৈতিক দৌত্য গ্রহণ করে তাঁদের জন্য এই পরদেশী জ্ঞান সংগ্রহ করার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করে দিলেন। তিনি শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে সরাসরি নিজেকে বৃহস্পতির পুত্র বলে পরিচয় দিলেন এবং তাঁর শিষ্যত্ব প্রার্থনা করলেন। এই প্রস্তাব শুক্রাচার্যের দ্বারা সানন্দে গৃহীত হল—তিনি তাঁর সহকর্মী বৃহস্পতির কাছ থেকে পাওয়া এই সম্মানে অভিভূত হলেন।

আগেই বলা হয়েছে, বালিকা দেবযানীর স্নেহ-মমতা ও মাধুর্যের মাধ্যমে এই বালক সহজেই তাঁর পথ করে নিলেন। প্রথম থেকেই তিনি দেবযানীর শ্রদ্ধা পাবার চেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তাঁকে আনন্দ দেবার জন্য তিনি গাইতেন, নাচতেন, সবসময় তাঁর জন্য ফলমূল ও ফুলের উপহার নিয়ে আসতেন এবং সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন তাঁর যে কোন খেয়ালখুশী চরিতার্থ করার জন্য। অপরপক্ষে দেবযানীও তাঁর সরল সুমিষ্ট চিত্ত-জয়ী ব্যবহারের জন্য কচের প্রিয় হয়ে উঠলেন। দিন কেটে যেতে লাগল, দুজনে পরস্পরের প্রতি গভীর ভালোবাসার মধ্য দিয়ে ভাইবোনের মত একযোগে বেড়ে উঠতে লাগলেন।

কিছুকাল পর যাঁদের মধ্যে কচ বাস করছিলেন, সেই অসুরদের নজর পড়ল তাঁর উপর। এবং তাঁরা কচের এই শিষ্যত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠলেন।

নিশ্চয়ই তিনি মৃতকে পুনর্জীবন দানের বিজ্ঞান—যা অসুরদের অমূল্য রহস্য সেটাই কেড়ে নিতে এসেছেন। তাঁরা হীনতর জাতি ছিলেন, ব্রাহ্মণ হত্যা সম্বন্ধে তাঁদের কোন বিবেক দংশন ছিল না, তাঁরা তাই এই তরুণ ছাত্রটিকে হত্যা করার সঙ্কল্প আঁটলেন।

তারপর এল সেই সন্ধ্যা। সূর্যদেব পাটে বসতে যাচ্ছেন, শুক্রাচার্যের যজ্ঞাগ্নি ইতিমধ্যেই প্রজ্বলিত। দেবযানীর লক্ষ্যে এল অরণ্য থেকে গরুর পাল ফিরে আসছে কিন্তু তাদের সঙ্গে কোন কচ নেই। আতঙ্কিত হয়ে তিনি ছুটে গেলেন পিতার কাছে—ঘোষণা করলেন যে পিতার শিষ্য হয় হারিয়ে গেছে নতুবা সে নিহত—তাকে ফিরিয়ে আনতে না পারলে দেবযানীর কাছে জীবনের কোন অর্থ নেই। তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য পিতা তৎক্ষণাৎ সেই ঐন্দ্রজালিক সূত্র প্রয়োগ করলেন—"সেই মানুষ ফিরে আসুক।"—সঙ্গে সঙ্গে যে কচের দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে শেয়াল ও নেকড়ের পেটে গিয়েছিল, সেই কচ সাড়া দিলেন—আবার মৃদু হেসে তাঁর গুরু ও গুরুকন্যার সামনে এসে দাঁড়ালেন।

পরের বার কচ গেছেন পুষ্প চয়নে—তাঁকে হত্যা করা হল—তাঁর দেহ চটকে তালগোল পাকিয়ে সমুদ্রের জলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'ল। আবার দেবযানী তাঁকে না পেয়ে পিতার শরণাপন্ন হলেন—তিনি আবার কচের জীবন ফিরিয়ে আনলেন। এতেও পেছপা না হয়ে তৃতীয়বার অসুরবৃন্দ তাঁকে আবার মৃত্যুমুখে নিপাতিত করে তাঁর দেহ মণ্ডাকারে পিটিয়ে এই মণ্ড এই কুলগুরুর মদের সঙ্গে মিশিয়ে শুক্রাচার্যকেই সেই মদ দিল পান করতে—এই কাজের জন্য তিনি পরবর্তীকালে সর্বদা ব্রাহ্মণগণের মদ্যপানকে অভিশাপ দিতেন।

কিন্তু এবার যখন দেবযানী আবার তাঁর পালিত ভ্রাতার প্রাণ ফিরিয়ে আনবার জন্য পিতার সাহায্য প্রার্থনা করলেন, তখন স্বাভাবিক ভাবেই যথেষ্ট ক্লান্ত শুক্রাচার্য আপত্তি জানালেন। একবার দুবার তিনি যে প্রতিবাদ করলেন এটাও অনুধাবনযোগ্য। কিন্তু তাঁর কন্যার খেলার সাথীর যে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে নিহত হওয়া, তাকে জীবন ফিরিয়ে দেবার শ্রমে তিনি ক্লান্ত। অবশেষে অবশ্য জয় হল আদর দিয়ে মাথা খাওয়া শিশুটির চোখের জল ও কাকুতিমিনতিরই। অগত্যা শুক্র সেই ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র আবৃত্তি করতে সুরু করলেন। পিতা এবং কন্যা যুগপৎ পরম বিস্ময়ে শুনতে পেলেন যে পুরোহিতটির নিজের দেহের অভ্যন্তর থেকেই একটা ক্ষীণ স্বর সাড়া দিচ্ছে—"হায় গুরুদেব, আমি কি করবো এখন? আপনার আজ্ঞা পালন করে যদি আমি এগিয়ে আসি, তাহলে আমার এই কার্য দ্বারা আপনি দ্বিধাবিভক্ত হবেন—এইভাবে আমি আপনার বিনাশের কারণ হবো। অথচ আমি যদি এখানেই থেকে যাই, তাহলেও নিঃসন্দেহে এবারই আমার শেষ।" এই চমৎকার উভয়সংকটের মধ্যে শুক্রাচার্যের করণীয় কাজ ছিল একটাই—তাঁর সন্তানের ব্যাকুল কাকুতিমিনতিতে বিচলিত হয়ে তাঁর শিষ্যকে শিখিয়ে দেওয়া মৃতকে প্রাণদানের রহস্যময় মন্ত্রটি এবং তারপর তাকে সামনে নিয়ে আসা—যাতে করে সে আবার তাঁর নিজের প্রাণ ফিরিয়ে

দিতে পারে। এইভাবেই পরিশেষে কচ সেই জ্ঞানলাভ করলেন যার খোঁজে তাঁর এখানে আসা।

ছাত্রের তপশ্চর্যার দিন শেষ হয়ে এল অল্পকাল পরেই। কচ ঘোষণা করলেন তাঁকে এবার স্বজনদের মধ্যে ফিরতে হবে। কিন্তু দেবযানীর পক্ষে এটা নীরবে সয়ে যাওয়া অসম্ভব। তিনি কচের কাছে সনির্বন্ধ মিনতি জানালেন তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করে নিয়ে তাঁর ও তাঁর পিতার কাছে চিরকাল থেকে যাবার জন্য। হায়, কচের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, শুক্রাচার্য তাঁর প্রানদান করায় বস্তুতঃ তিনি দেবযানীর ভ্রাতৃতুল্য এবং তাঁর সূক্ষ্ম মার্জিত রুচি এই কারণবশতঃ দেবযানীকে বিবাহ করার চিন্তাকে তাঁর কাছে ঘৃণ্য করে তুলেছে। এই পরিস্থিতিতে তাঁর দৃষ্টিভংগী থেকে তিনি অনমনীয় অথচ কোন যুক্তি-তর্কই দেবযানীকে প্রভাবিত করতে পারছে না। এই সিদ্ধান্তের পিছনে যে বলিষ্ঠ নীতিবোধ রয়েছে দেবযানী কোনরকম ঔদার্য অথবা যুক্তিতর্ক দিয়ে তাকে গ্রহণ করতে অক্ষম। তাঁর জীবনে এই প্রথমবারের মতো এমন একজন পুরুষ এসেছেন যাঁকে মিষ্টি কথাতেও ভোলানো যাচ্ছে না, ধমকিয়েও কাজ হচ্ছে না, তখন ক্রুদ্ধ আবেগের বশবর্তী হয়ে দেবযানী ঘোষণা করলেন—"এ ভাবে তুমি যে জ্ঞান অর্জন করেছ, আমাকে পত্নীত্বে বরণ না করলে তোমার কাছে এ বিদ্যা নিষ্ফলা থেকে যাবে।"

মহান শুক্রাচার্যের কন্যার মুখনিঃসৃত এই আবেগতাড়িত বাণীর শক্তি বিরাট এবং অভিশাপের মতোই। তাই কচ দ্রুতবেগে এর সবচাইতে মন্দ দিকটাকে এড়াতে চাইলেন—তিনি মৃদুস্বরে বললেন—"তবে তাই হোক। তবু এ বিদ্যা ফলবতী হবে তাদেরই কাছে যাদের আমি এ বিদ্যা শেখাবো।" এর সঙ্গে তিনি আরো যোগ করলেন যে যেহেতু তিনি দেবযানীর ইচ্ছা পূরণ করতে বিরত হয়েছেন প্রেমের অভাবে নয়, তাঁকে সম্মানিত করবার জন্যই, সেহেতু দেবযানীর এই ক্রোধের শাস্তি হিসাবে তিনি কোনদিনও কোন সাধু, সন্ন্যাসী, পণ্ডিত অথবা দিব্যজ্ঞানীর স্ত্রী হতে পারবেন না। এই ভবিষ্যৎবাণীর ফলস্বরূপ পরবর্তীকালে দেবযানীর বিবাহ হ'ল তাঁর পিতার অনুরূপ কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে নয়—বিখ্যাত রাজা যযাতির সঙ্গে। এই বিবাহের মাধ্যমে তিনি যদু ও তুর্বসুদের আদি-জননী হলেন। এদিকে আবার রাজকীয় বংশোদ্ভূত অপর একজন হীনতর স্ত্রীর মাধ্যমে পূর্বে যাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে সেই তিনটি বংশের পূর্বপুরুষ হলেন রাজা যযাতি এবং দেবযানীর সন্তানেরা হলেন তাঁদের জ্ঞাতি।

এই কাহিনী যেখান থেকে নেওয়া হয়েছে, তার মূল টুকরোগুলো কি ছিল? সমগ্র জিনিসটাই কি একটা কুলুজী, জাতীয় ইতিহাসে যার অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বিশেষ কয়েকটি উপজাতির দাবী রয়েছে? শেষতম কবি, সম্পাদক হিসাবে কাজ করতে গিয়ে কি কচের ঘটনাটি কল্পনা করেছেন? রাজবংশোদ্ভূত যযাতির সঙ্গে ব্রাহ্মণ কন্যা দেবযানীর বিবাহ তাঁর কালে খাপছাড়া ঐতিহ্য বলে মনে হওয়ার দরুণ কি তিনি তার একটা ব্যাখ্যা দিতে প্রয়াসী হ'ন? হতেও পারে। অথচ এই যুক্তির বিপক্ষে এই বিবৃতি রয়েছে—"প্রাচীনকালে সমগ্র তিনভুবনের অধিকার নিয়ে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে দ্বন্দ্ব

সংঘাত বাধত।"—এই উক্তিকে তো সুদূর অতীতের খাঁটি প্রতিধ্বনি বলেই মনে হয়। এখন কাহিনীটির যে রূপ দাঁড়িয়েছে তার সমস্ত জোড়াতাড়াগুলো বিচার করে দেখলে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সর্বশেষ কবিটি হয়তো বেশ বৃহদাকারেই হস্তক্ষেপ করেছেন কিন্তু খুব সম্ভতঃ এই কাহিনীটি—এমনকি কচ ও দেবযানীর রোমান্সটিরও বীজ ছিল বহুকাল-প্রচলিত কোন লোককাহিনীতে। দেবযানীর প্রস্তাবের রূপকথাটি খুব সম্ভবতঃ জন্ম নিয়েছিল মাতৃতন্ত্রের যুগে—যখন কোন পুরুষের পক্ষে তার স্ত্রীর জ্ঞাতিবর্গের সদস্য হওয়ার ব্যাপারটা অস্বাভাবিক ছিল না। তাই দেবযানীর কচ-কর্তৃক গৃহীতা হবার ব্যাগ্রতার প্রেরণা ছিল মূলতঃ তাঁর স্বজনগনের শত্রুবর্গের হাতে সেই মূল্যবান ঐন্দ্রজালিক সূত্রটি চলে যাওয়াকে ঠেকিয়ে রাখার বাসনা, অনুরূপভাবে কচ তাঁর প্রত্যাখ্যানের হেতু হিসাবে সৌজন্য বা ভদ্রতার যে অজুহাতই খাড়া করুন না কেন, তিনি বস্তুতঃ এই ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে, তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে এটাই হচ্ছে শেষতম প্রলোভন এবং তার একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে যে জ্ঞান সংগ্রহে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন, অসুরদের পরিত্যাগ করে সেই জ্ঞান নিয়ে দেবগণের কাছে ফিরে যাওয়া। পরিশেষে এই কাহিনী তার সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে যা দাঁড়িয়েছে তা গ্রহগত প্রভাবকে কাব্যিক রূপ দেওয়ার চিহ্নের অতিরিক্ত আরো কিছু বহন করছে। গ্রহগত প্রভাবকে কাব্যিক রূপ দেওয়ার পরিপূর্ণ ফুল ও ফল হচ্ছে প্রাচীন ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্র।

কিন্তু তারকাদের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার প্রতিনিধিত্ব করে এমন সব পৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে ধ্রুবর কাহিনীটিই হচ্ছে রত্নস্বরূপ। ধ্রুবতারা কেমন করে এত স্থির নিশ্চল হল কাহিনীটি তারই একটা সরল বিবৃতি। ধ্রুবতারার হিন্দু নাম হচ্ছে ধ্রুবলোক অর্থাৎ ধ্রুবর জায়গা।

ধ্রুব ছিলেন এক রাজা ও তাঁর পাটরাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র বালক রাজপুত্র। এদিকে আবার এক সুয়োরাণী ছিলেন, ধ্রুবর পিতার উপর যাঁর ছিল বিরাট প্রভাব। তাঁর ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষের ফলস্বরূপ এই রাজপুত্র ও তাঁর জননী সুনীতিকে নির্বাসনে যেতে হল—রাজপুরীর বাইরে বিশাল এক অরণ্যের ধারে একটা কুটিরে তাঁদের বসবাস করবার জন্য পাঠানো হল। এখানে অবশ্য স্মর্তব্য এই যে আমরা এমন একটা যুগের কথা আলোচনা করছি যখন প্রতিটি গল্পই গড়ে তোলে আত্মার অন্তর্জীবনের কাহিনী এবং সেখানে মূল ঘটনা সেটাই যার দ্বারা জড় বিশ্ব সম্পর্কে একটা অনীহা জন্মায়। তরুণ লুথার তাঁর বন্ধুকে বজ্রাঘাতে মারা যেতে দেখা মাত্র একটা মঠে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন।

কিন্তু ধ্রুবর ইতিহাসে সংকট মুহূর্ত দেখা দিল যখন তাঁর সাত বছর বয়েস। সে বয়সে তিনি মাতাকে প্রশ্ন করতেন তাঁর পিতা কে। মাতা উত্তর দেবার পর তাঁর আরো একটা জিজ্ঞাসা বাকী ছিল। তা হ'ল এই যে তিনি কি গিয়ে তাঁর পিতাকে দেখে আসতে পারেন? সঙ্গে সঙ্গে অনুমতি পেলেন তিনি, নির্দিষ্ট দিনে বালকটি গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা করলেন। বিরাট মোহমুক্তি ঘটল সেই মুহূর্তে যখন পিতার

সাদর ও স্নেহময় অভ্যর্থনার (কেননা এই শিশুপুত্রটি পিতার প্রিয় ছিল) মধ্যে ধ্রুব সানন্দে তাঁর পিতার কোলে উপবিষ্ট। ধ্রুবর বিমাতা প্রবেশ করলেন, তার মুখে ও কণ্ঠস্বরে ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখে ত্রস্ত হয়ে পিতা বালককে কোল থেকে নামিয়ে দিলেন।

মর্মে মর্মে আহত হয়ে শিশুটি পিছন ফিরে একটি কথাও না বলে মৃদু পায়ে বেরিয়ে গেল। তিনি চেয়েছিলেন বলিষ্ঠতা অথচ কোথাও তা পেলেন না। বিশ্বের বলিষ্ঠতম স্নেহ যে পিতার, এমন কি সে পিতা যখন একজন রাজা—তাঁরও বিশ্বস্ত হয়ে রক্ষা করার সাহস নেই। তাঁদের নির্বাসন পুরীতে পৌছে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে যে উৎকণ্ঠিতা রমণী তাঁর অনুপস্থিতির প্রতিটি প্রহর গণনা করেছেন তাঁর কাছে ধ্রুবর আর একটি মাত্র জিজ্ঞাসাই ছিল। "মা, পৃথিবীতে কি এমন কেউ আছেন যিনি আমার পিতার চেয়েও শক্তিশালী ?"

সচকিতা রাণী জবাব দিলেন—"হ্যাঁ বাছা, নিশ্চয়ই আছেন। পদ্মলোচন রয়েছেন—তাঁর মধ্যেই রয়েছে সমস্ত শক্তি !"

গম্ভীর ভাবে বালক বললেন—"আচ্ছা মা, পদ্মলোচন থাকেন কোথায় ? কোথায় গেলে তাঁকে পাওয়া যাবে ?"

এই সহজ সরল শব্দ কটিতে কি বিপদের কোন সংকেত ছিল ? ইঙ্গিত ছিল কি আগামী সমস্ত বছরে ছায়া ফেলবে যে বিদায় তার কোন সুরের ? নিশ্চয়ই ছিল কিছু, কেননা জননী এবার যে উত্তর দিলেন হয়তো বা ভয় থেকেই, যা এমন কোন অনুসন্ধানকে অসম্ভব প্রতিপন্ন করবে।

তিনি বললেন —"পদ্মলোচন কোথায় থাকেন বাছা ? ওহোঃ ! তিনি থাকেন অরণ্যের গহনে—যেখানে বাঘভাল্লুকরা থাকে। সেখানেই তাঁর বাস !"

সে রাতে, চাঁদ উঠলে পর নিদ্রিতা রাণীর পাশ থেকে বালক পা টিপে টিপে উঠে পদ্মলোচনের কাছে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। জননীর পাশে মুহূর্তখানেক দাঁড়িয়ে তিনি বললেন—"হে পদ্মলোচন, আমার জননীর ভার তোমায় দিলাম।" তারপর বাড়ীর চৌকাঠে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন—"হে পদ্মলোচন, আমি আমাকেও দিলাম তোমায়।" তারপর সাহসী পদক্ষেপে অরণ্য-অভিমুখে এগিয়ে গেলেন। কোন জটিলতা ছিল না। দূরত্বটাও কিছুই নয়। তিনি বালক মাত্র, পথের বিপদ সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। কোন রকম হোঁচট না খেয়েই তিনি এগিয়ে চললেন আরো সামনের দিকে।

বেশ কিছু পরে সেই অপরিমেয় অরণ্যের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তিনি ধ্যানমগ্ন সপ্ত-ঋষির কাছে এসে পৌছোলেন এবং তাঁদের কাছে পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করার জন্য থামলেন। অবশেষে তিনি অরণ্যের কেন্দ্রস্থলে উপনীত হয়েছেন। তিনি সেখানে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর প্রতীক্ষমান অবস্থায় এল বাঘশিশু। ধ্রুব তার কাছে এগিয়ে গিয়ে ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করলেন—"তুমিই কি তিনি ?" বাঘ

লজ্জায় মুখ নামিয়ে ফিরে গেল। তারপর এল ভালুক, আবার ধ্রুব এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—"তুমিই কি তিনি ?" কিন্তু ভালুকও মাথা নামিয়ে চলে গেল।

তারপর ধীরচিত্ত বালকটি যখন অপেক্ষায় রয়েছে ও পথ চেয়ে আছে, তার সামনে এসে দাঁড়ালেন এক মহর্ষি—তিনি হচ্ছেন নারদ। নারদ তাঁকে একটা স্তব শিখিয়ে দিয়ে বললেন এখানে, এই অরণ্যের গভীরে বসে তাঁর সমস্ত মন ঐ স্তবে নিবিষ্ট করতে এবং বার বার সে স্তব জপ করতে, তাহলেই তিনি পদ্মলোচনকে খুঁজে পাবেন। তাই, অরণ্যের কেন্দ্রস্থলে আমরা যেখানে ধ্রুবতারাকে দেখতে পাই, সেখানে আসলে বসে আছেন প্রার্থনারত ধ্রুব। বহুকাল আগেই তিনি পদ্মলোচনকে খুঁজে পেয়েছেন নিজেরই হৃদয়ের মধ্যে। কেননা, তিনি এমনই নিখুঁত একাগ্রতা নিয়ে প্রার্থনায় মনোনিবেশ করেছিলেন যে, কখন যে উইয়ের দল এসে তাঁকে ঘিরে ফেলে মধ্যরাত্রির আকাশের বৃহদাকার উইঢিপিটি গড়েছে, শিশু ধ্রুব তা জানতেও পারেননি। তিনি একটু নড়াচড়া করেননি অচঞ্চল সমাহিত চিত্তে তিনি বসে আছেন—এখনও পর্যন্ত বসে রয়েছেন—চিরতরে উপাসনা করে চলেছেন পদ্মলোচনের।

৩ (?)

সাধারণভাবে আর্য ও সংস্কৃত ধ্যানধারণার বৈশিষ্ট্য সূচক আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষে মাটি খুঁজে পায় এবং সমস্ত নৈসর্গিক ঘটনার ব্যাখ্যাকে অনুরঞ্জিত করে তুলতে থাকে। আকাশের তারকারা যে পুণ্যে অবিচল ধ্যানরত মহাত্মাদের আসন এ ধারণা ক্রমশঃ স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এমন কি আকাশ থেকে খসে পড়া তারা বা উল্কাপাতকেও ব্যাখ্যা করা হ'ত পুণ্যের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে সেইসব আত্মাদের স্বর্গচ্যুতি বলে। সপ্তাহের সাতটি দিন যে রবি, সোম এবং অন্যান্য মুখ্য পাঁচটি গ্রহ বা প্রচলিত 'প্রাচীন সপ্তগ্রহ'কে উৎসর্গীকৃত তা আসলে তাঁদের প্রসন্ন করার চেষ্টা এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। গোড়া থেকেই গ্রহদেরকে তারকাদের নির্দিষ্ট বিন্যাসের কোন না কোন ভাবে বিরোধী বিদ্রোহী সত্তা বলে গণ্য করা হত। এঁরা হচ্ছেন ভ্রমণকারী। এঁরা বিরাট শক্তিশালী নিশ্চয়ই তবে এঁরা ভুলও করেন বটে। তাই এঁরা যে যে সত্তার বিগ্রহ তাঁদের তুষ্ট করা বিশেষ প্রয়োজন। এই চিন্তার স্তর থেকেই সপ্তাহের নামগুলো জন্ম নিল যা বাংলাদেশের পূর্ব থেকে ফ্রান্সের পশ্চিম বা স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উত্তর পর্যন্ত একই রকম ভাবে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনিকে উৎসর্গীকৃত। গ্রহ-মূলত ধ্যানধারণার এই সংহতির মধ্যে আমরা পাই নতুন একটা তারিখ, তারকা-উপাসনার যুগের সুরুর অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা এটি। এখানে আমরা পাচ্ছি সাতদিনের সপ্তাহ এবং সমগ্র জিনিসটির পরিকল্পনায় সূর্য ও চন্দ্রের স্থান সমেত একটি সংশোধিত তত্ত্ব। এই পর্যায়ে কোন মিট মিট করা তারাকে যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এই বিশেষ তথ্যটি থেকে বোঝা যায় যে এই সূত্রবদ্ধ করণের পিছনে ছিল একটা স্বীকৃত শ্রেণীবিভাগ, স্থির তারাদের একটা স্বচ্ছ সংজ্ঞা। এমন হতে পারে যে,

'সাত' এই সংখ্যাটির গুরুত্ব মূলতঃ জন্ম দিয়েছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলীর নক্ষত্র সংহতির চিন্তা থেকে। অথবা ঠিক এমনটাও হতে পারে যে গ্রহগণের এই বিশেষ গণনার স্তরে জ্ঞানের ঠিকানা থমকে দাঁড়িয়েছিল বহুকাল—তাই সেখান থেকেই সংখ্যাটির গুরুত্ব জন্ম নেয়। সে যাই হোক বহুকাল আগেই প্রায় খৃষ্ট পূর্ব ৪০০০ থেকে ৫০০০ সাল নাগাদই প্রাচীন আসীরিয়াতে সাতদিনের সপ্তাহ ও বারো মাসের বৎসর গণনার কথা জানা ছিল। গ্রহগত সপ্তাহের মূল প্রথম দিনটির অধীশ্বর দেব ছিলেন শনি। এই তথ্যটি এই ধারণাকেই সমর্থন করছে যে মূলতঃ এই উৎসর্গীকরণ ছিল প্রসন্নতা সম্পাদনের জন্য। এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে অনেক পরিবারে মাতা তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য প্রতি শনিবার শনির পূজো করেন। বলা হয়ে থাকে সে তাঁর শক্তি বিশেষ ভাবেই আধ্যাত্মিক, কিন্তু জাগতিক সুখ সমৃদ্ধির উপর তাঁর প্রভাব অমঙ্গলজনক, এই ধরনেরই আরো একটি ধারণা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে সূর্যের নাম ও ধারণা সম্পর্কে। তবুও এই সব রীতিনীতি পালন নির্দেশ করে একদা যেমন ভাবে করেছিল সেই নতুন পর্যায়ের চিন্তাধারা ও পুরাণের উদ্ভবকে যেগুলোকে দীর্ঘকাল আগেই আরো অনেক উচ্চতর পর্যায়ের চিন্তার ঠিকানা অতিক্রম করে এসেছে। তাই এখন এগুলো টিকে আছে কিছুটা রক্ষণশীল ভাবে কুসংস্কারের ভাবে ব্যাকুলা নারীদের মধ্যে। ভবিষ্যদ্বক্তারা কোন দ্বারপ্রান্তে পদক্ষেপ করে করতল বিচার করে বলেছেন কোন বিশেষ কন্যাটি দুর্ভাগিনী এবং তাকে এই অশুভ এড়াতে হলে গ্রহ শান্তি করতে হবে। কিন্তু কড়া বিচার বোধ সম্পন্না কোন ঠাকুমা যিনি মেধায় ও নিষ্ঠায় বলিষ্ঠ চিত্তের অধিকারিনী তিনি এসব কিছুতে কর্ণপাতও করবেন না—গ্রহ শান্তি স্বস্ত্যয়নও করাবেন না।

হিন্দুধর্মে একটা যুগ এসেছিল যখন ধর্ম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল পার্থিব শুভ ও শক্তির অধীশ্বর সব দেবের দিক থেকেই। ভক্তের মতোই দেবতাকেও পার্থিব হিত ও সম্পদকে এড়িয়ে যেতে হবে। খৃষ্টীয় যুগের প্রায় পাঁচ শ বছর আগে জনসাধারণের উচ্চ নীচ নির্বিশেষে বৌদ্ধধর্ম ধর্মের সত্য উদ্দেশ্য হিসাবে ব্যক্তিগত বিকাশ ও বৈরাগ্যের কিছু মহৎ তত্ত্বকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। খৃষ্টীয় যুগের কাছাকাছি সময়ে ভারতে এই সব তত্ত্ব একটা নতুন বিশ্বাসরূপে সংহত রূপ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠেছিল। শিবের পূজার অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে এই বিন্দুতেই কিন্তু বিবর্তনটি থেমে গেল না। কয়েক শতাব্দী পরেই আবার এই উচ্চতর হিন্দুধর্মের একটা নতুন পর্যায় প্রচারিত হতে লাগল এবং সত্য-নারায়ণের পূজা দেখা দিল কৃষ্ণরূপে তাঁর দেহ ধারণের। এই ধর্মকেই পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়ে বিরাট মহাকাব্য আকারে প্রচার করা হ'ল—যে মহাকাব্যটি এখন মহাভারত নাম নিয়ে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে।

শিক্ষিত সমাজে অনেকে এই অভিমত পোষণ করেন যে, আদিমযুগের আকাশ পর্যবেক্ষণকারী মানুষের চোখে পুরোন সমস্ত বিস্ময়কর জগতের কাহিনীর স্মৃতিচারণার মাধ্যমে পুনর্বিন্যাসই হচ্ছে মহাভারত। দেবতা, নায়ক, উপদেবতারা এর পাতায়

পাতায় গুঁতোগুঁতি করছেন; কোথা থেকে এঁদের আগমণ বা এঁদের প্রাক্তন ইতিহাসই বা কি খুজতে গেলে আমরা এখানে ওখানে এক আধটা নাম বা অল্পস্বল্প প্রাসঙ্গিক তথ্যমাত্র আবিষ্কার করি। বহুমূল্য কারুকার্যখচিত পর্দাতে যেমন হয়ে থাকে, তেমনিভাবে এরা একত্র হন কোথাও বা যুদ্ধক্ষেত্রে কোথাও বা জীবনে। সংগ্রামরত শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাদের তরবারির ঝনঝনানিতে, সামন্ত মিত্রদের বিশ্বস্ততায়, ছন্দরত ভালোবাসা ও পরস্পর বিরোধী আদর্শের মধ্য দিয়ে তৈরী হয়ে উঠেছে বিশ্বের মহত্তম ধর্ম অস্ত্রগুলির অন্যতমটি। সর্বাধিনায়ক কবি যা সংযোগ করেছেন বা ঢেলে সাজিয়েছেন, অতীতের বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন রূপকল্পকে একটিমাত্র ঢালাইতে মিশিয়ে দিয়েছেন, এই সব চরিত্রের অধিকারণই প্রকৃতপক্ষে মধ্যযানের আকাশরূপ মঞ্চ থেকে নেমে এসেছিলেন এটা কি সত্যি? তবে সে যাই হোক না কেন, একটা জিনিস নিশ্চিত, তা হল এই বিরাট দৃশ্যমালার শেষতমটি হচ্ছে একটি মানুষ একটি কুকুর দ্বারা অনুসৃত হয়ে একটা পাহাড়ে চড়ছে, এবং পরিশেষে সে কুকুরটিকে দিয়েই সশরীরে স্বর্গে উত্তীর্ণ হচ্ছে।

যাঁদের জন্য সেই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হল ও জয় অর্জিত হল, সেই পাঁচজন রাজবংশোদ্ভূত নায়ক ভারত সাম্রাজ্য ছত্রিশ বছর শাসন করবার পর উপলব্ধি করলেন যে বিদায়ের দিন সমাসন্ন হয়ে এসেছে। তখন তাঁরা তাঁদের রাণী দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে সিংহাসনের ও রাজত্বের ভার তাঁদের উত্তরাধিকারীগণের হাতে সমর্পণ করে তাঁদের সর্বশেষ আনুষ্ঠানিক ভাবগম্ভীর যাত্রা সুরু করলেন—এই যাত্রা হল মরণের উদ্দেশ্যে তীর্থযাত্রা, সঙ্গী হল এক নাছোরবান্দা সারমেয়। রাজকীয় পূজার্চনার শেষ পর্যায়ে তাঁদের বিশাল রাজ্যের পরিধি পরিক্রমা প্রথমে শেষ করে তাঁরা হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পথে রওনা হলেন। স্পষ্টতঃই তাঁরা নক্ষত্রদের মধ্যে নিজেদের যথার্থ স্থানটির দিকে যাত্রা করলেন। এই পৃথিবীতে যে মানুষটি কোন অন্যায় আচরণ না করে বেঁচে এসেছেন শুধু তিনিই আশা করতে পারেন সর্বশেষ ধাপটিতে উত্তীর্ণ হবার। কিন্তু পাণ্ডবদের গৌরব যত বড়োই হোক না কেন, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরই কেবল পূর্বোল্লিখিত মান অনুসারে নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করে সশরীরে স্বর্গে আরোহনের সম্মান পেলেন। ভীম, অর্জুন, নকুল সহদেব দুই যমজভ্রাতা ও রাণী দ্রৌপদী—একে একে এই অনুরা সকলেই মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়ে গেলেন ও মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কিন্তু একবারের জন্যও পিছু ফিরে না তাকিয়ে, কোন আর্তনাদ বা দীর্ঘশ্বাস ছাড়াই যুধিষ্ঠির ও কুকুর এগিয়ে গেলেন একাকী।

হঠাৎ তাঁদের পদক্ষেপ রুদ্ধ হল এক বজ্রনির্ঘোষে; বিশাল এক জ্যোতিঃপুঞ্জের মধ্যে তারা দেখতে পেলেন স্বর্গ অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর রথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি এখানে এসেছেন যুধিষ্ঠিরকে সঙ্গে করে স্বর্গে নিয়ে যাবার জন্য। তাই তৎক্ষণাৎ তাঁকে রথে আরোহণ করতে অনুরোধ করলেন।

এই জায়গাটায় এসে সম্রাটের প্রত্যুত্তরটিতে আমরা পরিমাপ করতে পারি বিশুদ্ধ মহাজাগতিক দেবার্চনার আদিম যুগ থেকে হিন্দুরা তাঁদের দেবদেবী ও উপদেবদেবীদের

উপর আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতা আরোপ করার ব্যাপারে কতদূর পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তাঁর মৃত ভ্রাতাগণের সকলকে তাঁর সঙ্গে একযোগে এই রথে আরোহণের আমন্ত্রণ না জানালে যুধিষ্ঠির এই রথে আরূঢ় হবেন না, এর সঙ্গে তিনি আরো যোগ করে দিলেন যে সর্বাগ্রে যিনি পড়ে গিয়েছিলেন সেই রাণী দ্রৌপদীকে তাঁদের সঙ্গে না পেলে তাঁদের মধ্যে কেউই সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না। তাঁর ভ্রাতাগণ ও পত্নী আগেই সেখানে পৌছে গেছেন ও যুধিষ্ঠির সেখানে চিরন্তন পরম সুখের অবস্থায় পৌছোবামাত্র তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, ইন্দ্রের কাছ থেকে এই আহ্বান পেলে তবে তিনি সেই স্বর্গীয় রথে আরোহন করতে সম্মত হলেন। এবং প্রথমে কুকুরটিকে চড়তে দেবার পথ করে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু এখানে ইন্দ্র প্রতিবাদ জানালেন। হিন্দুদের কাছে কুকুর অপবিত্র জীব। স্বর্গে একটি কুকুরের বসতি চিন্তা করা অসম্ভব! তাই তিনি যুধিষ্ঠিরকে মিনতি জানালেন কুকুরটি ফেরৎ পাঠাবার জন্য। কিন্তু কিমাশ্চর্যম! তিনি রাজী হলেন না এ প্রস্তাবে। তাঁর কাছে কুকুর হচ্ছে এমন একজন যে অনুগত ভক্ত, ক্ষয় বিপর্যয়ের দিকে বিশ্বস্ত এবং সামগ্রিক নিঃসঙ্গতার মুহূর্তেও বিশ্বস্ত ও প্রেমময়। প্রকৃত খাঁটি এমন কাউকে ঝেড়ে ফেলেছেন এই চিন্তার কশাঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি এমনকি স্বর্গেও সুখের কল্পনা করতে অক্ষম।

দেবতাটি যতই বোঝান ও যুক্তি প্রদর্শন করেন, তাঁর প্রতিটি কথাতেই সম্রাট অধিকতর স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তাঁর পৌরুষের ধারণায় আঘাত লেগেছে। "স্নেহপরায়ন কাউকে পরিত্যাগ করা অক্ষয় পাপ।" কিন্তু এছাড়াও নৃপতি হিসাবে তাঁর ব্যক্তিগত গৌরব ও অভিমানও জেগে উঠেছে। এযাবৎ কোন দিনও তিনি ভীত অথবা ভক্তকে বঞ্চিত করেননি কিংবা করুণাপ্রার্থী বা নিজেকে রক্ষা করতে অক্ষম বা শরণাগতকেও প্রত্যাখ্যান করেননি। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সুখের আশায় তিনি নিশ্চিতই নিজের সম্মানকে ক্ষুণ্ণ করবেন না।

তারপরই এই পরিস্থিতিতে তোলা হল পবিত্রতম বিবেচনার প্রশ্নটি। মনে রাখতে হবে যে, হিন্দু মাটিতে বসে খাওয়া দাওয়া করেন, সেইজন্যই ভোজনগৃহে কুকুরের প্রবেশকে কেন আতংকের বিষয় মনে করা হয় সেটা সহজেই বোধগম্য। স্পষ্টতই তাই স্বর্গেও এই জিনিসের প্রতি সমাজ বীতরাগ। ইন্দ্র যুক্তি দেখাতে লাগলেন "আপনি তো জানেন যে স্বর্গে কোন কুকুরের উপস্থিতি মাত্রই তা অপবিত্র হয়ে যাবে।" তার দৃষ্টিপাত মাত্রই কোন ধর্মানুষ্ঠানের পবিত্রতা নষ্ট হয়। তাহলে যে ব্যক্তি নিজের পরিবারকেই পরিত্যাগ করেছেন তিনি কেন একটা কুকুরকে ছেড়ে যেতে এতোটা নারাজ?

যুধিষ্ঠির তিতিবিরক্ত হয়ে বললেন যে যারা তাঁকে সঙ্গ দেবার জন্য আর বেঁচে রইলেন না, বাধ্য হয়েই তাঁদের ত্যাগ করতে হয়েছে। একথাও তিনি প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিলেন যে, হয়তো বা এই বিতর্ক চলতে চলতেই তাঁর সিদ্ধান্ত আরো বদ্ধমূল হয়ে

উঠেছে। পরিশেষে তিনি চূড়ান্তভাবেই ঘোষণা করলেন যে কুকুরটিকে পরিত্যাগ করার চাইতে আর কোন ঘৃণ্য কাজের কথা তিনি এখন আর কল্পনাও করতে পারছেন না।

পরীক্ষা শেষ হ'ল। যুধিষ্ঠির একটা কুকুরের জন্য স্বর্গকে প্রত্যাখ্যান করলেন— এবারে কুকুর তাঁর সামনে দীপ্যমান এক দেবমূর্তি ধারণ করে দাঁড়ালেন। ন্যায়বিচারের দেবতা স্বয়ং ধর্ম তিনি। নশ্বর এই মানুষটিকে অসংখ্য প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়ে গৌরবের রথে আচরি হয়ে এই নশ্বর দেহ নিয়েই স্বর্গে প্রবেশ করলেন।

এখনো পর্যন্ত কিন্তু কবি স্পষ্ট করে কোথাও বলেন নি যে মহান গৌরবের আসনে একাকী উত্তীর্ণ হতে গেলে নিখুঁত মানুষটির কাছে কি প্রত্যাশিত। স্বর্গে প্রবেশ করে যুধিষ্ঠির দেখতে পেলেন তাঁর শত্রুগণ অর্থাৎ যে সব বীরের সঙ্গে তিনি লড়াই করেছেন তাঁরা সকলেই জ্যোতিতে প্রদীপ্ত হয়ে সিংহাসনে বসে আছেন। এই দৃশ্যে সম্রাটের আত্মা যথেষ্ট অপমানিত বোধ করলেন। ফলতঃ তিনি প্রশ্ন তুললেন উত্তম সঙ্গের আনন্দের তুল্যরূপে কি ইন্দ্রিয়গত সুখভোগকে তিনি গ্রহণ করবেন? কোথায় স্বর্গে তাঁর মিত্রগণ তাঁর জন্য অপেক্ষমান থাবার কথা—সে জায়গায় তিনি দেখতে পাচ্ছেন এমন একটা জায়গা —আর তাতে এমন সব লোকের বসতি যে তার সম্পূর্ণ অন্যরকম কোন মানে হওয়া উচিত।

সুতরাং যুধিষ্ঠিরকে নিয়ে যাওয়া হল) সম্পূর্ণ অন্য রকম আর একটা জায়গায়। সেখানে অন্ধকার ও যন্ত্রণায় আতংকের মধ্যে তাঁর দেহের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে এল, ক্রুদ্ধভাবে তিনি তাঁর পথ প্রদর্শককে আদেশ করলেন তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে নিতে। ঠিক এই মুহূর্তে চারপাশ থেকে উত্থিত দীর্ঘশ্বাসে ভরা কণ্ঠস্বর তাঁকে থাকবার জন্য মিনতি জানাতে লাগল। এই শব্দ স্পর্শ ও দৃশ্যের সজীব যন্ত্রণার মধ্যে কারারুদ্ধ সব আত্মারা তাঁর অবস্থানের দরুণ মুহূর্তের জন্য স্বস্তি অনুভব করছেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সম্রাটকে থামতে হল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আতংকের সঙ্গে উপলব্ধি করলেন যে এই কণ্ঠস্বরগুলো তাঁর অত্যন্ত পরিচিত। এইখানে, অর্থাৎ নরকে রয়েছেন তাঁর সমস্ত জ্ঞাতি ও মিত্রগণ। ওদিকে স্বর্গে তিনি তাঁর পরম শত্রুকে দেখে এসেছেন। তাঁর মনে ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হ'ল। যে দূত তাঁকে এখনো ছেড়ে যায়নি, তার দিকে ফিরে ক্রোধে ফেটে পড়ে বজ্র নির্ঘোষে তিনি বললেন—"যাও যেখান থেকে তুমি এসেছো সেই সর্বোচ্চ দেবতাদের কাছে ফিরে গিয়ে বল যে আমি আর কোনদিনও তাদের মুখ দেখতে চাই না। কি ব্যাপার! না মন্দ লোকগুলো সব তাঁদের কাছে আর এখানে আমার স্বজনবর্গ কিনা নরকে পড়ে আছে। এটা অপরাধ, এই অপরাধ যাঁরা সংঘটিত করেছেন, তাঁদের কাছে আমি আর কোনদিনও ফিরবো না। এখানে নরকে আমার উপস্থিতিতেই যখন আমার বন্ধুরা সাহায্য পাচ্ছেন তাঁদের সঙ্গেই আমি চিরকাল থাকবো। যাও!

ক্ষিপ্রবেগে দূত প্রস্থান করলো, একাকী রইলেন যুধিষ্ঠির—তাঁর মাথা বুকের উপর

ঝুলে পড়লো—তাঁর ভালোবাসার পাত্র সকলের ভাগ্যের সাথে সাথে তিনিও নরকেই ডুবলেন।

মুহূর্তকাল কাটতেই হঠাৎ দৃশ্যপট পরিবর্তিত হ'ল। মাথার উপরে আকাশ উজ্জল হয়ে উঠল, সুমন্দ মধুর বাতাস বইতে লাগলো। যা কিছু কুৎসিৎ ও বিতৃষ্ণাময় সবই অদৃশ্য হয়ে গেল। যুধিষ্ঠির উপরে তাকিয়ে দেখলেন দেবতারা তাঁকে চারপাশ থেকে ঘিরে রয়েছেন, তাঁরা চীৎকার করে বললেন—"বাঃ বেশ করেছেন—হে নৃপতি, আপনার বিচার শেষ, লড়াই করে আপনিই জয়ী হয়েছেন। সব রাজাকেই স্বর্গ-নরক দুইই দেখতে হয়। যারা আগে দেখতে পায় এটি তারাই সুখী। আপনার জন্য ও আপনার জ্ঞাতিদের জন্য শুধু সুখ ও গৌরব ছাড়া আর কিছু থাকবে না। এবার আপনারা স্বর্গের গঙ্গায় (মন্দাকিণী) ডুব দিয়ে এসে আপনাদের মর্ত্যের শত্রুতা ও দুঃখ ঝেড়ে ফেলুন। এখানে এই ছায়াপথে আপনারা অমর দেহ ধারণ করে নিজ নিজ সিংহাসনে আসীন হোন। দেবতাদের মধ্যে আসন গ্রহণ করুন আপনি, কেননা ইন্দ্রেরই মতো মহান আপনি। আপনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি নশ্বর মর্ত্যদেহ নিয়ে স্বর্গে আরোহণ করেছেন।"

যে আধ্যাত্মিকতা আরোপের প্রক্রিয়াটির সূত্রপাতের মুহূর্তটি দেখা গিয়েছিল দক্ষ ও শিবের কাহিনীতে, এখানে সেটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপেই দৃষ্টিগোচর। আদিযুগের মহাজাগতিক শক্তি ও প্রভাবময়তার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে এখন আকাশের নায়ক আর কোন মহান-প্রজাপতি নন, অথবা সৃষ্টির দেবতাও নন, এমন কি শীতকালীন সূর্যের হত্যাকারী বন্য শিকারীটিও নন, এখন তিনি এক মানব—আমাদেরই একজন, তবে তাঁর ব্যক্তিত্ব মহত্তর। হিন্দু কল্পনা এখন এমন এক বিন্দুতে উপনীত, যেখানে মানুষের নিজেকে জয় করার চাইতে এই বিশ্বে আর কোন মহত্তম জিনিষের কথা ভাবাই যায় না। মানবসমাজে রাজকীয় নম্রতায়, পুরুষোচিত বিশ্বস্ততা ও সত্যপরায়ণতায় যুধিষ্ঠির ছিলেন প্রদীপ্ত; এমন কি এখনও পর্যন্ত নক্ষত্রদের মধ্যেও দেদীপ্যমান। যা কিছুই তাঁর কাছে আসুক না কেন, প্রথমে তিনি তাকে ত্যাগ করেছেন, এবং চূড়ান্ত পর্যায়েও তিনি শুধু নিজের সর্তের সঙ্গে খাপ খাইয়েই গ্রহণ করেছেন। পুরুষোচিত পুরুষের কাছে ভারতীয় জনসাধারণের এই দাবীই শিক্ষা দিয়েছে বৌদ্ধধর্ম, তবে এর সঙ্গে আরো যোগ করে নিয়েছে চারিত্রিক সমুন্নতি ও নিরাসক্ততা। মহত্তম জিনিস হচ্ছে সন্ন্যাসীর ত্যাগ, কিন্তু তার পরেই যার স্থান তা হ'ল জীবন ও বিশ্বকে দাসের মত মনোভাব নিয়ে না দেখে প্রভুর মতো মনোভাব নিয়ে দেখা: বলা যেতে পারে একই মহত্বের সেটা ভিন্ন আর এক অভিব্যক্তি।

চরিত্র পরিকল্পনা ও ঘটনাপ্রবাহের সূক্ষ্মতা সমেত যুধিষ্ঠিরের কাহিনী সুর ও ধরতাইয়ের দিক থেকে বিশেষ ভাবেই আধুনিক—একথা অস্বীকার করা যায় না। বিশ্বস্ততার এই বিশেষ যে ধারণাটিকে এই কাহিনী মূর্ত করে তুলেছে তা একান্তভাবেই ভারতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের কাছে বিশ্বস্ততা শুধুমাত্র সামরিক অথবা রাজনৈতিক

গুণ বলে বিবেচিত না হয়ে একটা সামাজিক গুণ হিসাবে বিবেচিত হয় এবং তাকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করা যায়। যে গুণটিকে যুধিষ্ঠিরের এই কাহিনী মূর্ত করে তুলছে ও ভূয়সী প্রশংসায় বিভূষিত করছে—অংশত কাহিনীটি তার জাতক, অংশতঃ কাহিনীটি তার জনকও বটে। (কেননা, এই মান জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই মহাকাব্যে স্থান পেয়েছিল। সংগীত, কথকতা ও নাটকের মধ্য দিয়ে বিগত পনেরোটি শতাব্দী ধরে প্রতি গ্রামে গ্রামে মহাকাব্য এই শিক্ষাটি দিয়ে এসেছে বলে এটি ভারতীয় চরিত্রকে অতিরিক্ত প্রেরণার যোগান দিয়ে গড়ে-পিটে নিয়েছে এবং মহত্বের যে রূপটি এতে প্রশংসিত হয়েছে তাকে জনপ্রিয় ও বোধগম্য করে তুলেছে। গ্রীক পুরাণ কাহিনীকে যদি স্বাধীনভাবে বিকশিত হতে দেওয়া হ'ত তাহলে কি তা ভারতীয়দের মতো নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠ্‌ত ?) বস্তুতঃ স্বাভাবিক ও নিখুঁত ঠিকানাপ্রাপ্ত সুপ্রাচীন শ্রেষ্ঠ সভ্যতা—বৃত্তের একমাত্র অবশিষ্ট সদস্য বলে কি ভারতকে গণ্য করা যায় ? না কি, আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে যে, হেলেনীক প্রতিভায় সৌন্দর্যের আদর্শ ও সচেতন প্রচেষ্টাকে ছাপিয়ে যে কাব্যিক প্রভাব এসেছিল, তাই ভারতীয় উচ্চমানের নৈতিক ব্যাখ্যায় পরিণতি লাভ করল ? মানুষের মহত্তম শক্তিকে উৎপাদনে নিয়োজিত রাখতে গিয়ে কাব্যে একটা বিশেষ সৌরভ না থেকেই পারে না ; কিন্তু ভারতীয়দের ক্ষেত্রে মনে হয় সেটা সর্বদাই অজ্ঞাতসারে এসেছে। অর্থাৎ চিন্তার সৌন্দর্য ও তাৎপর্যের এই মহত্ব আমরা ভারতীয়দের মধ্যে, অপরপক্ষে গ্রীকদের মধ্যে আমরা সৌন্দর্যকে শেষ পরিণতি হিসাবে ধরে নিয়ে একটা চরম শিল্পোৎকর্ষের আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি বিশেষভাবে।
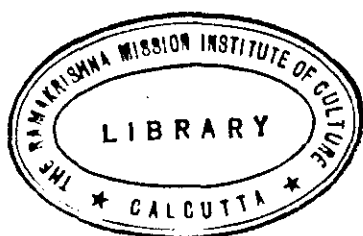
বুদ্ধ ও যশোধরা
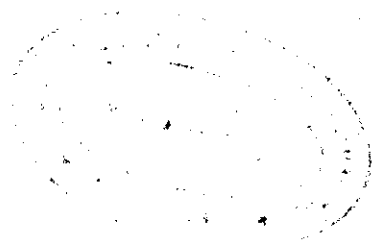
বুদ্ধ এবং যশোধরা

উত্তর ভারতের এক সুদূর প্রান্তে প্রাচীন রাজধানী কপিলাবস্তুর অবস্থান ছিল। সেখানে পঁচিশ শতাব্দীরও আগে একদিন তরুণ রাজপুত্র গৌতমের জন্ম উপলক্ষে নগরী ও রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে আনন্দ কল্লোল দেখা দিল। যে ভৃত্যেরা এই সুখবরটি বয়ে আনল, রাজা তাঁর রীতি অনুযায়ী সুন্দর সুন্দর উপহার দিলেন তাঁদের। যে কেউ যে কোন কাজই করে থাকুক, যত তুচ্ছই হোক না সে কাজ, তাদের সকলকেও এরকম উপহার দেওয়া হ'ল। এখন রাজা উৎকণ্ঠিত হয়ে একটি গর্ভগৃহে বসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। সে সময় এদিকে কয়েকজন জ্ঞানী, বইপত্র, কাগজ এবং বিচিত্র সব যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে লাগলেন।

আপনি কি প্রশ্ন করবেন তাঁরা কি কাজ করছিলেন? ভারী মজার জিনিস সেটা। তাঁরা এই শিশুটির জন্মমুহূর্তে নক্ষত্রদের অবস্থান বিচার করছিলেন এবং তা থেকে শিশুটির ভবিষ্যৎ জীবনের কাহিনীটি পাঠ করছিলেন। শুনতে যতো বিচিত্রই লাগুক না কেন, ভারতের এটি একটি অতি প্রাচীন প্রথা, আজকের দিনেও সেটি বিশ্বস্তভাবে এসে পৌঁছিয়েছে। এই তারকা-ভবিষ্যদ্বাণীকে বলা হয় ব্যক্তি বিশেষের কোষ্ঠী। আমার এমন কয়েকজন হিন্দুর কথা জানা আছে যাঁদের কাছে তেরো শতাব্দী আগেকার তাঁদের পূর্বপুরুষদের নাম ও কোষ্ঠী রয়েছে!

তরুণ রাজপুত্রের কোষ্ঠী বিচার করতে কপিলাবস্তুর এই জ্ঞানীদের অনেক সময় লেগেছিল, কেননা যে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনার কথা তাঁরা কোষ্ঠীতে পাঠ করলেন তা এতোই অসাধারণ যে, কোনরকম ভুল হবার সম্ভাবনা যাতে না থাকে এবং তাঁরা সকলে একযোগে সুনিশ্চিতভাবে একমত হবার পর তবেই তাঁরা সেই ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করবেন। অবশেষে রাজার সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁরা।

রাজা উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি ব্যাপার? শিশুটি বাঁচবে তো?" জ্যোতিষীদের মধ্যে যিনি প্রবীনতম তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মহারাজা, সে বাঁচবে।"

রাজা বললেন—"আঃ, তা হলেই ভালো।"

কেননা এবার তাহলে অবশিষ্ট কথাগুলো তিনি ধৈর্য ধরে শুনতে পারবেন। বক্তব্যের সূত্রটি ধরে পণ্ডিত আবার বললেন—"সে বাঁচবে, তবে এই কোষ্ঠী যদি সঠিক হয়, তাহলে আজ থেকে সাতদিন পর শিশুর জননী রাণী মায়া দেবী মারা যাবেন। আর তা থেকেই নির্দিষ্ট হবে, হে মহারাজ, আপনার পুত্র হয় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নৃপতি হবে, নতুবা সে এ পৃথিবীর মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে বিচলিত হয়ে পৃথিবী ত্যাগ করতে উদ্যত হবে এবং একজন বিরাট ও মহান ধর্মগুরু হবে।" একথা বলে তিনি রাজাকে সব কাগজ পত্র দিয়ে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে প্রস্থান করলেন।

"রাণী মারা যাবেন—একজন শ্রেষ্ঠ রাজা অথবা এক ধর্মগুরু—"এই শব্দকটি রাজার কানে বারংবার ধ্বনিত হতে থাকল। একাকী উপবিষ্ট নৃপতি এখন এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথাই চিন্তা করছেন। যে ভয়ংকর ঘটনাকে দিকচিহ্ন হিসাবে নিতে হবে, সেই ঘটনার চিন্তা তাঁর কাছে ততটা ভয়ংকর মনে হচ্ছিল না, যতটা মনে হচ্ছিল শেষ শব্দকটি "একজন ধর্মগুরু" যে ছবিটা তাঁর চোখের সামনে তুলে ধরছে সেটিকে। কেননা তাঁর কাছে ধর্মগুরু আর ভিখারী প্রায় সমার্থক। রাজা শিউরে উঠলেন। কিন্তু একটা কথার উপর আবার থমকে দাঁড়ালেন। শব্দগুলো ছিল—"মানুষের দুঃখদুর্দশা দেখে বিচলিত হয়ে সে বিশ্ব ত্যাগ করবে!" দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে রাজা বললেন—"আমার পুত্র কোনদিনও মানুষের দুঃখদুর্দশার কথা জানবে না।" তাঁর মনে হল এভাবে তিনি পুত্রকে শক্তিশালী বিজয়ী সম্রাটের যে বিকল্প ভাগ্য সেদিকেই চালিত করতে পারবেন।

সপ্তম দিনে রাণী মায়াদেবীর আত্মা দেহ ছেড়ে গেল, ঠিক যেমনটি বলেছিলেন জ্যোতিষীরা। শেষ সপ্তাহটিতে তাঁর জন্য সম্ভাব্য সকল রকম সেবা শুশ্রূষা ও যত্নের ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু তাতেও কোন লাভ হ'ল না। পূর্ব ঘোষিত দিনেই তিনি একটি সুখী শিশুর মতো নিদ্রার কোলে ঢলে পড়লেন, আর জাগলেন না।

এখন রাজা শুদ্ধোধনের শোকের সঙ্গে যুক্ত হল একটা উৎকণ্ঠার অনুভূতি। কেননা এখন তিনি নিশ্চিত জেনেছেন যে জ্যোতিষীরা সত্যি কথাই বলেছেন এবং তিনিও তাঁর সন্তানকে ভিখারীর ভাগ্য থেকে বাঁচাবার জন্য বদ্ধপরিকর। বিশেষত এর পরিবর্তে যখন সে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী ও সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজা হয়ে উঠতে পারে।

বালকটি যতো বড়ো হয়ে উঠতে লাগল, তার আশেপাশের সকলে সহজেই বিশ্বাস করতে সুরু করল যে বাস্তবিকই ওর জন্য কোন বিস্ময়কর সৌভাগ্য ভবিষ্যতের জঠরে সঞ্চিত রয়েছে। সে এতো উজ্জ্বল, কৌতুকময় ছিল, বইপত্র বা খেলাধুলায় এতো চালাকচতুর ছিল, সর্বোপরি সে শুধু একটি শব্দ বা দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে এতো মমতা ও ভালোবাসা দিতে পারতো যে তার কাছাকাছি সকলেই তার একান্ত ভক্ত হয়ে উঠল, তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। তারা সকলে সর্বদা বলতো—সে "করুণাময়।" ডানা ভাঙা কোন পাখীকে সে অসীম যত্নে সেবাশুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলতো; সে নিজে কখনো কপিলাবস্তুর অভিজাত সম্প্রদায়ের অন্যান্য তরুণ বন্ধুদের মতো শুধু খেলার জন্য তীর ধনুক দিয়ে অবোলা জীবদের হত্যা করতে পারতো না। তার কাছে এসব কাজ পুরুষোচিত নয়। সে বলতো ছোট্ট ভ্রাতাদের দুঃখ ও কষ্ট দিয়ে উল্লাস করার মধ্যে কোন পৌরুষ নেই। সুতরাং শরাঘাতে আহত কারো যন্ত্রণা সম্পর্কে সে অবহিত ছিল, কিন্তু অন্য কোন দুর্দশার কথা সে কোনদিনও শোনেনি। তার বাড়ী হচ্ছে রাজপ্রাসাদ। সে প্রাসাদের চারদিক ঘিরে রয়েছে বাগান। সেই বাগান আবার গিয়ে পড়েছে একটা কুঞ্জবনে, এই প্রাসাদ চারদিক থেকেই রাজধানী থেকে বেশ কিছু

মাইল উত্তর দিকে। বালক বয়সে এই সীমার বাইরে সে কখনো যায় নি। এখানেই সে অশ্বারোহণ ও ধনুর্বিদ্যা অভ্যাস করতে পারতো, পর্যবেক্ষণ করতে করতে ভাবতে ভাবতে ও স্বপ্ন দেখতে পারতো।

এখানে কোন দুঃখ নেই অথবা এমন কেউ নেই যে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলবে এমন একজনের উদ্দেশ্যে যে নিজে কখনো কোন দুঃখকষ্টের কথা জানেনা এখনও পর্যন্ত। জায়গাটা যেন নিজেই একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজত্ব। সে কখনো এই সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করেনি। এবং তার পিতার নিষেধ ছিল কেউ কখনো যাতে তাঁর পুত্রের কানে কোন দুঃখ কষ্ট বা মৃত্যুর কথা না তোলে। সে তাই জানতেও পারেনি কখনো এমন জিনিসের অস্তিত্বের কথা। কেননা শুদ্ধোধন সর্বদা এই শব্দকটি স্মরণে রাখতেন—"মানুষের দুঃখকষ্টে বিচলিত হয়ে—" এবং তিনি সর্বদা এই সব দুঃখকষ্টের থেকে পুত্রকে রক্ষা করতে চাইতেন।

ভারতীয় যুবকদের শিক্ষাকাল ত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত। তারপর মানুষ স্বাধীন হয়। এবার তরুণ গৌতমের বয়েস যখন ত্রিশের কাছাকাছি হ'ল, হয়তো, ইচ্ছে করলে তিনি তাঁর দেশ ছেড়ে অন্য দেশে যেতেও চাইতে পারতেন। কেউই তখন তাঁকে বাধা দিতে পারতো না—এমন কি স্বয়ং রাজাও না,—কেননা তখন তিনি প্রাপ্তবয়স্ক। তাই, এই বিন্দুতে পৌঁছে তাঁরা তাঁকে যেন গোলাপ ফুলের জাল বিছিয়ে ধরে রাখতে চাইলেন। তাঁরা ইঙ্গিত দিলেন যে এখন তাঁর বিয়ে করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার সময় এসেছে। তাঁরা সকলেই এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন যে এটা এখন খালি সময়ের প্রশ্ন। তাঁর যদি একজন স্ত্রী থাকেন ও সন্তানাদি হয় যাঁদের তিনি ভালোবাসবেন—যাঁরা তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকবেন, তাহলে তিনি আনন্দ ও কাজকর্মের চাপে এমন-ভাবে জড়িয়ে পড়বেন যে তিনি আর কখনো ঘর ছেড়ে যেতে পারবেন না ; সন্তানদের জন্যই তিনি দিনে দিনে অধিকতর বিত্তশালী হয়ে উঠতে চাইবেন—যতদিন না তাঁর জন্মকালের পণ্ডিতদের কথা অনুসারে তিনি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও বিত্তশালী নৃপতি না হয়ে উঠতে পারেন।

কিন্তু গৌতম একটা জিনিসের উপর খুব জোর দিয়েছিলেন। তিনি নিজে দেখে পাত্রী নির্বাচন করবেন, সুতরাং সে সকল তরুণ অভিজাত বংশোদ্ভবদের বোন ছিল, তাঁরা সকলেই স্ব-ভগ্নী রাজদরবারে সপ্তাহকাল যাপন করবার জন্য আমন্ত্রিত হলেন। রোজ সকালে সেখানে নানা রকম বুদ্ধির খেলা, গদা ঘূর্ণন, অসি-ক্রীড়া অথবা অশ্বারোহণ হত। সন্ধ্যাবেলা রাজকীয় নাট্যমঞ্চে নাটক, সাপখেলা অথবা ভোজবাজি প্রদর্শিত হ'ত এবং সকলে মিলে একযোগে এইসব প্রমোদ উপভোগ করা হ'ত।

এঁদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলেন, রাজা, তাঁর মন্ত্রীগণ ও এমনকি অতিথিরা পর্যন্ত আশা করেছিলেন যে তাঁকেই রাজপুত্র মনোনীত করবেন, কেন না অন্যদের তুলনায় তাঁর সৌন্দর্য, গুণ ও বংশমর্যাদা অনেক বেশি ছিল। তাঁর নাম ছিল যশোধরা।

কিন্তু শেষের দিনটি যখন এল, গৌতম দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁর সকল অতিথিকে

বিদায় সম্ভাষণ জানালেন, মহিলাদের প্রত্যেককেই এই সাক্ষাৎকারের স্মারকচিহ্ন হিসাবে চমৎকার সব উপহার দিতে লাগলেন—যেমন—কাউকে দিলেন একটা নেকলেস, কাউকে ব্রেসলেট, তৃতীয়া কাউকে কোন সুন্দর রত্ন, তখন যশোধরার জন্য কিছুই রাখলেন না, শুধু তাঁর নিজের পোষাক থেকে একটি ফুল খুলে দিলেন তাঁকে। তাঁর এই অবহেলা দেখে এই ঘটনার দর্শকরা মনে করলেন তিনি নিশ্চয়ই অন্য কাউকে পছন্দ করেছেন। শুধু কুমারী কন্যাটি নিজে ছাড়া আর সকলেই খুব দুঃখিত হলেন। তাঁর কাছে কিন্তু তাঁর সখীদের সব বহুমূল্য রত্নের চাইতেও অনেক দামী মনে হয়েছিল এই কুসুমটিকে। পরের দিন যখন কপিলাবস্তুর রাজা নিজে তাঁর পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুত্রের সঙ্গে এই কন্যার বিবাহ দিতে চাইলেন তখন কিন্তু তিনি একটুও বিস্মিত হ'ননি। এই গোটা ব্যাপারটা এতো সহজ ও স্বাভাবিক হ'ল এটাই শুধু অদ্ভুত লাগল। সম্ভবতঃ তখনই তিনি অর্ধ-সচেতন হয়ে উঠেছিলেন বিগত জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধে—যে সব জন্মে সর্বদাই তিনি ছিলেন গৌতমেরই স্ত্রী।

কিন্তু যশোধরার আরো অনেক পাণিপ্রার্থী ছিলেন। সম্মানের খাতিরেই অন্যান্য যাঁরা তাঁর করকমলের প্রত্যাশী হয়েছিলেন—তাঁদের মধ্যে গৌতমের নিজেকে যোগ্যতম প্রতিপন্ন করার দায় ছিল। রাজকীয় বংশের এটাই ছিল প্রথা। যশোধরার পিতাও এই শর্তাধীনে গৌতমের প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করলেন।

এই প্রত্যুত্তরে গৌতম খুব আনন্দিত হলেন; নির্দিষ্ট দিনে তিনি অন্য সকল প্রার্থীকে নিজের সঙ্গে নাম তালিকাভুক্ত করতে আহ্বান জানালেন। তাঁর আত্মীয়স্বজনেরা বললেন "হায়, যে তুমি সর্বদাই উড়ন্ত পাখী বা পলায়নপর মৃগদের দিকে লক্ষ্যস্থির করতে নারাজ ছিলে, সে তুমি কেমন করে চক্রের মধ্যে ঘূর্ণ্যমান শূকরকে নিশানা করে আহত করবে! ধনুকের অথবা সেরা তীরন্দাজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তুমি বিশাল সেই ধনুকের গুণই বা কেমন করে টেনে ধরবে?" কিন্তু তিনি মৃদু হাসি ছাড়া এসব কথার কোন জবাব দিলেন না। ভয় কি জিনিস—তাঁর সেকথা ছিল অজানা, নিজের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন বিরাট শক্তির উৎস। নির্ধারিত মুহূর্ত এলে তাঁর আত্মবিশ্বাসের যাথার্থ্য প্রমাণিত হল। কেননা সবকটি পুরস্কার বিজয়ী হয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের সকলকেই অনেক পিছনে ফেলে দিলেন।

সুতরাং, যথাসময়ে যশোধরার সঙ্গে রাজপুত্র গৌতমের বিয়ের দিন এগিয়ে এল।

তাঁদের ভবিষ্যৎ নীড় ছিল পুরোনটির চাইতেও আরো বেশি সুন্দর। গায় রঙের কাঠ খোদাই আর রক্তগোলাপরাঙা পাথরের বিরাট বিরাট খিলানে তৈরী নতুন প্রাসাদের চারপাশে সরোবর। বাগানের এক প্রান্তে ফোয়ারা ঘিরেছে এক শ্বেত মর্মরের দ্বীপকে—তার উপর রয়েছে, এক প্রস্থ শীতল শুভ্র গ্রীষ্মকালীন প্রকোষ্ঠ, নদীর গর্ভে লুক্কায়িত রয়েছে অসংখ্য ঝর্ণা, যেগুলো ইচ্ছেমাত্র গ্রীষ্মাবাসটিকে জলনিঃস্রাবী কলের মাধ্যমে শীতল করে রাখতে পারে। জানালার জায়গাগুলো ভরাট করা হয়েছিল কারুকার্যখচিত

কাঠ অথবা জাফরী কাটা মর্মর দিয়ে—ফলে—সেখানে সর্বদাই ছিল, আলো-ছায়াও একান্ত বাসের গোপনতা—অথচ সেইসঙ্গেই ফলফুলে শোভিত পুষ্পবীথি সমাকীর্ণ বিস্তারিত প্রান্তর অবলোকন করা যেত অতি স্বাচ্ছন্দ্য সহকারেই। রাজকীয় প্রকোষ্ঠ গুলোর প্রতিটির এক্‌এক কোনে বিরাট বিরাট শিকল দিয়ে ছাদের কড়িবড়গা থেকে ঝোলানো ছিল দুজনের উপযোগী দোলনা জাতীয় জিনিস। সেই দোলনার তিনদিক ছিল বিশাল গদি মোড়া। উষ্ণ দিনগুলোতে এখানে ইচ্ছে করলে কেউ দোল খেতে খেতে আন্দোলিত বাতাসের শীতল স্পর্শে অনুভব করতো অথবা অলসভাবে বিশ্রাম নিতে পারতো—সে সময়ে পরিচারিকা অথবা পরিচারকেরা পাখা বীজন করতো। সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের আশেপাশে যাঁরা ঘিরে থাকবেন সেইসব মহিলা ও সম্ভ্রান্ত লোকেদের নির্বাচন করতেন একজন মন্ত্রী অতি সযত্নে। সেই বাছাই করা হত সুন্দর চেহারাও প্রাণচঞ্চল প্রকৃতি দেখে দেখে।

রাজপুত্রের কর্ণকুহরে কোনদিন কোন আর্তনাদ বা অশ্রুজলের খবর পৌছোবেনা। তিনি যেন কোন অসুস্থতা অথবা ক্ষয় কোনরূপেই দেখতে না পান। কোন কারণে তিনি নগরী পরিদর্শনে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র তাঁকে এই ইচ্ছা থেকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'ত নূতনতর কোন প্রমোদ বা আনন্দ উৎসবে। এমনই ছিল রাজার কঠোর আদেশ।

কিন্তু নিয়তির লিখন কেউই উল্টাতে পারে না। যে সংকল্পকে ব্যর্থ করতে তিনি এত প্রচেষ্টা চালালেন সঠিক মুহূর্তটি এলে সেই সংকল্পকেই যে এসব আরো জোরদার করে তুলবে এ সত্যের আভাসটুকু রাজা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি। তাঁর পুত্র যে রাজ্যে বিচরণ করছিলেন তা কিন্তু জীবন নয়, তা একটা স্বপ্ন বা নাটক মাত্র। যে কোন মিথ্যার চাইতেই সত্য শ্রেয়ঃতর—আজই হোক বা কালই হোক রাজপুত্রের মধ্যে বাস্তবের তৃষ্ণা জাগরুক হতে বাধ্য।

সত্যিই তা ঘটল। গৌতম একদিন তার রথ আনতে হুকুম দিলেন, সারথিকে বললেন প্রাচীরের বাইরে যে নগরী—তাঁর ভবিষ্যৎ রাজ্যের রাজধানী নিজের শহর কপিলাবস্তুর মধ্য দিয়ে রথ চালিয়ে নিয়ে যেতে। বিস্মিত সারথি আদেশ পালন করলেন। প্রত্যাখ্যান করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। তবুও তিনি এই ভেবে ভীত হলেন যে রাজা যখন জানতে পারবেন তখন না জানি কত ক্রুদ্ধ হবেন।

তাঁরা কপিলাবস্তুর মধ্যে প্রবেশ করলেন, সেইদিনই জীবনে প্রথমবার গৌতম জানতে পেলেন জীবন বস্তুতঃ কি রকম। কর্মব্যস্ত রাস্তার ধারে ধারে তিনি ক্রীড়ারত শিশুদের দেখলেন। রাজার নামে সারি সারি খোলা দোকানে বসে আছেন বণিকবৃন্দ, তাঁদের সামনে জিনিষপত্র যা রয়েছে তাই দিয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে চলেছে দরকষাকষি। নিজের নিজের দোকানে দর্জি, কুমোর ও পিতলের শিল্পীরা পা মুড়ে বসে কঠোর শ্রমে রত, মেটে মেঝেতে লুক্কায়িত হাপরের দড়ি ধরে টানছে কোন সহশিল্পী, যাতে আগুন জোরালো হয়ে উঠে ধাতুকে গলিয়ে দেয় অথবা কুমোরের

চাককে প্রয়োজন মত ঘোরানো যায়। বোঝা নিয়ে ক্লান্ত দর্শন মুটেরা ব্যস্তভাবে উপর নীচ করছে। এখানে ওখানে কোথাও কোন সন্ন্যাসী তাঁর আলখাল্লা চেপে ধরে ভস্মের সাদা রং চকমকিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছেন। খেতে না পাওয়া কুকুরগুলো একটুকুরো খাবার নিয়ে কাড়াকাড়ি করে ঝগড়া করছে, গ্রামাঞ্চল থেকে ফল, শস্য ও বস্ত্রাদি বয়ে আসা গরুর গাড়ীর সামনে পড়ে গেলেও এমন কি নড়তে চাইছে না।

পথে রমণীর সংখ্যা অতি অল্প, যাঁরা রয়েছেন তাঁরাও তরুণী জন, কেন না বেলা গড়িয়ে তখন প্রায় দুপুর, প্রাতঃস্নানের সময় পেরিয়ে গেছে। তবুও কখনো সখনো ঘোমটা টেনে বিরাট পিতলের কলসী মাথায় বাড়ীতে জল নিয়ে যাচ্ছে কোন বালিকা।

এতৎসত্ত্বেও কিন্তু রাস্তাঘাটে রঙের অভাব ছিল না, কেন না প্রাচ্যের মানুষের পোষাকের অংশ বিশেষ হচ্ছে শাল, অথবা চাদর-পশম অথবা রেশমে বোনা অত্যন্ত উজ্জ্বল যার রং সেই চাদর বাঁ কাঁধের উপর ফেলা থাকে, এবং ঘুরিয়ে আনা হয় দক্ষিণ বাহুর নীচ দিয়ে। তাই, নগরীর রাজপথে কোন রমণীর নূপুরের নিক্কণ না থাকলেও ফিকে সবুজ, গোলাপী, লাল, হলুদ, গায় নীলের ছড়াছড়ি ছিল, পথচারী জনতা ছিল নয়ন লোভন। গৌতম তাঁর সারথির দিকে ফিরে বললেন—"এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি শ্রম, দারিদ্র্য ও ক্ষুধা,—অথচ তার সঙ্গে মিশে রয়েছে এতো সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ—নিশ্চয়ই এসবের অস্তিত্ব সত্ত্বেও জীবন খুব মধুর।"

তিনি গভীর চিন্তান্বিত হয়ে কথা বলছিলেন অনেকটা যেন স্বগতঃ ভংগীতে। এসব কথা বলতে বলতেই জরা-ব্যাধি ও মৃত্যু—মানুষের এই তিন দুঃখ তাঁর কাছে এসে পৌছল। রাজপুত্র গৌতমের জীবনে পরম মুহূর্তটি সমাগত।

প্রথমে এল জরা। এটি এল একটি অতি বৃদ্ধের রূপ ধরে—মাথায় তার টাক, দন্তহীন মাড়ি ও কম্পমান তাঁর হাত। তাঁর অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তি হীন চোখ দুটিতে নেই কোন আলো; তাঁর শ্রবণে নেই কোন শ্রুতি। জরা যেন তাঁকে মানুষের কবর বানিয়ে ফেলেছে। একটা লাঠিতে ভর দিয়ে তিনি লোলচর্ম একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন ভিক্ষার আশায়।

রাজপুত্র সামনে ঝুঁকে সাগ্রহে তাঁকে ভিক্ষা দিলেন—বৃদ্ধ যা চাইবার কথা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন নি—তার চাইতেও অনেক বেশি। রাজপুত্রের মনে হল তাঁর আত্মাই তলিয়ে যাচ্ছে। তিনি সারথির উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বললেন—"ওঃ ছন্দক! এ কি! এ কি! কিসের জন্য এঁর এত যন্ত্রনা?"

সান্ত্বনা দিয়ে ছন্দক বললেন—"না এ কিছু নয়। লোকটা বড্ডো বুড়ো হয়ে গেছে এই যা।" "বুড়ো?" গৌতম অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন—তাঁর মনে পড়ল তাঁর পিতা ও অন্যান্য মন্ত্রী প্রমুখদের পাকা চুলের কথা। "কিন্তু সব বুড়ো লোকেরা তো এ রকম হয় না?"

সারথি প্রত্যুত্তরে বললেন, "হ্যাঁ, যদি তাঁরা শুধু যথেষ্ট বুড়োই হন।"

রাজপুত্র বলে উঠলেন—"আমার বাবা?" তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছিল। "আমার পিতা? যশোধরা! এখানের আমরা?" গম্ভীরভাবে সারথি জবাব দিলেন। "সব মানুষকেই বুড়ো হতে হয়, আর যদি এই বৃদ্ধ বয়স অনেক দূর অবধি যায় তাহলে তার সমাপ্তিও সর্বদাই এরকম হবে।"

আতংক ও করুণায় আভিভূত গৌতম নির্বাক হয়ে রইলেন। অবশ্য শুধু মুহূর্ত খানেকের জন্যই মাত্র। কেননা একটু বাদেই রথের পাশে এসে দাঁড়াল এমন একজন যার সারা গায়ের চামড়া ফিকে গোলাপী ছোপে ভরে গেছে—ভয়ংকর সেই দৃশ্য; তার প্রসারিত হাতে আবার অনেকগুলি গ্রন্থি খসে পড়েছে। আমাদের মধ্যে অনেকেই এমন দৃশ্য দেখলে চোখে হাত চাপা দিয়ে দ্রুত বেগে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যেতাম। কিন্তু রাজপুত্রের মনোভাব এমনটি ছিলনা। তিনি সহানুভূতি ও শ্রদ্ধায় আপ্লুত আবেগ সমৃদ্ধ কণ্ঠে "ভাই আমার" বলে তাকে একটি মুদ্রা দিলেন।

গৌতমের কণ্ঠস্বরের মৃদুতা ও নম্রতায় বিস্মিত লোকটি চমকে তাঁর দিকে চাইতেই ছন্দক বললেন—"এটি এক কুষ্ঠরোগী—চলুন আমরা এগিয়ে যাই।"

গৌতম বললেন "সে আবার কি ছন্দক?" "মহাশয়—এ হচ্ছে এমন এক ব্যক্তি যে ব্যাধিগ্রস্থ হয়েছে।"

রাজপুত্র প্রশ্ন করলেন—"ব্যাধি? ব্যাধি জিনিসটা কি?"

"মহাশয়, এটা হচ্ছে এমন একটা অশুভ যা দেহকে আক্রমণ করে, কেউই জানেনা কেমন করে বা কেন এটা হয়। এতে স্বাচ্ছন্দ্য নষ্ট হয়ে যায়। এর দরুণ প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মানুষ শীতবোধ করে অথবা পর্বতশিখরে তুষারের মধ্যে বসেও গরমে ঘামতে থাকে। এর প্রভাবে কেউবা পাথরের মতো ঘুমোতে থাকে, কেউবা উত্তেজনায় উম্মাদ হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে আস্তে আস্তে গোটা দেহই টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে থাকে। আবার কারো দেহে এটি স্বরূপ বজায় রেখেও এমনভাবে শুকিয়ে দেয় দেহকে যে শুধু অস্থিগুলোই পরিদৃশ্যমান হয়। কখনো বা আবার দেহ ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে ওঠে। ব্যাধি হচ্ছে এমনই। কেউই জানেনা কোথা থেকে এটি আসে, কোথায়ই বা এটি নিয়ে যায়; আর আমাদের কেউই জানেনা কখন এটি আমাদেরই আক্রমণ করে বসবে।"

গৌতম বললেন—"তাহলে এটিই জীবন—এই জীবনকেই আমি মধুর ভাবছিলাম?" পলকের জন্য তিনি নীরব হয়ে রইলেন। তারপর চোখ তুলে চাইলেন তিনি। জিজ্ঞাসা করলেন—"এই জীবন থেকে মানুষ ছাড়া পেতে পারে কি উপায়ে? মুক্তি এনে দেবে এমন বন্ধু কে আছে তার?"

ছন্দক বললেন—"মৃত্যু। ঐ দেখুন—শববাহকেরা আসছে একটি মৃতদেহ নিয়ে নদীর ধারে শবদাহ করবে বলে।"

রাজপুত্র চোখ তুলে দেখলেন চারজন বলিষ্ঠ দেহী মানুষ কাঁধে করে একটি নীচু খাটিয়া বয়ে আনছে—সেই শয্যায় শায়িত—আপাদমস্তক সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি

মনুষ্য অবয়ব। কিন্তু ঢাকার নীচে দেহটি একটুও নড়াচড় করছেনা। একজন হোঁচট খেলে শববাহকেরা প্রতি পদক্ষেপে চেঁচিয়ে উঠছেন—"বল হরি, হরি বোল"—কিন্তু যাকে তাঁরা বহন করছেন, তিনি কিন্তু প্রার্থনাসূচক কোন অভিব্যক্তিই দেখাচ্ছেন না।

সাগ্রহে সারথি বলে চল্লেন—"বাস্তবিক কি জানেন? মানুষ মৃত্যুকে ভালোবাসে না। মৃত্যুকে তারা বন্ধুও মনে করেনা, বরং জরা বা ব্যাধির চাইতেও মৃত্যুকে আরো নিকৃষ্ট কোন শত্রু বলে মনে করে। নিজেদের অজ্ঞাতসারেই মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেজন্য মানুষ একে ঘৃণা করে এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে ঠেকিয়ে রাখতে প্রয়াসী হয়।"

গৌতম তখন নিবিষ্টচিত্তে গম্ভীর মিছিলটি পর্যবেক্ষণ করলেন। তাঁর দিব্য চোখ খুলে গেল, তিনি দেখতে পেলেন মানুষ কি কারণে মৃত্যুকে ঘৃণা করে। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে যেন লম্বা এক সারি ছবি শোভাযাত্রা করে যেতে লাগল। তিনি দেখতে পেলেন যে নিকটবর্তী এই মৃত ব্যক্তি ইতিপূর্বে বহুবার মারা গিয়েছেন এবং সর্বদাই আবার জন্ম নিয়েছেন। তিনি দেখতে পেলেন যে এখন ইনি মৃত হলেও এই পৃথিবীতে নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসবেন। "যারা জন্মেছে মৃত্যু তাদের সুনিশ্চিত। যারা মারা গেছে—জন্মও তাদের সুনিশ্চিত।" তিনি বললেন—"ওহোঃ জীবনের এই চক্রে কোন সুরুও নেই, কোন শেষও নেই। ছন্দক বাড়ী নিয়ে চলো।"

আদেশ অনুসারে সারথি ফিরে চললেন, কিন্তু রাজপুত্র আর কোন প্রশ্ন করলেন না। চিন্তার অতলে তলিয়ে গিয়ে তিনি বসে রইলেন। তাঁরা যখন আবার প্রাসাদে পুনর্বার প্রবেশ করলেন, তখন অতীতে তাঁর কাছে যে সব জিনিস এতো সুন্দর বলে মনে হয়েছিল, সে সবই ঘৃণিত বোধ হতে লাগল। সত্য থেকে শিশুটিকে দূরে সরিয়ে রাখার খেলনা ছাড়া এই ঘাস ছাওয়া প্রান্তর, পুষ্প ভারাবনত বৃক্ষরাজি ও নর্তনশীল জলকে কি আর বলা যায়? কেননা সে যে কোন মুহূর্তে তাঁদের ধ্বংস করে দিতে পারে—এমন বিস্ফোরক উপাদান বিশিষ্ট আগ্নেয়গিরির মুখে তৈরী একটি উদ্যানে যশোধরা ও তাঁর নিজেকে ক্রীড়ারত বস্তু বলে মনে হতে লাগল তাঁর। এবং শুধু তাঁরাই বা কেন, অন্য সব নরনারীরাও তো এমনই, তবে তাঁদের তুলনায় অন্যদের যুক্তি বোধ কম বলে এই খেলা তাঁরা উপভোগ করতে পারছেন।

তাঁর হৃদয় তখন মানবজাতি এবং শুধু মানবজাতিই বা কেন, মানব ভাষা—হীন সমস্ত জীব ও প্রাণী, যাদের মধ্যে তিনি দেখেছেন ভালোবাসা ও যন্ত্রণা পাবার ক্ষমতা সকলের জন্যই অনুকম্পায় থর থর কম্পমান একটা বিরাট মহাসাগরের মতো হয়ে উঠল।

তিনি স্বগতঃ ভাবে বললেন—"জীবন ও মৃত্যু এক যোগে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন। কেমন করে এই স্বপ্নকে ভেঙ্গে আবার জেগে ওঠা যায়?"

সুতরাং, তাঁর জন্মকালে জ্ঞানী-ব্যাক্তিরা যেমনটি বলেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে মানবের ত্রিবিধ দুঃখ তাঁকে আঘাত করল—তিনি খেতে ঘুমোতো পারছিলেন না। মধ্য রাত্রি হয়ে এলে সমস্ত বাড়ী যখন নিদ্রামগ্ন, তখন তিনি উঠে তাঁর ঘরে পায়চারী

করতে লাগলেন। জাফরী কাটা একটা জানালা খুলে দিয়ে তিনি বাইরে রাতের দিকে চাইলেন। এমন সময় বৃক্ষশীর্ষ থেকে এক ঝলক হাওয়া বয়ে গেল, সমস্ত পৃথিবী যেন শিউরে উঠল। বস্তুতঃ সেটা ছিল মহাবিশ্বের মহান আত্মাদের কণ্ঠস্বর, তাঁরা বলছিলেন— "জাগো। তোমাদের জেগে উঠতে হবে। ওঠো, বিশ্বকে সাহায্য করো!" রাজপুত্রের আত্মা শব্দগুলোর ভাষান্তর না করেও নিঃসন্দেহে একথা শুনতে পেলেন, উপলব্ধিও করলেন। তারপর যখন তিনি আকাশের তারাদের দিকে চেয়ে চেয়ে নিজের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছেন জীবনের স্বপ্ন ভাঙ্গার পথ, যাতে করে মানুষ নিয়তির খেলার নাগালের বাইরে যেতে পারে। সেই সময় হঠাৎ খুঁজতে খুঁজতে তাঁর মনে পড়লো তাঁর স্বজাতির সুপ্রাচীন জ্ঞান ভাণ্ডারের কথা। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন। "কেন! এটাই নিশ্চয় সেই অন্বেষণ,যার আহ্বানে সাড়া দিয়ে মানুষ গৃহত্যাগ করে আপাদ মস্তক ভস্মাবৃত হয়ে অরণ্যে গিয়ে বাস করে। তাঁরা নিশ্চয়ই কিছু জানেন। সেটাই নিশ্চয় পথ। আমিও যাব সেই পথেই। কিন্তু তাঁরা কখনো তাঁদের জ্ঞানের কথা জানাতে ফিরে আসেন না। তাঁরা সেই প্রজ্ঞা নিজেদের মধ্যেই রেখে দেন ও শুধু জ্ঞানীদের সঙ্গেই আদান প্রদান করেন। আমি কিন্তু এ রহস্য যেদিন জানতে পারবো, ফিরে এসে সমগ্র মানবজাতিকে বলবো সেই কথা। সবচেয়ে নীচু যে সেও শুনবে সে কথা—যেমন ভাবে শুনবে মহত্তম জনও। মুক্তির পথ খোলা হবে সমগ্র বিশ্বের জন্যই।" এই কথাগুলো বলতে বলতে তিনি গবাক্ষ বন্ধ করে দিয়ে সন্তর্পণে পা টিপে টিপে এলেন নিদ্রিতা পত্নীর শয্যাপার্শ্বে। ধীরভাবে তিনি পর্দা সরিয়ে স্ত্রীর মুখের দিকে চাইলেন। সেই মুহূর্তে সুরু হ'ল তাঁর প্রথম সংগ্রাম। এঁকে ছেড়ে যাবার কোন অধিকার কি তাঁর আছে? তিনি তো কোন দিন নাও ফিরে আসতে পারেন। এক নারীকে বিধবা করে যাওয়া কি অত্যন্ত ভয়ংকর ও নির্মম কাজ নয়? তাঁর শিশু পুত্রটিও পিতার যত্ন ছাড়াই বড়ো হয়ে উঠবে। বিশ্বের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা খুবই ভালো, কিন্তু অন্যের জীবনকেও উৎসর্গ করার অধিকার কি কারো আছে?

তিনি পর্দা টেনে দিয়ে আবার জানালার কাছে ফিরে গেলেন। তখন আলো দেখা দিল। তাঁর মনে পড়লো তাঁর কাছে সর্বদাই যশোধরার আত্মাকে কতো বিরাট ও মহান মনে হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করলেন যে তিনি যা করতে যাচ্ছেন, তাতে যশোধরারও অংশ রয়েছে। তাঁর হারানো বেদনার জন্য তিনি এই উৎসর্গের অর্ধ ভাগ পাবেন, তাঁর গৌরব ও প্রজ্ঞার অর্ধভাগ তাঁর প্রাপ্য হবে।

তিনি আর ইতস্ততঃ করলেন না। আবার তিনি বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেলেন। রেশমী পর্দা টেনে দিয়ে আবার তিনি নীচে চাইলেন। স্ত্রীকে জাগাতে সাহস হ'ল না তাঁর তাই ঝুঁকে পড়ে তিনি তাঁর পদতল চুম্বন করলেন। নিদ্রার মধ্যে যশোধরা যন্ত্রণাধ্বনি করলেন, গৌতম সরে এলেন।

নীচে গিয়ে তিনি নিদ্রিত ছন্দককে কাঁধে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে তুলে বললেন চটপট ও নিঃশব্দে রথ নিয়ে আসতে। চুপিসারে তাঁরা বিরাট বিরাট দেউড়ি দিয়ে

পেরিয়ে গেলেন, রাজপথে উঠে অশ্ব দ্রুত বেগে চলতে লাগল—যতক্ষণ না রাজপুত্র তাঁর পিতৃগৃহ থেকে বহু বহু মাইল দূরে চলে গেলেন।

উষার আলো ফুটলে তিনি থেমে গিয়ে রথ থেকে অবতীর্ণ হলেন। তারপর একে একে তিনি রাজপুত্রের রাজবেশ ও মহার্ঘ্য রত্নরাজি খুলে ফেললেন—সেগুলোকে ছন্দকের হাতে তিনি ফেরৎ পাঠালেন উপহার হিসাবে ও স্নেহ-শুভেচ্ছার বাণীর সঙ্গে। তারপর তিনি ভিক্ষুকের পোষাক পরলেন—গেরুয়া বসন ও ভস্ম, তার সঙ্গে হাতে নিলেন দণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র। ছন্দক চোখের জলে ভাসতে ভাসতে অবলুণ্ঠিত হয়ে রইল। "আমার পিতাকে বোলো, আমি ফিরে আসবো।" এই সংক্ষিপ্ত বিদায়বাণী উচ্চারণ করে গৌতম পিছন দিয়ে অরণ্যের গভীরে প্রবেশ করার জন্য তৈরী হলেন।

রাজপুত্র চোখের আড়ালে চলে যাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্তও ছন্দক সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর আবেগাকুল শ্রদ্ধা সহকারে অবনত হয়ে রাজপুত্র যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন, সেই পথের ধুলো তুলে নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকিয়ে রাজার কাছে এই খবর পৌছে দেবার জন্য গৃহাভিমুখে রথ ঘুরিয়ে নিলেন।

দীর্ঘ সাত বছর ধরে অরণ্যে গৌতম তাঁর অন্বেষণ চালালেন। অবশেষে তারপর একদিন একটা বটগাছের নীচে বসে ধ্যান করতে করতে মধ্যরাত্রিতে তিনি আবিষ্কার করলেন সেই মহান রহস্য-সমগ্র জ্ঞান এল তাঁর আয়ত্তে। সেই সময় থেকে তাঁর অন্যান্য সব নাম খসে গিয়ে তিনি একটিমাত্র নামে পরিচিত হলেন—সেই নাম হচ্ছে বুদ্ধ অর্থাৎ আশীষপূত।

সর্বোত্তম জ্ঞানজ্যোতির সেই মুহূর্তে তিনি জানতে পেলেন যে সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূলে রয়েছে জীবন-তৃষ্ণা। এই আকাংক্ষার হাত থেকে ছাড়া পেলেই মানুষ মুক্তি পেতে পারে। এই মুক্তির নাম দিলেন তিনি নির্বাণ— এবং এর অভিমুখে সংগ্রামী জীবনকে তিনি আখ্যা দিলেন শান্তির পথ।

এই সমস্ত কিছু ঘটেছিল এখন বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত স্থানটিতে—অরণ্যে। সেখানে আজো পর্যন্ত একটা প্রাচীন মন্দির দাঁড়িয়ে আছে—তার পাশে একটা সুবিশাল বটগাছ—এটি সেই পবিত্র বৃক্ষের দ্বিতীয় উত্তরসুরী। বুদ্ধ সেখানে কয়েকদিন রয়ে গেলেন—বহু কিছু তাঁর ভেবে ঠিক করার ছিল। তারপর তিনি সেই অরণ্য পরিত্যাগ করে এলেন বারাণসীতে। সেখানে মৃগদাবে বসে পাঁচ শত সন্ন্যাসীর কাছে তিনি তাঁর প্রথম উপদেশ দিলেন। এই সময় থেকে তাঁর খ্যাতি চারপাশে ছড়িয়ে পড়ল এবং বহুলোক তাঁর শিষ্যত্ব নিয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে সুরু করলেন। কিন্তু কপিলাবস্তুর পথে যে দুজন বণিকের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়, তাঁদের হাত দিয়ে তিনি যশোধরা ও তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠালেন যে—তিনি সুনিশ্চিত—গৃহে আসছেন। অবশেষে তাঁর কাছ থেকে খবর পেয়ে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা হলেন। বৃদ্ধ রাজার ইচ্ছে ছিল তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা দেওয়া, কিন্তু যখন বেশ জনসমাগম হয়েছে, প্রবেশ পথের সামনে সেনাবাহিনী সাজানো হয়েছে,

পতাকা উড়ছে পতপত করে, অশ্বেরা হ্রেষাধ্বনি করছে, এমন সময় আপাদমস্তক গেরুয়া বসনে সজ্জিত এক ভিক্ষুক সমবেত জনতার মধ্যে এখানে ওখানে খাদ্য সংগ্রহ করতে করতে রাজার তাঁবুর কাছে এলেন। রাজা পরমবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন—এই ভিখারীই তাঁর সেই পুত্র যে সাত বছর আগে মধ্যরাতে বাড়ী ছেড়ে চলে গিয়েছিল, আজ সেই ফিরে এসেছে বুদ্ধ রূপে।

কিন্তু তাঁর নিজের ঘরে তাঁর স্ত্রী ও পুত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগে তিনি রাজপ্রাসাদের মধ্যে আর কোথাও থামলেন না। যশোধরাও পীতবসন পরিহিতা! সেই সকালে ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে তাঁর স্বামী এই পৃথিবী ছেড়ে অরণ্যে বাস করতে গিয়েছেন এই সংবাদ পাওয়া অবধি তিনি তাঁর স্বামীর জীবনের অংশভাক্ হবার জন্য যা যা করা সম্ভব তাই করেছেন। তিনি আহার করেছেন শুধু ফলমূল। কোন ছাদের নীচে, শুধু মেঝেতে অথবা বারান্দায় তিনি ঘুমিয়েছেন সর্বদাই। রাজকুমারীর বেশভূষা ও সকল অলংকার তিনি ছেড়ে ফেলেছেন।

এখন তিনি সশ্রদ্ধ ভাবে জানু পেতে বসে স্বামীর পোষাকের বাঁ ধারের কোনটি চুম্বন করলেন। তিনি যশোধরাকে আশীর্বাদ জানিয়ে চলে গেলেন। তখন সহসা যেন স্বপ্নোত্থিতা হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি ছেলেকে ডেকে বললেন—"যাও, তোমার পিতার কাছে তোমার উত্তরাধিকার যাচ্ঞা কর।

পূত বর্ণের পোশাক পরিহিত মুণ্ডিত মস্তক জনতার দিকে তাকিয়ে স্তিমিতভাবে বালক প্রশ্ন করলো—"মা, কোনজন আমার পিতা ?"

কিন্তু তিনি কোন বর্ণনা দিতে চাইলেন না। শুধু বললেন—"তোমার পিতা হচ্ছেন নিকটের এই সিংহ—যিনি দেউড়ি পেরিয়ে যাচ্ছেন।"

বালক সোজা তাঁর কাছে চলে গেল। সে বলল—"পিতা, আমাকে আমার পৈত্রিক সম্পদ দাও।" সে তিনবার চাইল এমনি করে, যতক্ষণ না মুখ্যশিষ্য আনন্দ প্রশ্ন করলেন—"আমি দেব কি ?" বুদ্ধ বললেন—"দাও।" বালকের প্রতি নিক্ষিপ্ত হ'ল গেরুয়া বসন।

তখন তাঁরা পিছন ফিরে দেখলেন—অবগুণ্ঠিতা বালকের জননী—স্পষ্টতঃই তিনি স্বামীর সঙ্গে থাকতে উদ্‌গ্রীব। সহৃদয় আনন্দ বললেন—"প্রভু! কোন স্ত্রীলোক কি অনুশাসনে প্রবেশ করতে পারেন না ? তিনি কি আমাদেরই একজন হতে পারেন না ?"

বুদ্ধ বললেন,—"কেন, পুরুষের মতোই কি নারীর কাছেও ত্রিবিধ দুঃখ আসে না ? শান্তির পথে তাঁদের পদচিহ্নই বা পড়বে না কেন ? আমার সত্য ও আমার অনুশাসন সকলের জন্যই। তবু, আনন্দ এই অনুরোধ তোমার দিক থেকেই আসা যথার্থ।"

তখন যশোধরাও অনুশাসনে গৃহীতা হলেন। তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে তাঁর উদ্যানে বসবাস করতে চলে গেলেন। এইভাবেই তাঁর সুদীর্ঘ বৈধব্যের পরিসমাপ্তি ঘটল এবং অবশেষে শান্তির পথে পড়ল তাঁরও পায়ের চিহ্ন।
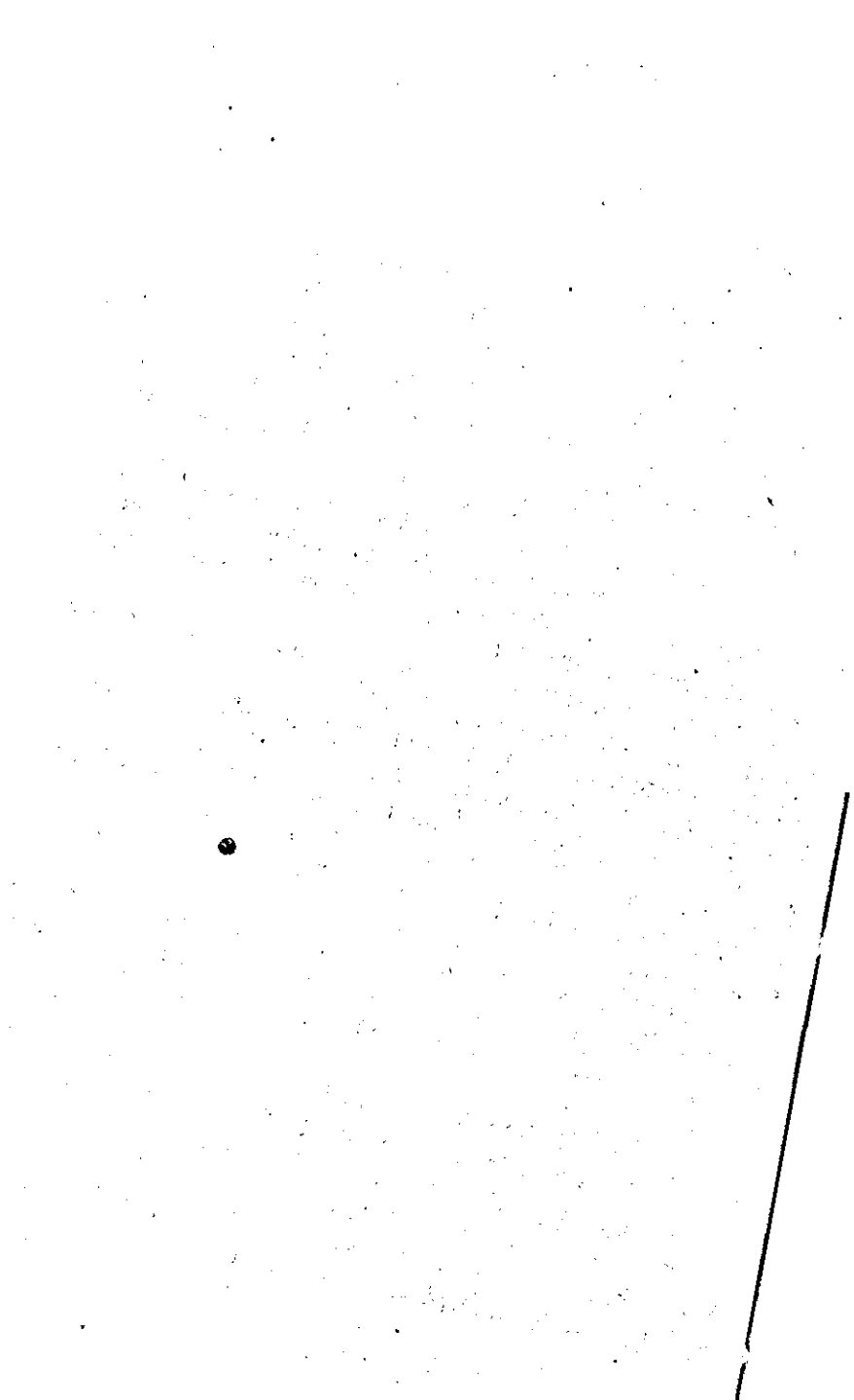
ভারতীয় ইতিহাসের পদধ্বনি

পদধ্বনি

হে মাতা, তোমার চরণধ্বনি
আমরা শুনতে পাই
অস্ফুটশব্দে, যুগে যুগান্তরে
ছুঁয়ে চলেছে ধরণীকে,
তোমার চরণঘাতে প্রস্ফুটিত পদ্ম
এই সব প্রাচীন নগরী,
প্রাচীন শাস্ত্র, কাব্য, মন্দির,
মহৎ সংগ্রাম, ন্যায়ের জন্য কঠিন দ্বন্দ্ব।

হে মাতা, তোমার চরণধ্বনি
কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের ?
তার পরিপূর্ণ অর্থ উপলব্ধি করতে দাও।
সরিয়ে দাও সৃষ্টির অন্ধ আবরণ,
দাও সেই মানবের মহত্তম ভাবনা
হে মাতা, তোমার চরণধ্বনি
কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের ?

হে মাতা, মুক্তিদাত্রী, তুমি এস।
আমরা তোমার সন্তান, তোমার স্নেহনির্ভর।
আমাদের হৃদয়ে পড়ুক তোমার চরণ,
আমরা যেন তোমারই।
হে মাতা, তোমার চরণধ্বনি
কোথায় নিয়ে চলেছে আমাদের ?

মানুষের স্থানগত ইতিহাস

যে কোন জাতির অবচেতন মনে লিখিত ইতিহাসই তার চরিত্র। সে চরিত্রকে বুঝতে গেলে আমাদের তার ওপরে ইতিহাসের আলোকপাত করতে হবে। তখন প্রতিটি বৈষম্যের কারণ বোঝা যাবে, দেখা যাবে, তার চরিত্র মূল কারণগুলির স্বচ্ছ, সঙ্গত ফল। এইভাবে, উদ্ভিদ্ ও পশুর মত মানুষের ক্ষেত্রেও ভৌগোলিক বিভাগগুলি সব কিছু বুঝিয়ে দেয়। একটা দেশের মানচিত্র হল, তার পূর্বতন সব যুগের ছবি। অতীতের যে সব সুন্দর মানচিত্রে দেখা যায়, নদীগুলি সভ্যতার শিরা-ধমনীরূপে প্রকৃত মর্যাদা পেয়েছে, সে সব মানচিত্রে এখনকার চেয়ে এই সত্যটি বেশী স্পষ্ট, এখন শহরে শহরে যোগাযোগের অপূর্ব মাধ্যম হল রেলপথ, এখন ধন-উৎপাদনের চেয়ে ধনব্যয়ের পথের গুরুত্ব বেশী। তবু রেলপথ নদী-সৃষ্ট শহরগুলিকেই যুক্ত করে। এমনকি, বিংশ শতাব্দীও অতীতের প্রভাবকে অতিক্রম করতে পারে না।

একমাত্র এশিয়ার ইতিহাস দিয়ে এশিয়ার ভূগোল বোঝা যায়। সাম্রাজ্য মানে সংগঠন, যার ভিত্তিরূপে এক ঐক্য-চেতনা পারিবারিক গণ্ডীকে অতিক্রম ক'রে যায়। অর্থাৎ, সাম্রাজ্যের জন্য চাই দৃঢ় নাগরিক চেতনা। গত দু-হাজার বছরে দু'ধরনের সাম্রাজ্য দেখা গেছে, একটা হল, ইউরোপের উপকূল অঞ্চলের জেলেদের তৈরি, অন্যটি, মধ্যএশিয়া ও আরবের সম্প্রদায়গুলির সৃষ্টি। প্রথমটিতে, যারা বরাবর প্রাগৈতিহাসিক বাণিজ্যপথে বাস ক'রে এসেছে, তাদের পক্ষে বাণিজ্যিক আগ্রহ প্রধান হওয়া স্বাভাবিক। এক বিশিষ্ট পণ্ডিত বলেছেন, নরওয়ের স্যামন মাছ-ধরার কেন্দ্রগুলির অতিসুসংগঠিত কর্মীরা জেলে—জলদস্যুদের জন্ম দেয়, তার থেকে জন্ম নেয় নর্মানরা, অতএব, ঐ নরওয়ের জেলেদের সামন্ততান্ত্রিক প্রথার জনক, তথা আধুনিক ইউরোপের সব সাম্রাজ্যের পূর্বপুরুষ বলে মনে করা যায়। অবশ্য এ ধারণা রোমক সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে না। এর জবাবে বলা যায়, রোমের পেছনে ছিল গ্রীস ও কার্থেজ; গ্রীস ও কার্থেজের পেছনে ছিল ফিনিশিয়া আর ক্রীট; এবারে আবার সেই বাণিজ্যপথ ও জেলেদের কথায় ফিরে এলাম। আক্রমণের আগে চাই দৃঢ় ঐক্যবোধ, সেই ঐক্যবোধ কার্যকরী হয় অভ্যন্তরীণ দৃঢ়তা ও সংগঠনের দ্বারা। এই সংগঠন সহজেই গড়ে ওঠে সমুদ্র জয় করলে, সেখানে ক্যাপ্টেন, ফার্স্ট মেট ও সেকেণ্ড মেট সকলের অভিভাবক, এদের কারুর এতটুকু ত্রুটি হ'লে সকলের মৃত্যু ঘটতে পারে।—এইভাবে পরিবারের চেয়ে কর্মীরা বড় হয়ে ওঠে, ঘরের প্রীতি নাগরিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাতটি সন্তানকে সঁপে দিয়েও দৃঢ় স্বরে বলতে পারে, "দেশের জন্য মৃত্যু মধুর এবং সত্য।"

গত দু-হাজার বছরে দেখা দ্বিতীয় ধরনের সাম্রাজ্য-সংগঠন হ'ল মধ্যএশিয়া ও আরবের পশুপালকদের সাম্রাজ্য। আরবে কয়েকটি পশুপালক-গোষ্ঠীর জাতীয়

ঐক্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ঈশ্বরের দূত মহম্মদ বস্তুতঃ মহত্তম জাতিগঠক। আরবদের প্রাচীন সংগঠনগুলিতে পারিবারিক ঐক্যকে অতিক্রম ক'রে গোষ্ঠীর নাগরিক ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছিল; সীমান্ত গোষ্ঠীগুলির আত্মীয়তার ও সৌজন্যের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতীয়তার ধারণা, এতে জাতীয় জীবনের ভিত্তি গড়ে ওঠে। এই সব উপাদানগুলির ওপরে গড়ে ওঠে বাগদাদ, কন্‌স্তান্তিনোপল্‌ ও কর্ডোভার রাজত্ব। ভারতের হুণ, সীদীয় ও মুসলমান সাম্রাজ্যগুলি মধ্য এশিয়ার যাযাবর সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত মুঘল বংশের নামটাই এসেছে তাতার ভাষা থেকে। এখানে আমরা জাতি ও সাম্রাজ্য গঠনের জন্য সম্প্রদায়কে প্রস্তুত করার কাজে ও গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবনের শিক্ষাগত মূল্যের উদাহরণ দেখতে পাই।

সুদূর অতীতের যে সব অস্পষ্ট সাম্রাজ্যের স্মৃতি মানুষের কাছে প্রায় মুছে গেছে—অ্যাসিরীয়, পার্থীয়, মিডিয় ইত্যাদি—মনে হয়, তারা শিকারীর বুদ্ধি ও ঐক্যের ওপরে তাদের আক্রমণ এবং সহযোগিতার শক্তি গড়ে তুলেছিল। একটা দৃষ্টিকোণ থেকে, জলে জেলের যা কাজ, ডাঙায় শিকারীর সেই কাজ, সৈনিকও মানুষ-শিকারী মাত্র। কিন্তু মানুষের মন শ্রেষ্ঠ। এমন কি, একটা বিশেষ পেষাগত শিক্ষার ফল মানুষ শুধু বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করতে পারে। প্রাচীন মিশরে জগৎ দেখেছে, এক কৃষক-জাতি হিটাইট, ব্যাবিলনীয়, ক্রীট, সম্ভবতঃ ফিনিসীয় সাম্রাজ্য দেখে জেগে উঠেছিল, জাতীয় ঐক্য ও আত্মরক্ষার ধারণাকে গ্রহণ ক'রে নিজেদের বাঁচাতে পেরেছিল। বিজ্ঞানের মূল্য এইখানে যে, সে একটা সত্যকে বিশ্লেষণ ক'রে শক্তির উৎস আবিষ্কার করে, তারপর সেই সত্যে পৌঁছবার নতুন পথ মানুষকে শেখায়।

মনের আত্মিক ক্রিয়ারূপে ঐক্য-চেতনা দেখা দেয় বৈচিত্র্যের ভিত্তিতে। মিশরের শহর, বা আরব-তাতার সম্প্রদায় অথবা জলদস্যুদের নৌবাহিনী—যাই হোক না কেন, জন্মের পর তার দিকে নজর রাখতে হবে, তাকে নানাভাবে শিক্ষিত ও চালিত করতে হবে। আন্তর্গোষ্ঠীয় শান্তি বজায় রাখার কাজে অতিকুশলী এবং আরও অভিজ্ঞ হতে হবে। যারা বজ্রতুল্য উদ্যম নিয়ে হৃদয় ও বিবেক লাভের জন্য এক হবে, তাঁদের যৌথ কাজ ও একটানা সহযোগিতায় অভ্যস্ত হতে হবে; তারা পরস্পরের বিশ্বাসের ভূমিকে জানবে, কিছু অসাধারণ আচারণবিধি জানতে এবং সর্বদা মেনে চলতে হবে। সম্প্রদায়, কর্মীদের মত সামাজিক সংগঠনের দ্বারা জাতির সেবার জন্য এরকম চরিত্র, এরকম অভিজ্ঞতা গড়ে ওঠে। আমৃত্যু আনুগত্যের দ্বারা প্রয়োজনীয় শৃঙ্খলা দেখা দেয়। সকলের মঙ্গলের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়ার একটা পথ খুঁজে বার করার জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় দেখা দেয় উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং সংগ্রাম-চেতনার মিলন। ইতিহাস ও পরিবেশ স্বতঃই মানুষকে এই ফল দান করে।

ভারতের ইতিহাস ও তার পর্যালোচনা

১

একমাত্র ভারতীয় ইতিহাসের আলোকে ভারতবর্ষরূপী সমস্যার সমাধান করা যায়। কি ক'রে ভারতের উদ্ভব ঘটল, তার ক্রমপর্যায়ের সশ্রদ্ধ আলোচনার দ্বারা আমরা বুঝতে পারব, আমাদের দেশের প্রকৃত রূপ কি, তার অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ ক্ষমতা কি হতে পারে।

আমরা প্রায়ই শুনি, ভারতীয় রচনায় কোন ইতিহাস নেই। বলা হয়ে থাকে, ভারতবর্ষের একমাত্র যথার্থ ইতিহাস-জাতীয় রচনা হল, কাশ্মীরে রাজ তরঙ্গিণী, সিংহলে দীপবংশ, মহাবংশ এবং ভারতে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর তাদের রচিত দলিলপত্র। দু-এক পুরুষ পরে এ বিষয়ে আমরা আরো ভালো ক'রে আলোচনা করতে পারব; এ কথা যদি সত্যও হয়, তবু আমাদের মনে রাখতে হবে, ভারতবর্ষ স্বয়ং হল শ্রেষ্ঠ ইতিহাস। দেশই তার দলিল। এই ইতিহাস আমাদের পড়তে শিখতে হবে। অনেকে বলে, রাজনৈতিক শক্তির ক্ষয় হলে ইতিহাস-জাতীয় রচনা বাঁচতে পারে না এবং এই কারণে, ভারতে যথার্থ ও বিরাট ইতিহাস বেশী নেই। যারা একথা বলে, তারা বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক যুগের ইতিহাসে অতীতের বিশালসংখ্যক নথিপত্র নষ্ট হয়ে গেছে। হতে পারে। অন্য দিকে, আমরা আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের সাহায্যে জাতীয় সাহিত্যের এই দিকটির ক্ষতিপূরণ করতে পারি। বাংলাদেশের ইতিহাস নিয়ে যে অল্প কয়েকজন অনুরাগী বিদ্যোৎসাহী কাজ করেছেন, তাঁরা আমাদের বলেছেন, উপকরণের সঙ্গে পাল্লা দেওয়াই অত্যন্ত কঠিন। প্রতিদিন উপকরণ বেড়ে চলেছে। সমস্যা হল, আজকের মতামতকে এমন ভাবে গড়তে হবে, যাতে কালকের নতুন তথ্যের সঙ্গে বিবাদ বা বৈপরীত্য না দেখা দেয়। এখন হয়ত আমরা অতীতের বেশী ইতিহাস-জাতীয় রচনা পাই নি। কিন্তু যে সাঁতারু গভীর জলে, প্রবল স্রোতে ডুব দেওয়ার আনন্দ জানে, সে খুশী হয়। তাদের মনে হয়, ইতিহাস-রচনার প্রচুর উপকরণ রয়েছে, এই সুযোগ পাওয়ার জন্য তারা কৃতজ্ঞ বোধ করে।

গৃহ ও পরিবারের নথিপত্র থেকে বাংলার সম্পূর্ণ ইতিহাসে আলোকপাত করা যাবে। জাতিভেদের মূল ও সাম্প্রদায়িক প্রথার উৎস খুঁজলে প্রাচীন নিয়ম-কানুনের তথ্য জানা যাবে। আমার বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেন বলেন, বংশতালিকা আলোচনা ক'রে তাঁর বিশ্বাস হয়েছে যে, বাংলাদেশের উচ্চবর্ণের অধিকাংশ পরিবার মগধ থেকে এসেছে। তাই যদি হয়, তাহ'লে মনে করা যায়, এক সময়ে মগধের লোকেরা সেখান থেকে চলে এসেছিল। ইতিহাসের ঘটনার সঙ্গেও এ ধারণা ভালভাবে মিলে যায়—যেমন পাটলীপুত্র ধ্বংস হওয়ায় গৌড়ে রাজধানী স্থানান্তর,

বাঙালীর বিপুল সাংস্কৃতিক যোগ্যতা—অতএব, এ অনুমান থেকে পরবর্তী গবেষণায় উল্লেখযোগ্য বক্তব্য গড়ে উঠতে পারে। কিছুদিন এ গবেষণা অত্যধিক অনুমান-নির্ভর হয়ে থাকবে। অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের কাজ চলবে। এই পদ্ধতি আধুনিক বিজ্ঞানের আদর্শ এবং একটা মানুষের সাধারণ আগ্রহের এত বিপরীত, এত কষ্টসাধ্য যে, অল্প লোকই সাফল্য লাভ করবে। তবু আদর্শ হিসেবে এর মহত্ত্ব প্রশ্নাতীত। কোন বিশেষ তত্ত্বের দিকে না ঝুঁকে সাবধানে তথ্য সংগ্রহ ক'রে যে সিদ্ধান্ত গঠিত হয়, তা সঠিক। তাই কেউ সুদূর অতীতের কোন তথ্য সংগ্রহ করলে, যতক্ষণ সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে জানা না যাচ্ছে, ততক্ষণ তা যতই আনুমানিক মনে হোক, তার দ্বারা ঐতিহাসিকদের উপকার হবে। কারণ, উন্নতি কিছুদিন এই তথ্য সংগ্রহের ওপরেই নির্ভর করে। সমগ্রের প্রকৃত ধারণা লাভ করতে গেলে আমাদের উপাদানগুলি খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

একটা তথ্য লাভ করার পর আমাদের কাজ হবে, কেন্দ্রীয়, পরিচিত ঘটনাগুলির সঙ্গে তার যোগ স্থাপন করা। যেমন, আমরা জানি, বাংলাদেশের রাজধানী পাটলীপুত্র থেকে গৌড়ে, সেখান থেকে বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এরকম পরিবর্তনে নিশ্চয় বিরাট সামাজিক প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। বিহারের ধ্বংসস্তূপে আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের দীর্ঘ সংগ্রামের পরিচয় রয়েছে। এ হল, বাংলার সামরিক ইতিহাসের তথ্য। কিন্তু আর শিল্পোন্নতিতে আর-একটা তথ্য পাওয়া যায়। বিক্রমপুরের প্রাচীন হিন্দু কেন্দ্র থেকে মুসলমানী রাজধানী ঢাকা ও মুর্শিদাবাদে সরকার স্থানান্তরের অর্থ হল, শিল্পকলার বিরাট পরিবর্তন। প্রাচীন শিল্পক্ষমতা নতুন মানদণ্ডের যোগ্য হতে গিয়ে রুচির ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতা দেখা দিল। ব্যক্তিগত জীবন ও রুচির ক্ষেত্রে বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনার বিরাট প্রভাব বুঝতে গেলে অলঙ্কারের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং শিল্পকর্মের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক মূল্যায়নে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে। স্থাপত্য, সঙ্গীত, কাব্য, গৃহ ও সাংসারিক জীবনের বাস্তব হস্তশিল্পের চেয়ে উন্নততর, তবু বিশেষ যুগের প্রভাব তাতে নিশ্চয় থাকে। প্রতিটি বস্তুকে সংশ্লিষ্ট যুগ এবং উদ্ভাবক মনের পটভূমিকায় বিচার ক'রে আমরা ইতিহাসের গভীরতর দিক্‌গুলিকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হই। গত শতাব্দীতে উদ্ভিদ্‌বিদ্‌, প্রাণীবিদ্‌ ও ভূতাত্ত্বিকরা যা শিখেছেন ও শিখিয়েছেন, আমরাও তাই শিখি, অর্থাৎ, যে সব বস্তু একত্র পাওয়া গেছে, সেগুলির মধ্যে হয়ত অনেক যুগ ও দূরত্বের ব্যবধান রয়েছে। আমাদের প্রার্থনার বইতে বিদ্যাপতি ও রামমোহন-রায়ের কবিতা পাশাপাশি থাকে, কিন্তু দু'জনের মাঝখানে মানবাত্মার কত যুগ চলে গেছে! স্বাভাবিক উন্নতির যুগে, স্থাপত্যে বা চিন্তায় নতুন ধারা দেখা দেয়, কিন্তু এই অবক্ষয় ও হুজুগের সময়ে তা ধীরে ধীরে অনেক গভীরে ছড়িয়ে পড়ে। যে আগ্রা ফোর্টে গিয়ে আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের যুগের লাল বেলেপাথরে কালো ও সাদা মর্মর পাথর ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে নি, সে পরে বুঝতে পারবে না, এটা

কোন্ যুগের বৈশিষ্ট্য। অলংকরণগুলি আগ্রায় পাশাপাশি থাকলেও ওগুলি সম্পূর্ণ হতে তিনটি রাজত্বের দরকার হয়েছে।

সারা বছরটা লক্ষ্য করলে আর-এক ধরনের ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রাম্যজীবনের যে উৎসবগুলি এত দ্রুত, আনন্দময় রূপে দেখা দেয়, বছরের বারো মাসে, সেগুলি সব একটি কারণের ফল নয়। বরং জুলাই মাসের রথযাত্রার উৎসব বৌদ্ধধর্ম থেকে এসেছে এবং উড়িষ্যার উপকূলে পুরী নামক বিরাট শহরে এ উৎসব পালিত হয়। কিন্তু জন্মাষ্টমী কৃষ্ণের বৈষ্ণব মতের উৎসব, এতে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অন্য দিকে, মথুরা ও বৃন্দাবনের দিকে। দেওয়ালী একদিকে আমাদের জাপানী লণ্ঠন-উৎসবের কথা মনে করিয়ে দেয়, অন্যদিকে তা মৃত আত্মাদের বার্ষিক ল্যাটিন ও কেল্টিক উৎসবের সঙ্গে যুক্ত করে। যে চিন্তাজগৎ থেকে এত বিচিত্র প্রেরণা জন্ম নেয়, সে জগৎ কত বিচিত্র! বর্তমান গভীরতা ও প্রভাব লাভ করতে কত দীর্ঘ সময় চলে গেছে। যে পরিবর্তনশীল ভাবধারাগুলি ভারতীয় মনের ওপর দিয়ে পরপর বয়ে গেছে, একটা বছর তার প্রমাণ।

ভারতের একটা বৈশিষ্ট্য হল যে, প্রত্যেক মহৎ চিন্তা ও মতবাদ কোথাও না কোথাও প্রতিপালক প্রথারূপে বজায় রয়েছে। এতে আমাদের ভৌগোলিক বিশ্লেষণের কথা মনে জাগে। ভারতের প্রত্যেক অংশের ইতিহাসের ব্যাখ্যার জন্য সমগ্র ভারতের প্রয়োজন। কৃষ্ণের কাহিনী এসেছে যমুনা থেকে, রামের কাহিনী অযোধ্যা থেকে। অন্য উপাদানগুলির জন্মস্থান হয়ত এত সহজে নির্ধারণ করা যাবে না, তবে এ কথা ঠিক যে, ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে ভালভাবে পর্যালোচনা করলে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট উৎপত্তিস্থান রয়েছে। ভারতবর্ষ ভরতীয় চিন্তাজালের একই সঙ্গে উদ্ভব ও ব্যাখ্যা। তবু সারা বাংলাদেশে একটা নির্দিষ্ট ধারণা রয়েছে, বাৎসরিক উৎসবের তালিকায় কোন্ কোন্ উপাদন কিভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ভারতীয় অতীতের সব মহৎ বস্তু এইভাবে বেঁচে নেই। কোন সময়ে কেউ না কেউ কিছু নির্বাচনের পর নির্দিষ্ট নিয়ম তৈরি করেছিল। উৎসবগুলি এবং সেগুলির সময় সম্পর্কে সারা বাংলাদেশে কোন মত-বিরোধ নেই। অতএব, এ নির্বাচন নিশ্চয় কোন ব্যক্তি বা দলের দ্বারা হয়েছে, যার প্রভাব এ প্রদেশের সর্বত্র ছিল। এই ধারণা সর্বত্র রয়েছে, অতএব, এই সর্বব্যাপী প্রভাবের ফল নিশ্চয় দীর্ঘদিন চলেছিল। হয়ত শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছিল। এটা ব্যক্তিগত প্রভাব বলে মনে হয় না, কারণ, ব্যক্তি খেয়ালখুশি বা পরিবেশ অনুযায়ী যুগে যুগে তাদের সরকারের নীতি বদলায়। বরং মনে হয়, এটা একটা নির্দিষ্ট দিকে চালিত সাধারণ স্বার্থে স্থায়ী জনমত। কিন্তু বিষয়টা জটিল হ'লেও এর একটা কেন্দ্রীয় পরামর্শ ও সিদ্ধান্তের জায়গা ছিল, তবে সেখানে ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব যতদূর সম্ভব কম ছিল। পরিশেষে বলা যায়, এর প্রয়োগের কারণ যাই হোক, এই কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে এতটুকু না বদলে গঠনমূলক যুগে বজায় রাখার জন্য নিশ্চয় কোন দৃঢ় রাজকীয় কর্তৃপক্ষের এতে সমর্থন ছিল। এত সব বিষয়ের

সময়ে আমরা বাংলাদেশের এক প্রান্ত থেকে আর-এক প্রান্ত পর্যন্ত একই রকমের এত জটিল ও নিয়মিত বার্ষিক দিনপঞ্জীর কারণ বুঝতে পারি।

চিন্তা-ভাবনার দিকটা যদি বুঝতে চাই, তাহলে হোলি উৎসবের উদাহরণ নেওয়া যাক। এই দিনটি পালনের মধ্যে তিনটি আলাদা উপাদান স্পষ্ট দেখা যায়। প্রথম, প্রাগৈতিহাসিক স্ত্রীপূজার চিহ্ন রয়েছে, গ্রামে দেখা যায়, মেয়েদের গালি দেওয়া হয় এবং তারাও সেদিন পুরুষদের প্রহার করতে পারে। ফাল্গুনের পূর্ণিমায় এই উৎসব পালনের মূল ধারণা নিশ্চয় খুব প্রাচীন, অতএব, এর বিবরণ, যোগসূত্র আমাদের খুঁজতে হবে আর্য পরিবারের সুদূর বিচ্ছিন্ন শাখাগুলিতে, গ্রীসদেশের প্রেম ও বসন্তের গ্রীক উৎসবে, রোমান স্যাটার্নালিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় মেলা, এমনকি ইংরেজ শিশুদের সেকেলে ভ্যালেণ্টাইন্সেতে উৎসবে।

এই হোলির দিনেই যে চৈতন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এতে এর আর-একটি সূত্র পাওয়া যায়; অনেকে এ ঘটনাকে আকস্মিক মনে করতে পারে। কিন্তু এ উৎসবকে কৃষ্ণপূজার তাৎপর্য প্রদান করার কোন অস্বাভাবিকতা নেই। হিন্দুধর্মের কয়েকটি পরিবেশ—যা আজকে সভ্যতার যুগে আমাদের ভয়ঙ্কর ও অভাবনীয় মনে হয়ে, সেই স্ত্রীপূজার মত আবার এই চৈতন্যের জন্মের ঘটনা দিয়ে উৎসবের সব আনন্দ-উচ্ছ্বাসকে বৃন্দাবনের কুঞ্জে গোপবালকদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা ব'লে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাই বসন্তের লাল আবীর হয়েছে কৃষ্ণের দ্বারা নিহত মেত্রাসুরের রক্ত। স্বভাবতঃ বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার উত্তেজনায় তরুণ কৃষকরা পরস্পরকে "রক্তে" রাঙিয়ে প্রতিবছর মুক্তির উৎসব উদ্‌যাপন করতে মেত্রাসুরের মূর্তি পোড়ায়। যারা এই চতুর প্রস্তাব দিয়েছে, আমরা যেন তাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি।

যেমন, হোলি-উৎসবে আমরা কিছু ইচ্ছাকৃত হিন্দু করার ক্ষমতার চিহ্ন দেখতে পাই। এ কথা ভাবা চলে যে, এই ক্ষমতাই সারা বছরের পথকে নির্দিষ্ট করেছে। ক্ষমতা হিসেবে এর বৈশিষ্ট্য নিশ্চয় ধর্মীয়, তবু তা শক্তিশালী সিংহাসনের ছায়ায় ছিল। সে কি রকম সিংহাসন? খুব সহজ পরীক্ষার সাহায্যে এর জবাব দেওয়া যায়। যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিষ্ঠানগুলি অল্পবিস্তর ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে, তারা নিশ্চয় পাটলীপুত্রের প্রাচীন অনুমোদন পেয়েছিল। যেগুলি দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হলেও বিশেষভাবে বাংলার সম্পদ, সেগুলি নিশ্চয় গৌড় থেকে এসেছে। অতএব, একটা বস্তুর ভৌগোলিক স্থান নির্ধারণই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই ক্ষেত্রে রয়েছে সেই যুগের রহস্য।

শুধু ঐতিহাসিক ঘটনার প্রত্যক্ষ বিবরণ কেউ কখনো ভারতে মনে রাখে নি। তবু পাঞ্জাবের গুরু গোবিন্দ সিং বা মহারাষ্ট্রের রামদাস গৌড় সম্রাটের সম্রাজের যুগে বেঁচে থাকলে হয়ত বাঙালী হিন্দুধর্মের স্মৃতিতে স্থান লাভ করতেন। কিন্তু এঁদের কারুর সময়ে তা না ঘটায় বোঝা যায়, ওঁদের আগেই দিনপঞ্জী রচনা সম্পূর্ণ হয়েছিল। এমনকি চৈতন্যদেব জনগণের প্রতিভার সার্থক প্রকাশরূপে বাংলাদেশে

বিশ্বজনীন বিশ্লেষণে প্রায় বিস্মৃত। যারা তাঁরা কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছে বুদ্ধের মত তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা একেবারে তাদের মধ্যে সীমিত। কিন্তু যুক্তির আলোকে আমরা যদি চৈতন্যকে বুঝতে চাই, তাহলে ভারতের সমগ্র ইতিহাস আলোচনা ক'রে দেখা দরকার, তাঁর যুগের অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে কোথায় তাঁর মিল বা পার্থক্য। সারা ভারতের সঙ্গে তিনিও রামানুজ-উদ্ভাবিত বৈষ্ণবধর্মের বিশাল মধ্যযুগীয় আবেগে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্লাবিত করেছিলেন। ভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে তাঁর বৈষ্ণবধর্মের পার্থক্য হ'ল, গৌড় ও বিক্রমপুরের গভীর নিজস্ব প্রভাবে তাঁর ধর্মে বাংলার বিশিষ্ট ভাবধারা দেখা দিয়েছে।

অতএব, আমাদের চোখ যদি খোলা থাকে, তাহ'লে চারপাশে যা দেখা যায়, তার থেকে আমরা অতীতকে জানতে পারি। সমুদ্রতীরে যে জলজ উদ্ভিদের সারি দেখা যায়, তা যেমন সরে যাওয়া জোয়ারের জলে ভেসে আসে, তেমন, আজ আমরা যে জীবন যাপন করছি, তা আমাদের পূর্বসূরীদের দ্বারা রচিত। বর্তমান হ'ল অতীতের ভগ্নাবশেষ। আজকের ভারতকে ভারতের ইতিহাস দিয়ে ব্যাখ্যা করতে হবে। অতীত যে উপাদান রেখে গেছে, সেই উপাদান এবং এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আমাদের চেতনা—এর সাহায্যে ভবিষ্যৎ সৃষ্টিলাভের জন্য অপেক্ষা করছে।

(২)

ভারতই যদি ভারতীয় ইতিহাসের বই হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে, সে ইতিহাস পাঠ করার প্রকৃত উপায় হল, ভ্রমণ। বিশেষ ক'রে যখন আমাদের ইতিহাসের প্রকাশিত গ্রন্থ এত কম এবং এত ভুল, তখন এই বক্তব্যের সত্যতাকে ভোলা উচিত নয়। পাঠের উপায়রূপে ভ্রমণের অসীম গুরুত্ব। তবু ভ্রমণই সব নয়। সারা জগৎ ঘুরেও কেউ কিছুই হয়ত দেখল না বা ভুল দেখল। আমরা যা দেখব বলে প্রস্তুত থাকি, শুধু তাই দেখতে পাই। ছাত্রকে শিক্ষক যা দেখতে শিখিয়েছেন, সেটা ছাড়াও সে চোখের সামনের সত্য ঘটনা দেখার উপযুক্ত ক'রে মনকে কিভাবে তৈরি করবে, এটা সব বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সমস্যা। ইতিহাসেও শুধু প্রীতিপ্রদ ঘটনা না দেখে আমরা সত্য ঘটনা দেখতে চাই। এর জন্য আমাদের পরিশ্রমসহকারে প্রস্তুত হতে হবে।

আমরা ধরে নিচ্ছি যে, এর একটা পথ আমাদের পূর্বপরিচিত। ভারতীয় ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য নাম—বৌদ্ধধর্ম, শৈবধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, ইসলাম—মানুষের কাছে অর্থবহ। ক্রমশঃ ছাত্র বিশেষ দিক্‌টিতে আকৃষ্ট হয়, তার বিভিন্ন মাত্রা তুলনা করার নিজস্ব পদ্ধতি নিজেই ক'রে নেয়। সে একটা বিশেষ ঘটনা বেছে নিয়ে তাকে উপযুক্ত পরিবেশে দেখতে থাকে। বিহার ভৌগোলিক ও জাতিতত্ত্বের দিক্ থেকে ভারতের সবচেয়ে জটিল এবং ইতিহাসের দিক্ থেকে উল্লেখযোগ্য একটি

প্রদেশ। অতএব বিহারের আলোচনা ক'রে আমরা স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র মুখার্জির তত্ত্বের সত্যতা জানতে পারি; যখনই তেঁতুল গাছ বা গোল টিলার মাথায় কোন পীরের কবর দেখি, তখনই তার জায়গায় মনে মনে কল্পনা করি অশ্বত্থ গাছ বা বৌদ্ধ স্তূপ।* এভাবে আমরা যদি সব ধারণাগুলি থেকে একটা সামগ্রিক ভাবধারা গড়ে তোলার চর্চা করি, তাহলে মুসলমান আক্রমণের সময়ে জনসাধারণের স্থানত্যাগ, বৌদ্ধধর্মের শক্তি ও রূপ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক অপূর্ব, অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব।

কিন্তু ভারতীয় ইতিহাস পাঠ করতে গেলে প্রতি মুহূর্তে যে সত্যটি আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করি, তা হল, ভারতবর্ষ চিরকাল সমন্বয়রূপে রয়েছে এবং ছিল। জাতি, ভাষা বা অঞ্চলগত হাজার বিশ্লেষণও ভারতবর্ষের প্রকৃত আলোচনা হবে না। সম্ভবতঃ ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধ এখানে প্রযোজ্য নয়। হয়ত সমগ্রের সবগুলি অংশ সমগ্রের সমান নয়। অন্ততঃ যে সব উপাদানগুলির যোগে ভারতের সর্বগ্রাসী রূপ পাওয়া যায়, সেগুলি ব্যতীত ভারতের ভাগ্য-পরিবর্তনকারী রূপ এবং উপাদানগুলির প্রকৃতিকে আমাদের জানতে হবে। ভারতীয় জনগণ যান্ত্রিক সংগঠন পদ্ধতিতে অদক্ষ হ'তে পারে, কিন্তু মূল সমন্বয়ের উপাদানগুলির কোন অভাব তাদের নেই। কোন ভারতীয় প্রদেশ বিচ্ছিন্ন হয়ে একা নিজস্ব পথে উন্নতি ক'রে থাকতে পারে নি। বরং একই ভাবধারা দেশের সর্বত্র বয়ে গেছে। এক যুগে একটি আবেগ স্থাপত্যে, ধর্মে, নৈতিক সংগ্রামে সব প্রদেশকে আবদ্ধ করেছে। প্রাদেশিক জীবন সমৃদ্ধ, বিশিষ্ট হলেও ভারতবর্ষ জানে, কিভাবে সকলের সচেতন আশা ও প্রীতির সমন্বয়ে ঐক্য গড়ে তুলতে হয়। অতএব, যুগ ও অংশকে লক্ষ্য করতে গিয়ে আমরা যেন তার আড়ালে জননী ও জন্মভূমিকে ভুলে না যাই। তাকে মনে রাখলে, তার আশ্রয় নিলে, যে সমস্যা আমাদের হতবুদ্ধি করেছে তার সমাধান খুঁজে পাব, প্রয়োজনীয় যোগসূত্রটি আবিষ্কার করতে পারব।

কোন মূল্যবান ভাবধারার উৎস বিদেশ থেকে, এরকম ধারণায় আমাদের সহজে নিরুৎসাহ হ'লে চলবে না। এ জগতে সম্পূর্ণ মৌলিকতা ব'লে কিছু নেই। অন্যদের চেয়ে শক্তিশালী কিছু মনসাধারণ প্রতীকগুলির উপাদানগুলিকে নতুন উপায়ে মিলিত করেন। একেই আমরা বলি মৌলিকতা। মনের শক্তির প্রমাণ মেলে, সে যা উপাদান পায় তাই নিয়ে যদি সে কাজ করতে পারে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যা সত্য, জাতির ক্ষেত্রেও তা সত্য। কিছু ঘটনার ইতিহাস আমাদের জানা না থাকায় সেগুলিকে একক, অদ্বিতীয়, অলৌকিক ব'লে মনে হয়। বস্তুতঃ, ধর্মের মত

---

* মুসলমানের কাছে তেঁতুল গাছ পবিত্র, তারা যে বিহারে এসে অশ্বত্থ গাছের জায়গায় তেঁতুল গাছ লাগিয়েছে বা গোল টিবির মাথায় পীরের সমাধি-সৌধ তৈরি করেছে, এতে বোঝা যায়, তখনো ঐ গাছ ও টিবির পবিত্রতা বিহারে বজায় ছিল; তার অর্থ, বৌদ্ধধর্ম বিস্মৃত হয় নি।

সভ্যতাও যেন বহু ধারার সমন্বয়, তা একজনের প্রতিভায় সৃষ্ট অসাধারণ একটি মূর্তি বা ছবি নয়। আমরা যদি গ্রীসের জন্মের কারণ খুঁজতে যাই, তাহলে তার সাধারণ ক্ষমতার প্রতিটি ক্ষেত্রে সাধারণ ও অসাধারণের মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করব এবং এখন তার যে সৌন্দর্য ও দুঃসাহসিকতাকে অলৌকিক মনে হয়, তা তখন অনিবার্য মনে হবে। মিশর, অ্যাসিরিয়া এবং প্রাচ্যের গৌরবের সঙ্গে গ্রীক প্রতিভার বিশেষ প্রকাশের সম্বন্ধ বেশী ছিল, এখন অবশ্য আমরা তা স্বীকার করতে প্রস্তুত নই। তাই যদি হয়, তাহ'লে হেলেনিক সংস্কৃতির প্রকৃত গৌরব হল স্পষ্ট প্রভাব, উদ্যমশক্তি এবং সাধারণ উপাদানগুলি। সম্ভবতঃ এসব গুণ ছাড়াও ছিল, তার অসাধারণ বিশ্লেষণ ও সংগঠন ক্ষমতা। তবু, গ্রীক জাতি যে ভৌগোলিক বা জাতিগত পরিবেশ অধিকার করতে পেরেছিল, তা না থাকলে তারা গ্রীক সভ্যতা গড়ে তুলতে পারত না। যে কোন বিশেষ জাতি সম্পর্কে সবচেয়ে বড় প্রশংসার কথা হ'ল, তাদের সামনে সে যুগের জগৎ যে উপাদানে এসে উপস্থিত করেছিল, সেই উপাদানে কি ক'রে নিজেদের গভীর ছাপ রাখতে হয়, তা তারা জানত। তাহ'লে এই যদি জাতীয় কৃতিত্বের চিহ্ন হয়, তবে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি বলা যায়? তার এমন কোন নিজস্ব একান্ত প্রভাব আছে, না, নেই? উত্তরটা জেনেই আমরা এ প্রশ্ন করেছি। এমন কি, সূক্ষ্ম শিল্পকাজে ভারতীয় বস্তুকে অন্য দেশের বলে ভুল করা যায় না। যেমন, পদ্মের ছবিতে ভারতীয় অ্যাসিরিয়, মিশরীয় বা চীনা প্রভাব দেখলে কে না চিনতে পারবে? চেহারায়, পোষাকে, বৈশিষ্ট্যে ভাবধারায় ভারতীয় বস্তু সারা জগতের আর কোন অভারতীয় বস্তুর মত নয়। যারা বিদেশী উৎসের কাছে ভারতীয় ঋণের অবিরাম আলোচনায় হতাশ হয়ে পড়ে, তাদের সবচেয়ে ভাল প্রতিকার হ'ল, কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে ভাবা যে, ভারত অন্যদের জন্য কি করেছে। চারিদিকে যে ভারতীয় জগৎ দেখছ, তাতে এক মুহূর্ত ডুব দাও। তোমার ইতিহাসের কথা ভাব। কেউ কি বলে, অন্য কোন জাতি বৌদ্ধ ধর্ম সৃষ্টি করেছে? বা, সাধারণ ত্যাগী শিবের কল্পনা ইউরোপের স্বপ্ন? নাঃ অন্য জাতির সাংস্কৃতিক উপাদানের সঞ্চয়ে ভারতের অংশ থাকলে তাতে দুঃখ পাওয়ার কোন কারণ নেই। কোন্‌খান থেকে এ উপাদান এল, সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হ'ল ভারত ঐ উপাদান দিয়ে কি গড়েছে? সে কি প্রত্যেক যুগের সব উপাদানকে অঙ্গীভূত ক'রে নিজের জাতীয় আচরণ ও প্রয়োজনের কাজে লাগাবার মত দৃঢ়তা দেখিয়েছে? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ বিষয়ে ভারতের দানকে অস্বীকার করবে না। অতএব, সাংস্কৃতিক উৎসের অনুসন্ধানে ভারতের লজ্জা বা অপমানের ভয় নেই।

এই দুঃস্বপ্ন দূর হলেও আর-একটা দুশ্চিন্তা রয়েছে। ভারতীয় মন প্রাচীন বিষয়ের অনুসন্ধানে দলীয় যুক্তি না তুলে পারে না। হয়ত এটা স্বাভাবিক;

তবু যথার্থ ঐতিহাসিক অনুসন্ধানকে জনপ্রিয় করার পথে এটা বড় বাধা। শিক্ষার্থীর মন তারিখের বিষয়ে সম্পূর্ণ উদার হওয়া উচিত। যদি কোন-না-কোন দিকে একটুও পক্ষপাতিত্ব থাকে, তা হ'লে ঠিক যেন দাঁড়িপাল্লার এক দিকে পাল্লা ঝুঁকে যায়। সঠিক বিচার এভাবে হয় না। বস্তুতঃ, ভারতে যথার্থ ঐতিহাসিক যুগ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত ত্রিশ শতাব্দীর কিছু কম হ'লেও বিবর্তনের সামগ্রিক বিশাল দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে দ্বিমত হ'তে পারে না। জগতের ইতিহাসের প্রাচীনতম সমস্যা আলোচনা করার ক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ। সব ইতিহাসের আড়ালের সমাজ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধান ভারতে চালাতে হবে; যখন কোন নির্দিষ্ট জনসমষ্টি একটা বিশেষ দিকে এবং একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে তথা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সকলের কাজকে যথেষ্ট ভালভাবে গড়ে তোলে তখন যথার্থ ইতিহাস দেখা দেয়। রাজনৈতিক জীবরূপে মানুষ ইতিহাসের বিষয়। যে সব সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত ছোট, ঘনিষ্ঠ এবং নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় তাদের মত অন্য জাতির সীমানার পাশে থাকে, তারা সবচেয়ে আগে এই স্তরে পৌঁছবে। এইভাবে মিশর, নিনেভে আর ব্যাবিলন পরস্পরের কাছাকাছি থাকায় ভারতের চেয়ে আগে ঐতিহাসিক স্তরে পৌঁছতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তারা প্রকৃত প্রাচীনত্বে বা অভিব্যক্তির প্রবণতার গভীরতায় ভারতের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। আর এরা লুপ্ত হলেও ভারত বেঁচে থাকবে, উন্নতি করবে, চারদিকের জগতের জীবন্ত সজীব প্রভাবে সাড়া দেবে এবং তার সামনে দেখবে উন্নতি ও পূর্ণতার দীর্ঘ পথ। মিশরের শিল্প ও স্থাপত্য খ্রীষ্টযুগের চার হাজার বছর আগেকার। ক্রীটের ইতিহাস একরকম পুরনো; ব্যাবিলনের বয়স কত, কে বলবে? কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, এসব সভ্যতা যখন পরিণত, তখনো ভারত গড়ে উঠছে। জীবতাত্ত্বিকরা বলেন, দীর্ঘ শৈশব অভিব্যক্তির উন্নতির সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মিশর তার অস্বাভাবিক আবহাওয়ার দ্বারা শিল্প ও স্থাপত্যকে জাতীয় অস্তিত্বের চরম প্রকাশে নিয়ে গিয়েছিল। সম্ভবতঃ অতবছর আগেই ভারত উপনিষদের স্বপ্ন ও দর্শনে নিজের শক্তি নিয়োগ করেছে। শহর ধুলো হয়ে যেত, কালের কোপে মন্দির ও মূর্তি অণুমাত্র হয়ে যেত। সবচেয়ে কম স্থায়ী, নশ্বর উপাদানে মুদ্রিত মানব-ভাবধারা তবু আমাদের প্রাচীন সব প্রমাণের মধ্যে সবচেয়ে স্থায়ী। কে বলতে পারে, ভাল কাজ করিনি? প্রত্যেক পুরুষ আমাদের ভূর্জপাতার দলিল নষ্ট ক'রেছে, তবু একলক্ষ পুরুষ তাদের সত্যকে আরও সুনিশ্চিত করেছে। মীশর, গ্রীস, ক্রীট বা ব্যাবিলনে কোন্ সময়ে ভারতের নামের যথেষ্ট গভীরতা ছিল, তা অত সুদূর অতীতে আমরা জানতে পারব না। ইউরোপে ইতিহাসের ঊষাকালে তার ভাবধারা ও পাণ্ডিত্য সভায় শ্রদ্ধায় লোকের মনে স্থান পেত। চতুর্থ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডারকে তাঁর বৃদ্ধ শিক্ষক তাঁকে একজন ভারতীয় পণ্ডিত এনে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন। যে সব কাজ ঐতিহাসিক ভাবধারায় উল্লেখযোগ্য,

সেই সব আন্তর্সাম্প্রদায়িক, আন্তর্জাতিক, রাজনৈতিক কাজ যদি ভারত অপেক্ষাকৃত দেরীতে শুরু হয়ে থাকে, তাহ'লে ভারতীয় মনে অসন্তোষের কোন কারণ নেই। সব প্রাচীন জাতির মধ্যে ভারত এখনও তরুণ, এখনও উন্নতিশীল, এখনও অতীতে তার দৃঢ়মূল রয়েছে, সে আন্তরিকভাবে ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য চেষ্টা করছে। সে কোন জাতির পক্ষে এটা কি যথেষ্ট গৌরবময় নয়?

আবার, এই অবস্থা যখন আইনতঃ স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে, তখন আমাদের সন্দেহ নেই যে, এর ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অন্ধকার থেকে অবিরাম নতুন উপাদান নিয়ে আসা হবে ইতিহাসের আলোকিত চক্রের মধ্যে। ছাত্ররা যদি সামাজিক ভাবধারায় সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করে, অর্থাৎ, তারা যদি ঘটনার আড়ালে মানবিক ও মনস্তাত্ত্বিক তথ্যগুলি ভাবতে অভ্যস্ত হয়, তাহ'লে এটা আরও অবিরাম রূপায়িত হবে। এর ফলে তারা শিখবে, কখন প্রাচীন আখ্যান-কাব্যে ব্যক্তি নামের জায়গায় সম্প্রদায় ও জাতির নাম বসিয়ে নিতে হবে, বা, কখন একটা লড়াইকে স্থান-পরিবর্তন ও জয়লাভের যুদ্ধ ব'লে মনে করতে হবে। এই ভাবে যে মাত্রাবোধ দেখা দেবে, তার দ্বারা ওরা বিশেষ যুগের শক্তিগুলির গতি ও প্রবণতা পরিমাপ করতে পারবে। কোথাও বাড়ানো, কোথাও কমানো দরকার, কিন্তু যে সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাধারায় অভ্যস্ত, সে শুধু এ কাজ ঠিক ভাবে করতে পারবে।

ভারতের সীমান্তের ওপার থেকে আসা লোকজনের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ বিচার করতে গেলেও সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গীর দরকার। খুব অল্প লোক জানে যে, মানব সমাজের শুরুতে স্ত্রীলোক ছিল পরিবারের কর্ত্রী, পুরুষ নয়। যে রাণীদের এখন আমরা খাপছাড়া মনে করি, তাদের ঐতিহ্য রাজাদের চেয়ে প্রাচীন। কতকগুলি জাতির ক্ষেত্রে এই প্রাচীন মাতৃতন্ত্রের চিহ্ন এখনও গভীরভাবে রয়েছে। আর্যদের মত অন্যরা অনেকদিন এ নিয়মকে ত্যাগ করেছে। আর জগতের কয়েকটি সম্প্রদায় এখনও অল্পবিস্তর এখনও এই দুটি প্রথার মাঝখানে রয়েছে। এই সব বিভিন্ন স্তরের চিহ্নের সঙ্গে গভীর পরিচয় থাকলে, তবে এশিয়ার ইতিহাসের যথার্থ সূত্র পাওয়া যাবে। সেই ইতিহাস জানলে তবে আমরা ঠিকমত কালের ব্যবধানকে পরিমাপ করতে পারব। একটা প্রাচীন প্রথা কত পুরনো, তা বছরের হিসেবে বলা অসম্ভব হ'তে পারে। কিন্তু আমরা অনায়াসে বলতে পারি, প্রথাটা মাতৃতান্ত্রিক না পিতৃতান্ত্রিক অথবা দুরকমে সমাজ ব্যবস্থার মিশ্রণে তার উদ্ভব ঘটেছে কি না। দেবীভাবনা দেবভাবনার চেয়ে প্রাচীনতর, রাণীর ধারণাও রাজার চেয়েও পুরনো।

সাধারণ বস্তু এবং আমাদের প্রথার ওপরে তার প্রভাবের ইতিহাস স্বভাবতঃ মানব-সমাজের ওপরে প্রতিষ্ঠিত। এর অনেকটা আমরা নিজেরাই খুঁজে বার করতে পারি। যেমন, আমরা দেখতে পাই, গাধা ভারবাহী পশু হিসেবে ঘোড়ার চেয়ে

প্রাচীন। এক সময়ে পৃথিবীতে এই প্রয়োজনীয়, মানুষের অনুগত পশু ব্যতীত আর কোন বাহক পশু বা যান ছিল না। একথাটা একটু ভেবে দেখা যাক। বর্তমানে গাধার অবস্থা এবং বিভিন্ন আর্য-ভাষায় তার নাম খুঁজে দেখা যাক। এখন যেমন ঘোড়াকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়, তখন নিশ্চয় গাধাকে নিয়ে তা লেখা হত। সবরকম চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দ্রুততম, সবচেয়ে সাহসী ও মানুষের নিকটতম এই প্রাণীর সম্বন্ধে মানুষের প্রশংসার সীমা ছিল না। দেবী শীতলা গাধার পিঠে ঘোরেন; কারণ, যে সুদূর অতীতে দেবীর উদ্ভব, তখনও মানুষ ঘোড়াকে পোষ মানায় নি। দুধের মত ধবধবে সাদা গাধা ছিল রাজার শ্রেষ্ঠ বাহন, এখন সে শুধু ধোপার কাজে লাগে, অথচ, ইহুদী শাস্ত্রে এর প্রয়োজন ও গৌরব সম্বন্ধে অজস্র কাহিনী রয়েছে। খ্রীষ্টান কাহিনীতে রাজার প্রবেশের বিবরণে যে গাধার কথা রয়েছে, তাতে বোঝা যায়, অন্যান্য জায়গার চেয়ে আরব দেশগুলিতে গাধার নামের সঙ্গে প্রাচীন গৌরব বেশী জড়িত ছিল, তার সঙ্গে এ তথ্যও প্রমাণিত হয় যে, গাধা আফ্রিকার সর্বত্র পাওয়া যেত। ঘোড়া একবার পোষ মানবার পর মানুষ আর গাধার মালিকানা চাইত না এবং শুধু এই একটি তথ্য থেকে বোঝা যায় গাধা অনেক প্রাচীন। সেই সঙ্গে যখন আমরা আধুনিক মতামত পড়ি যে, জেব্রাকে পোষ মানানো যায় না, তখন আমরা বুঝতে পারি, বুনো জন্তুকে ক্রমশঃ পোষ মানাতে কত সময় ও চেষ্টা ব্যয় করা হয়েছে। আদিম মানুষ এত সহজে চেষ্টা ছাড়ত না। কিন্তু সে অত দ্রুত সফলতাও আশা করত না। আমাদের চারদিকে ছড়ানো অতি সাধারণ বস্তুর কাহিনীতে আমরা সামাজিক কল্পনার সাহায্যে সুদূর অতীতের ঘটনা খুঁজে নিতে পারি।

এইভাবে মন ঐতিহাসিক আবহাওয়ায় বাঁচতে শেখে। সে দেশে এবং বিদেশে যা দেখে তা শিখতে প্রস্তুত হয়। শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ ফল হল কঠোর সত্যের অনুসন্ধান। কিন্তু সত্য সর্বদা কঠোর হয় না, ভারতীয় ছাত্ররা যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে কাজ শুরু করে যে, তাদের মাতৃভূমির দীর্ঘ কাহিনীতে তাদের মনে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই জাগবে তাহ'লে তারা জ্ঞানের উন্নতিতে অনেক সাহায্য করবে। যথার্থ ব্যাখ্যা হলে, তাতে ভারতবর্ষ ও ভারতীয় জনগণের প্রতিষ্ঠা ও উৎসাহ দেখা না দিয়ে পারে না।
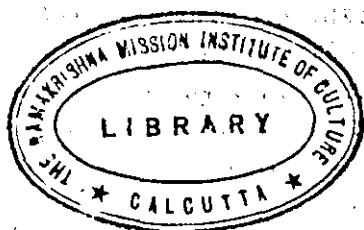
বৌদ্ধ নগরী

জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন গুরুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধধর্ম ভারতে কোন ধর্মসম্প্রদায়রূপে নয়, শুধু ধর্মীয় মতবাদরূপে দেখা দিয়েছিল, এ তত্ত্ব মেনে নিলে বুদ্ধের স্মৃতির এবং তাঁর নামাঙ্কিত পরবর্তী কালের মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত রাজা ও জনগণের সম্বন্ধ আমাদের নির্ণয় করতে হবে।

এ কাজ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের একটা নির্দিষ্ট ধারণা থাকা দরকার যে, বৌদ্ধ যুগে ভারতের কোন্ কোন্ জায়গায় প্রচুর লোক বাস করত। ভারতীয় নগর সত্যি সহজে ক্ষয় পায়, এ কথার প্রমাণস্বরূপ কিছু নাম মনে আসা শক্ত নয়। যেমন, ভুবনেশ্বর থেকে সাত মাইল দূরে ধৌলি পর্বত যারা দেখেছে, তারা ভাবতে পারবে যে, ঐ পর্বতে রাজকীয় চিহ্নস্বরূপ হাতীর মাথা আঁকা যে শিলালিপি রয়েছে, তা মূলতঃ ঐ পর্বতের চার দিকের গভীর অরণ্যে তৈরি হয়েছিল। এক নজর দেখলেই বোঝা যায়, নীচের মাঠকে ঘিরে আছে যে বৃত্তাকার খাত, একদা তা ছিল নগরের পরিখা, তাকে পিছন থেকে রক্ষা করত ধৌলি পর্বত এবং শিলালিপিটি ছিল এই নগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে, নিশ্চয় উপকূল থেকে একটি রাজপথ এসে ওখানে নগরে প্রবেশ করেছিল। নিঃসন্দেহে এই ধৌলি-নগরী কলিঙ্গের রাজধানী ছিল এবং অশোক যৌবনকালে এ রাজ্য জয় করেছিলেন। সেই যুগে এই নগরীর মূল্য ও গুরুত্ব বুঝতে গেলে আমাদের আগে মনে মনে পূর্বতন তাম্রলিপ্তি ও পুরীর ছবি এঁকে নিতে হবে, জানতে হবে, এই দুটি নগরের কোন্‌টি অশোক-যুগের লিভারপুল ছিল। তীর্থযাত্রার মত ধর্মীয় প্রথা প্রায়ই প্রাচীন রাজনৈতিক অবস্থার ফল, এতে সাধারণতঃ পূর্বতন যুগের কোন-না-কোন উপাদান থাকে। অতএব, অনুমান করা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব যুগে উত্তর ভারতে পুরী ছিল এক বৃহৎ নৌকেন্দ্র। তাই যদি হয়, তাহলে নিশ্চয় এখান থেকে ধৌলি হয়ে উত্তরে পাটলীপুত্র পর্যন্ত পথ ছিল। এই পথ দিয়ে ভারত ও প্রাচ্যের দেশগুলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বাণিজ্য হত। উড়িষ্যার কেশরী রাজাদের যুগে ধৌলিই শুধু ভুবনেশ্বরের পথ ছেড়ে দেয় নি, পুরীও বোধ হয় একই উপায়ে তাম্রলিপ্তি, বর্তমান তমলুকের কাছে হার মেনেছিল। দ্বিতীয়টিতে পঞ্চম শতাব্দীতে ফা-হিয়েন ফেরার পথে এসেছিলেন। অবশ্য, এভাবে, একটি বন্দরের বদলে আর একটি বন্দরের উন্নতি, এটা খুব ধীরে ধীরে হয় এবং এরকম ঘটনা ঘটতে হ'লে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, উপকূল অঞ্চলে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দর পর্যন্ত পথ ছিল। ঐ পথ ধরে -বালি যদি খোঁড়া যায়, তাহলে যে মাটির নীচে থেকে কত মন্দির আর অস্থায়ী শহর বেরোবে, বলা যায় না। এইভাবে, ইতিহাসের একটা যুগ প্রকাশ পাবে।

আবার, ধৌলি থেকে এই উত্তরমুখী বড় পথের একটা শাখা নিশ্চয় কোন

জায়গায় বারানসীর দিকে গিয়েছিল গয়া হয়ে, পুনপুন নদী বেরিয়ে, অনেকটা যে পথে পরে শের-শাহের ডাক যেত এবং এখন ট্রেন যায়।

মনে করা যাক, দু-হাজার বা আরও বেশী দিন পেরিয়ে আমরা আবার সেই যুগে ফিরে এসেছি, যখন ধৌলি ছিল সুরক্ষিত রাজধানী। হাতীর মাথাওয়ালা অনুশাসন সিংহদ্বারের বাইরে থেকে সদ্যোগঠিত শিলালিপিতে প্রচলিত ভাষায় সেই বিচক্ষণ, ন্যায়পরায়ণ সম্রাটের নাম ঘোষণা করছে, যিনি এক নিয়মে নিজের সঙ্গে জনগণকে যুক্ত করেছিলেন।

শিলালিপির শুরু হয়েছে এইভাবে, "আমি, প্রিয়দর্শী সম্রাট, অভিষেকের দ্বাদশ বছরে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেছি।" এতে অশোকের যৌবনে ঐ প্রদেশের সাম্রাজ্য-বাদী বিজয়ে রাজা দুঃখ প্রকাশ করে জনসাধারণকে আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাঁর শাসনের এই মূল অন্যায়কে শোধন করার জন্য তিনি দিন বা রাতের যে কোন সময়ে সব মানুষের কথা শুনতে প্রস্তুত। এতে, এছাড়া, নতুন সরকারের করা কিছু জনকল্যাণমূলক কাজের কথা বলা হয়েছে, যেমন, কূপখনন, পথ নির্মাণ, বৃক্ষরোপণ, ঔষধ বিতরণ। এতে জন-পর্যবেক্ষক বা নৈতিক অভিভাবক নিয়োগের কথাও বলা হয়েছে।

"প্রকৃত জ্ঞানলাভের" প্রসঙ্গে অশোক বলেছেন, তিনি যে যুগের মহান সন্ন্যাস ধর্মের এক গৃহী শিষ্য। সেই আনন্দময় পুরুষের তিরোধানের পর প্রায় তিনশো বছর চলে গেছে, কিন্তু, ভিক্ষু শ্রমণদের ইতিহাসে এ পর্যন্ত এইভাবে তাঁদের দ্বারা উপকৃত সাধারণ ভক্তদের মধ্যে কোন সম্রাটকে গ্রহণ করা হয় নি। তবু তাঁদের জাতিগঠনের কাজ ধীর হলেও নিশ্চিত গতিতে চলছিল। নির্বাণ-উপদেশের আলোকে আর্য বিশ্বাস ক্রমশঃ নিজেকে দৃঢ় ক'রে তুলছিল। সাধারণের মন থেকে বৈদিক দেবতারা সরে গেছেন। ভিক্ষু শ্রমণদের বৌদ্ধ ভাবধারা ছড়ানোর মাধ্যমে উপনিষদের ধর্মীয় ভাবধারা ছড়িয়ে পড়ছিল, সাধারণ মানুষের ধারণা হচ্ছিল, এঁরা আর্যদের বিশিষ্ট মতবাদের স্বীকৃত সমর্থক। সাপ, গাছ ও পবিত্র জলধারা সংক্রান্ত অস্পষ্ট কুসংস্কার ক্রমশঃ যুক্তির দ্বারা সংগঠিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য চিন্তাবিদ্‌দের শাসক ও স্রষ্টা ব্রহ্মার চারদিকে ঘনীভূত হচ্ছিল।

এইভাবে উচ্চতর সম্প্রদায়ের উন্নততর দার্শনিক চিন্তাধারা হিন্দু বিশ্বাসের অসাধারণ কৃতিত্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করছিল এবং সাধারণের প্রচলিত ধারণা ধীরে ধীরে সেই বিশ্বাসে স্থান পেয়ে উপনিষদে মহৎ ভাবধারার প্রবাহে যুক্ত হচ্ছিল। অন্য ভাবে বলতে গেলে, হিন্দুধর্মের রূপায়ণ শুরু হয়েছিল।

মাত্র তিন শতাব্দী আগে তিরোহিত সেই মহৎ জীবনের স্মৃতিই এই সব কিছুর মূল প্রেরণা, পীত বস্ত্র পরিহিত শ্রমণরা তাঁর প্রতীক। বুদ্ধ যদি একটা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ক'রে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দিতেন, নবজাত শিশুদের গ্রহণ করতেন, বিবাহ দিতেন, মুমূর্ষুকে উদ্ধার করতেন, তাহ'লে এখন হিন্দুধর্মের

সম্মিলিত সঙ্গীতে তাঁর ব্যক্তিগত উপদেশ একটা বিশেষ, বিরোধী সুরমাত্র হয়ে থাকত। কিন্তু তিনি শুধু একটা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। সে মতবাদের একমাত্র কাজ ছিল তাঁর উপদেশ প্রচার করা এবং প্রত্যেককে নির্বাণের বাণী শোনানো। বিবাহ ও আশীর্বাদের জন্য মানুষকে ব্রাহ্মণদের কাছে যেতে হত: বুদ্ধের সন্তানরা সামাজিক নিয়ম বজায় রাখার দায়িত্ব নিতেন না, কারণ, বুদ্ধের কাছে সমাজচক্রই গড়ে তুলেছে এই জগৎ, এই মায়া, এর হাত থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়াই সত্যের লক্ষ্য।

অতএব, চিরন্তন সত্যের স্রষ্টা সন্ন্যাসীদের কাজ কোন দিক্ দিয়ে ব্রাহ্মণ্য পুরোহিতবাদের নাগরিক কাজের পরিপন্থী ছিল না। অশোক যুগের ভারতীয় নগরীর সঙ্গে সন্ন্যাসের সম্পর্কের মাধ্যমে এই সত্য প্রকাশ পায়। ব্রাহ্মণ হল নগরের পুরোহিত, নগরে থাকে। বৌদ্ধ হল সন্ন্যাসী, মঠে থাকে। সব দেশে সন্ন্যাসীরা উত্তরাধিকারের বদলে স্থাপত্যের দ্বারা নিজেদের স্মৃতি বজায় রেখেছে। ভারতে এইসব বাড়ি প্রধানতঃ পাথর কেটে তৈরী, যেমন দক্ষিণে মহাবলীপুরম্, অথবা গুহায় তৈরী, যেমন ইলোরা বা অজন্তা। কিন্তু মূল ভাবধারাটি এক। প্রার্থনালয় সহ একটিমাত্র মঠের বদলে আমরা এখানে অনেকগুলি আলাদা আলাদা ঘর বা কক্ষশ্রেণী এবং অনেকগুলি মন্দির দেখতে পাই। বোঝা যায়, বছরের পর বছর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় মঠের কেন্দ্র রয়েছে। রাজত্ব, বিপ্লবের উত্থান-পতন হয়, কিন্তু এই মঠ থেকে যায়, একে কোন অবস্থা ছুঁতে পারে না, একমাত্র জনসাধারণের অনিবার্য স্থান পরিবর্তন ও তার আপন আধ্যাত্মিক শিখার নির্বাণ ব্যতীত।

অলঙ্কারের দিক্ দিয়ে মঠে প্রচলিত যুগের শিল্প দেখা যায়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সে বিশ্ববিদ্যালয়। আদর্শে সে সব মানুষের আধ্যাত্মিক সমতার ও মৈত্রীর মত অতি সামাজিক বা অতি নাগরিক ভাবধারাকে উপস্থাপিত করে। মঠের বাসিন্দারা ধর্মীয় ব্রহ্মচর্য পালনের শপথ নিত। এ কথাও আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, মঠের অবস্থান সর্বদা শহর থেকে একটু দূরে হত এবং পুরপিতাদের মঠের প্রতি সহানুভূতি থাকত।

তাই সম্রাট অশোক ও বুদ্ধের পরবর্তী উপাসকদের রাজত্বে ধৌলি নগরীর রাজকীয় মঠ খণ্ডগিরি ছিল শহর থেকে সাত মাইল দূরে। নাগরিক ক্ষমতা ছিল গয়ায়; মঠ ছিল বুদ্ধগয়ায়। বারণসী ছিল ব্রাহ্মণদের আবাস: সারনাথ ছিল সন্ন্যাসীদের আবাস। এলিফ্যান্টা ছিল এক রাজার রাজধানীর মন্দির,* কিন্তু কয়েক মাইল দূরে কান্হেরী নামক আর একটি দ্বীপে ছিল ঐ রাজ্যের মঠ।

এই সব উদাহরণ এবং মঠগুলির বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা আশা করতে পারি যে, বৌদ্ধযুগের যে কোন গুরুত্বপূর্ণ শহরের সঙ্গে যুক্ত মঠ থাকত শহর থেকে কিছু দূরে। এখন প্রাচীন অনেক জায়গায় এরকম বহু শহরের অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব। যেমন, একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভৌগোলিক কারণে বারাণসী

* এলিফ্যান্টা অনেক পরবর্তী যুগের।

বড় হয়েছিল, এলাহাবাদকে বিশিষ্ট করারও সেইটিই কারণ। অনুরূপভাবে, আশা করা যায়, যমুনার তীরে মথুরা ও গঙ্গার তীরে হরিদ্বারে প্রাচীন গুরুত্বের চিহ্ন পাওয়া যেতে পারে। বর্তমান যুগে, আমরা প্রয়াগের বাইরে সাধুদের আবাসরূপ নির্বানিকাল জায়গাটি দেখি। হরিদ্বারের কাছেও কি হৃষীকেশ নেই? ইলোরার গুহার কাছে রয়েছে রোজা শহর। তবে এ শহরটাকে মুসলমান শহর বলে মনে করতে হবে, কারণ, এ শহরের অধিকাংশ বাসিন্দা ভিক্ষুক-সন্ন্যাসীরা (ব্রহ্মচারী নয়) আওরংজেবের সমাধির আশেপাশে থাকে। পাশের যে রাজধানী ইলোরার দেখাশোনা করত, সেটি সম্ভবতঃ ছিল দেবগিরিতে, এখন যার নাম দৌলতাবাদ।

এই ঐতিহাসিক সামান্যীকরণের আলোকে অবশ্য বিচ্ছিন্ন যোগসূত্রের অনুসন্ধান আমাদের সবচেয়ে মুগ্ধ করে। কোন্ শহর, কোন্ রাষ্ট্র অজন্তাকে গড়েছিল? সাঁচীর ধর্মশালার সঙ্গে কোন্ শহর যুক্ত ছিল? অমরাবতীর ক্ষেত্রে কোথায় শহর আর কোথায় মঠ ছিল?

বুদ্ধ-উপাসক রাজত্বে ও রাষ্ট্রে এরকম রীতি একবার শুরু হ'লে আমরা যাকে হিন্দুধর্ম বলি, তার ভাবধারাগুলি নির্দিষ্টভাবে প্রচলিত হয় এবং পরবর্তী কালে তার অনুকরণ হয়। হয়ত বৌদ্ধ মতবাদ যখন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, তখন জৈনধর্ম প্রাচীন মঠে আনক সময়ে সেই জায়গাটা নিয়ে নিচ্ছিল। অন্ততঃ সারনাথে মনে হয়, এরকম ঘটেছিল, বোধ হয় খণ্ডগিরিতেও ঘটেছিল। কিন্তু ইতিহাসের অনেক পাতাকে যদি আমাদের কাছে স্বচ্ছ ক'রে তুলতে হয়, তাহ'লে ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ জৈনদের সম্পর্কের সমগ্র ইতিহাসকে এশীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখতে হবে, ইউরোপীয় দৃষ্টিতে নয়।

এই প্রসঙ্গে একটা খুব আকর্ষণীয় প্রশ্ন দেখা দেয়, সেটা হল, পাটলীপুত্রের ক্ষেত্রে এই সমতা কোথায়? রাজগীরে গিয়ে আমরা দেখি, নন্দরাজাদের প্রাচীন রাজধানীর সামনে পরবর্তী কালে গড়ে উঠেছে বাংলার ঐতিহাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, নালন্দা, যার কাছে হিউএন সাং এত ঋণী ছিলেন। কিন্তু পাটলীপুত্রের কি হয়েছিল? আমরা কি ধরে নেব যে, ঐ সাম্রাজ্যের রাজধানীর কাছাকাছি ভক্তি ও শিক্ষার কোন সরকারী আশ্রম ছিল না? যদি থাকে এবং যদি "পাঁচ পাহাড়" জায়গাটা সেই ধর্মীয় মহাবিদ্যালয়ের স্থান হয়, তাহ'লে তার রাজধানী কোথায় ছিল?

এই সামান্যীকরণের সাহায্যে আবার আমরা নির্দিষ্ট চিন্তার উপযুক্ত জায়গা ও ঘটনা পাচ্ছি, এতদিন বিভিন্ন যুগের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্পর্কে যা সম্ভব হয় নি। এই সব বিরাট অতিনাগরিক ব্যবস্থার বিভিন্ন কাজ কি কি ছিল? অজন্তার জন্য হিন্দুর চেয়ে অক্সফোর্ডের জন্য কোন ব্রিটিশ বেশী গর্বিত হতে পারে না। ইউরোপের "শহর ও শিক্ষা"র যে চিরন্তন বৈপরীত্য, প্রাচ্যে তা কখনও কলহ-বিবাদের উৎস হয় নি, কারণ প্রথম থেকে সবাই দুটির পৃথক সত্তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, দুয়ের ভিন্ন উদ্দেশ্যের জন্য ভৌগোলিক নির্দিষ্ট ব্যবধানের দরকার ছিল। বুদ্ধ-গয়া,

সারনাথ, ধৌলি, সাঁচী ইত্যাদি রাজকীয় যে মঠগুলি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, অশোকেরও রাজত্বের আগে, সেগুলিতে জীবনযাত্রা কিরকম ছিল? সমগ্র সম্প্রদায়ের কাছে এই মঠগুলি ছিল গণতন্ত্রের প্রতীক, শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক জীবনে প্রত্যেকের অধিকারের প্রতীক। এ কথা ভাবতে হবে যে, যুবকদের শিক্ষায় নিশ্চয় এদের প্রভাব ছিল। কিন্তু নিঃসন্দেহে এদের শিক্ষাগত প্রকৃত মূল্য ছিল এদের চরিত্রে, আজকাল যাকে আমরা বলি, স্নাতকোত্তর বিশ্ববিদ্যালয়।

বহু শতাব্দী আগে পতঞ্জলি তাঁর 'যোগভাষ্যে' যে সব গবেষণার কথা লিখে গেছেন, সে কাজ এখন চালিয়ে যেতে হবে। প্রাচীন জগতের বিজ্ঞানের অন্যতম অসাধারণ প্রমাণ এই বই। যে শিক্ষা ৩০০-৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গুপ্তদের স্বর্ণযুগকে সম্ভব ক'রে তুলেছিল, সে শিক্ষার উদ্ভব এখানেই ঘটেছিল। আমাদের প্রাচীন মঠ-মহাবিদ্যালয়-গুলির কথাও ভাবতে হবে। ফা হিয়েন (৪০০ খ্রীঃ) এবং হিউয়েন সাং (৬৫০ খ্রীঃ) দু হাজার থেকে দেড় হাজার বছর আগে এসেছিলেন, এঁরাই শুধু ভারতীয় শিক্ষার উৎসধারা পান করতে আসেন নি। এদের দুজনের ভ্রমণের বই বিখ্যাত হয়ে গেছে। কিন্তু এঁরা তীর্থযাত্রী শিক্ষার্থীদের বিরাট সারির মাত্র দুজন। এরকম ছাত্ররা মঠেই আসতেন। আবার এই সব মঠ থেকেই প্রচার করা বিদেশে যেতেন। কোন জাতি কখনো একজন মাত্র শিক্ষকের দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। আইরিশ ভাষায় 'প্যাট্রিক' কথার অর্থ 'প্রার্থনারত মানুষ', অতএব যে খ্রীষ্টান প্রচারকরা প্রথম যুগে আয়ারল্যাণ্ডে ব্যাপ্টিজম্ ও ক্রুশ বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, গর্বিত সন্ন্যাসীর নিশ্চয় তাদের একজন অথবা এদের সকলের প্রতীক। অনুরূপভাবে, আমরা জানি, ইতিহাস দ্বাদশ শতাব্দীর মহিন্দ, নাগার্জুন ও বোধিধর্মকে যেমন বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখায়, তাঁরা তা ছিলেন না। তাঁরা ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার প্রবাহে কয়েকটি বিশিষ্ট উপাদান-রূপে ভারতের মহান যুগে শান্ত মঠজীবন থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য জগতের দিকে বিচ্ছুরিত হয়েছিলেন। প্রায়ই বলা হয়, খ্রীষ্টধর্মও হয়ত পারস্য ও সিরিয়ায় প্রচারিত এরকম প্রচার কাজের পরবর্তী ফল।

সব মঠগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে অবস্থিত—এই সুন্দর পরিবেশে চিন্তা, ও শিক্ষা, ধ্যানের সংহত শক্তি এবং শিল্প ও সাহিত্য প্রথার অপূর্ব উৎসাহ বিস্তারলাভ করত—ফলে, যে ভারতকে আজ আমরা জানি, সেই ভারত গড়ে উঠেছে। যে স্বপ্নগুলি সমাজে প্রতিফলিত হয়ে আমাদের যুগের সামাজিক আদর্শরূপে দেখা দিয়েছে, এখানে সেই সব স্বপ্ন দেখা হয়েছে। যখনই ভারতের মহিমা একটা চরম মুহূর্তে পৌঁছোয়, তখন শহর ও বিশ্ববিদ্যালয়, সমাজ ও ধর্মমত, কর্মজীবন ও চিন্তাজীবনের মধ্যে যে বৈপরীত্য দেখা দেয়, তার মহৎ নিয়ম এখানে গড়ে উঠেছিল এবং বারবার তা দেখা দেবে। অবশ্য বিপরীত হলেও এগুলি পরস্পরের পরিপূরক। আধ্যাত্মিকতা গৌরবকে নিয়ে আসে। মঠজীবন নাগরিক শক্তি গড়ে তোলে। এই পারস্পরিক সম্পর্কের সম্মুখীন হয়ে আধুনিক ভারতের সন্তানরা উৎসাহিত হ'তে পারে। কারণ,

ভারতীয় বস্তুর অন্যতম প্রকৃতিতে এ ধারণা দৃঢ় যে, বৈরাগ্যের বা ধর্মের মহৎ ক্ষণ আসন্ন জয়ের মুহূর্তকে ঘোষণা করে।

রাজগীর : প্রাচীন ব্যাবিলন

ওপরে এগিয়ে চল। আমাদের কয়েক সপ্তাহ থাকার জন্য যে জায়গা দেওয়া হয়েছে, সেখানে পৌঁছানোর জন্য আমরা খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠছি দীর্ঘ সিঁড়ির ধাপগুলো যেন ফুরোচ্ছে না; শেষে যখন পৌঁছোলাম, দেখি ওটা এক দস্যু-জমিদারের বাসগৃহ, আনুনোয়ার রাজাদের প্রাচীন দুর্গ-প্রাসাদ। সত্যিই ওটি দস্যু-জমিদারদের বাড়ী, পাহাড়ের মাঝামাঝি জায়গায় সাধারণের চোখের আড়ালে থাকলেও বাড়ার সামনে এক বিরাট বিস্তীর্ণ অঞ্চল দেখা যায়। আশ্চর্যরকম ছোট, পশ্চিমের লোকদের দৃষ্টিতে নিরাপত্তাহীন এই বাড়ীটার দুটো অংশ আছে—বাইরের লোকের অপ্রবেশ্য একটা অন্দরমহলের উঠোন, তার মাথায় বিরাট ছাদ; আর, বাইরে একটা খোলা চত্বরের দু'দিকে কয়েকটি ঘর। বাড়ীটার সামন্ততান্ত্রিক, মধ্যযুগীয় চেহারাটা যে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, এর অপূর্ব সৌন্দর্য তা বজায় রেখেছে। কিন্তু এসব চিন্তার চেয়েও বড় হল যে, আমরা যেখানে একুশ দিন থাকব, সেখানে মানুষ একটানা পঁচিশ থেকে ত্রিশ শতাব্দী বাস করেছে। কারণ, যে বিরাট সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা খাড়া পাহাড়ে উঠলাম, তা নিশ্চয় রাজগীরের প্রাচীন প্রাচীরের ভিত্তির ওপরে গঠিত এবং আনুনোওয়ার জমিদারদের প্রথম পুরুষ পারিবারিক নিরাপত্তার জন্য একটা ছোট উপত্যকায় ঐ প্রাচীরের প্রহরীকক্ষের থামকে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন। আমাদের নীচে রয়েছে আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, সেই পথে একটা নদী আমাদের পাহাড়ী সিঁড়ির নীচে পরিখার সৃষ্টি করেছে। সামনে এক বাঁকা সিঁড়িপথ আমাদের আধুনিক রেলওয়ের ভাষায় "লুপ" সৃষ্টি ক'রে, রাজগীরের যে মন্দির ও উষ্ণ প্রস্রবণগুলি এখনো বার্ষিক হিন্দু তীর্থযাত্রার লক্ষ্য হয়ে রয়েছে, সেগুলিকে রক্ষা করছে। বাইরে খোলা জায়গায়,—এই স্বচ্ছ পরিবেশে জায়গাটা খুব কাছে ব'লে মনে হয়, আসলে হাঁটাপথে ওটা বোধ হয় একমাইল দূরে,—রয়েছে প্রাচীন রাজগৃহ, রাজাদের নগরী বা বাসস্থান, আধুনিক রাজগীর গ্রাম।

এখনই গ্রামবাসীরা আমাদের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করছে। আমাদের সঙ্গে যে ভৃত্য এসেছে তার জন্মস্থান কয়েক মাইল দূরে, তার বাড়ীর মেয়েরা আমাদের সকালের খাবার নিয়ে এসে আতিথ্য প্রকাশ করে। আমাদের নিরাপত্তার জন্য চাষীরা বাইরের ঘরে পাহারা দিচ্ছে এবং কাছাকাছি জায়গার একটি ছোট ছেলে আমাদের ভৃত্য হওয়ার দাবী জানাচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমরা যেন প্রাচীন নিনেভের সেমিরামিসদের অতিথি! আমরা যেন ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপে তাঁবু ফেলে প্রাচীন বাসিন্দাদের বংশধরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছি।

আমাদের সামনে প্রসারিত অঞ্চলটি কি অপূর্ব! আমাদের আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথের প্রান্ত থেকে বড়দিন বা তার কাছাকছি সময়ে ক্ষেতগুলি ধান ও অন্যান্য ফসলের সবুজ রঙে ভরে যায়, তার মাঝে মাঝে আফিং ক্ষেতে সাদা ফুল ফুটে থাকে। কিন্তু এখন অক্টোবরের ঋতু পরিবর্তনের পর ক্ষেতগুলিকে দেখাচ্ছে বহুরঙা মাটির ছোপের মত—গোলাপী, খয়েরি, লাল—আমাদের বুদ্ধের কথা মনে পড়ছে, তিনি শিষ্যের বহুরঙ তালি দেওয়া পোষাক দেখে একটু হেসে অথচ সস্নেহ কোমলতায় বলেছিলেন যে, ওটা দেখে তাঁর রাজগীরের ধানক্ষেতের কথা মনে পড়ছে।

আমাদের পেছনে (কিছু দূরত্বে) পাহাড়গুলো বৃত্তাকারে ঘিরে রয়েছে, এখানে রাজাদের প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে—তার প্রতিটি অংশ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। আমরা যেন বাজারের সারিগুলি দেখতে পাচ্ছি। রাস্তা-পথ সম্বন্ধে এ কথা বললে মিথ্যে বলা হবে না যে, যুগে যুগে তাদের অবস্থানের প্রায় কিছুই পরিবর্তন হয় নি; তবু এ তথ্যটা তেমন কেউ লক্ষ্য করেছেন বলে আমি জানি না। অন্ততঃ এখানে এই রাজগীরে, যেখানে প্রতিদিন রাখালরা শতশত গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া ঐ প্রাচীন অঞ্চলে নিয়ে যায়-আসে, সেখানে বড় রাস্তাগুলির অধিকাংশ সেই সুদূর অতীতের মতই আছে। যেমন, যে বড় পথ শহরের ভেতরে চলে গেছে, তা এখানে রয়েছে, তার মাঝে মাঝে প্রাসাদের প্রাচীর, দুর্গ, দরজার চিহ্ন রয়েছে; এখানে প্রাসাদের পেছনে রয়েছে রাজাদের ক্রীড়াঙ্গনের চিহ্ন, তার অপূর্ব কৌশলে তৈরী অলঙ্কৃত ফোয়ারাগুলি আজও ঠিক রয়েছে! এই ছোট পার্বত্য অঞ্চলও তার পথে সত্যি অস্বাভাবিক পরিমাণে জল-সংক্রান্ত কারিগরি দেখা যায়। মনে হয়, উষ্ণ প্রস্রবণের খ্যাতিই হয়ত এই স্বাভাবিক সুরক্ষিত অঞ্চলে রাজাদের বাসের কারণ ছিল এবং তার পর রাজাদের প্রধান কাজ হয়েছিল এখানকার জলধারার কৃত্রিম উপায়ে উন্নতি। এমন কি, এখন আমাদের প্রাচীর-ঘেরা পরিখাবেষ্টিত দুর্গের নীচে একটা ফাঁকা পুকুর রয়েছে, দু-হাজার বছর আগে খুব সম্ভবতঃ একটা উদ্যানের মাঝে ঐ পুকুরে পদ্ম ফুটত। এখন যে নদী উপত্যকা দিয়ে বয়ে চলেছে, সেটা স্বাভাবিক নদী হলেও দুটি, এমন কি তিনটি ধারাতেও তাকে ভাগ ক'রে জালের মত ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এতে বোঝা যায়, প্রাচীন ভারতে সেচের সমস্যার দিকে কত নজর দেওয়া হত। যার ফলে জলবিজ্ঞানের এত অপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। প্রাচীন রাজগীরের প্রায় দু-হাজার বছর পরের এক স্মৃতিসৌধ বহু দূরে মধ্যভারতে রয়েছে, তার অলঙ্কৃত কৃত্রিম ফোয়ারাতে এখানকার মত প্রযুক্তিগত প্রতিভা, সেইরকম সৌন্দর্য ও অসাধারণত্বের রাজকীয় ভাবধারা দেখা যায়। উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের লোকরা যখন গায়ে নীল রং মাখত, তখন ভারতীয় জনগণ এই আড়ম্বরের মধ্যে বাস করেছে। আর ভারতীয়রা এই অতীতের জন্য গর্ব করতে পারে নিশ্চয়।

পৃথিবীতে রাজগীরের মত এত প্রাচীন জায়গা খুব কম আছে। এই জায়গা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা গেছে এবং অনেক কিছু নিরাপদে অনুমান করা যায়। খুব

সম্ভব সময়টা ৫১০ খ্রীঃ পূঃ—সে যুগে ব্যাবিলন, ফিনিশিয়া, মিশর এবং সেবা ছিল সবচেয়ে জীবন্ত ও গুরুত্বপূর্ণ—৫৮০ খ্রীঃ পূঃ নাগাদ ঐ উপত্যকামুখী পথ ধরে একজন এসেছিলেন, যাঁর দেহ ছিল অনুভূতি ও চিন্তায় জ্যোতির্ময়, যার ফলে তিনি সাধারণ জগৎ থেকে ইতিহাসের চেতনায় উত্থিত হয়েছিলেন।

হয়ত তিনি ভোরবেলা এসেছিলেন। কারণ, বইগুলি বলে, তখন রাজার যজ্ঞের জন্য বিশাল সংখ্যক ছাগল নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। হয়ত যজ্ঞটা দুপুরে হওয়ার কথা ছিল। কিংবা তিনি হয়ত গোধূলির সময়ে এসেছিলেন যজ্ঞের আগের দিন, রাখালরা হয়ত সে রাতটা পশুগুলিকে প্রাসাদের বাইরে বেঁধে রাখবে বলে নিয়ে যাচ্ছিল। যাই হোক, তিনি এসেছিলেন, অনেকে বলে কাঁধে একটা খোঁড়া ছাগলছানা নিয়ে, তাঁর পেছনে ছিল অজস্র ছোট ছোট খুরের শব্দ। তিনি করুণায় আর্দ্র হয়ে এসেছিলেন। এই যে মানুষের "ক্ষুদ্র ভায়েরা" মানুষের মত আনন্দ-বেদনা, জীবন-মৃত্যুর জালে বন্দী হত, মানুষের মত প্রেমে-যন্ত্রণায় অধীর হত, অথচ বাক্‌শক্তির অভাবে সে আকুলতা প্রকাশ করতে পারত না, মুক্তির বাসনাও জানাতে পারত না, সেই অসহায়দের জন্য অন্তরে সমবেদনার বন্যা দেখা দিয়েছিল। নিশ্চয় তাঁকে ঘিরে ধরে সেই শান্ত, বিস্মিত, চতুষ্পদ প্রাণীগুলি তাঁর গায়ে বার বার গা ঘষছিল। কারণ, যে নীরব ভালবাসা তাদের মুক্ত জীবনে বাধা দেয় না, পশুরা সেই ভালবাসার দ্বারা আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত হয়। জগতের সব কাহিনীতে আমরা দেখি, ওরা বড়দিনের নীরবতাকে উপলব্ধি করে, শিশু ধ্রুবের ব্যাকুল প্রশ্নে সাড়া দেয়, রাজগীরের প্রাসাদ-অভিমুখী পথে ভগবান বুদ্ধের চোখে ওদের বাঁচানোর জন্য অসীম আকুলতা দেখতে পায়।

ঐ জায়গায় কিছুদিন থাকার পর আমরা লক্ষ্য করলাম যে, আমাদের নীচে নদীর একটা চড়ায় প্রায়ই সন্ধ্যায় গ্রামের চিতা জ্বলতে দেখা যায়। শহরের বাইরে নদীর ধারে মৃতদেহ দাহ করা ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন প্রথা। কিন্তু এই বালির চর গ্রাম থেকে দূরে। এত অসুবিধাজনক জায়গা আর ওদের পক্ষে কি হতে পারে! হাঁ! জবাব পাওয়া গেছে; এখন বিংশ শতাব্দীতে এই কৃষকদের যেখানে শ্মশান, এখানে নিশ্চয় ওদের পূর্ব-পুরুষদের শ্মশান ছিল পঞ্চম শতাব্দীতে, প্রথম শতাব্দীতে—তারও বহু শতাব্দী আগে—হয়ত তখন এ জায়গা প্রাচীন রাজগীর শহরের ঠিক বাইরেই ছিল। আগে যখন এখানে শ্মশানের অস্তিত্ব আমরা জানতাম না, তখন এই গাছগুলোকে অরণ্য বলে মনে হত, এ এক অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গী, হয়ত অদ্ভুত এক উদাসীনতা। কাজেই এটা লক্ষ্য করার আগে কতদিন গেছে সেটা ভাববার চেষ্টা করব না। রাস্তা দিয়ে শশ্মান-ঘাটের প্রান্তে যেতে যেতে আমাদের মধ্যে একজন প্রাচীন রাজগীরের ঘাটের ভাঙা সিঁড়ি এবং একত্র জড়াজড়ি ক'রে থাকা তেঁতুল ও অশ্বত্থগাছ দেখতে পেলেন। আরও কতদিন চলে গেছে জানি না, হঠাৎ আমাদের একজনের ধারণা অনুযায়ী আমরা আবিষ্কার করলাম যে, কাছে যে ভাঙা ইটের স্তূপ সেটা ছিল শহরের প্রাচীন দ্বার, নিশ্চয় এই পথ দিয়ে বুদ্ধ ছাগলসহ এসেছিলেন

এবং দেখলাম কয়েক ফিট দূরে ধুলোয় একটা প্রাচীন স্তূপের গোল মাথা পড়ে আছে।

দরজা পেরিয়ে রঙ্গমঞ্চের মত উপত্যকার মুখে দাঁড়িয়ে আমরা দেখলাম যে, শহর থেকে যে নদী একটি ধারায় বেরিয়েছে, তা দুটি জলধারার মিলনে গঠিত, সেই দুটি ধারা এই রাজধানীকে পরিখার মত ঘিরে রেখেছে, চারদিকের পর্বতের প্রাচীর ও দেয়াল ছাড়াও। এখানে দুটি ধারা এক হয়েছে। যে ধারা অম্বাপালী, ভারতীয় মেরি ম্যাগডালেনের উদ্যানের বাঁদিক্ থেকে আমাদের দিকে প্রবাহিত হয়ে বুদ্ধের জীবনীতে বর্ণিত বহু ব্যক্তির বাসস্থানের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে, তাকে অনাবিষ্কৃত রেখে আমরা ডানদিকের ধারাটির দিকে তাকাতে পারি।

এখানে রয়েছে এক অনাবিষ্কৃত জগৎ। পথটা চলে গেছে নদীর দিকে, কিন্তু সে পথকে অনায়াসে বেঁধে রেখেছে পাথরের ধাপ, ওখানে এখনও প্রাচীন স্নানের ঘাটের ভগ্নাবশেষ চেনা যায়। স্পষ্টতঃ আজকের মত পঁচিশ শতাব্দী আগেও স্নান ও স্নানের ঘাট ভারতীয় জীবনে সমান প্রয়োজনীয় ছিল। তারপর পথটা ডানদিকের পাহাড়ের সারি থেকে মোটামুটি পঞ্চাশ গজ ব্যবধান রেখে জলরেখাকে অনুসরণ ক'রে চলেছে। শহরের মাঝামাঝি এই পাহাড়ের বুক চিরে দেখা দিয়েছে এক বিরাট গুহা, আমার মনে হয়, অনেকের ধারণা, খুব সম্ভবতঃ এইটিই শতপর্ণী গুহা, যার বাইরে প্রথম বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল মহানির্বাণ বা বুদ্ধের তিরোভাবের পরের বছরে। এখন গ্রামের চাষীদের কাছে জায়গাটি 'সোন-ভাণ্ডার" বা 'স্বর্ণভাণ্ডার' নামে পরিচিত, এটা প্রাচীন নামের আধুনিক উচ্চারণ হতেও পারে, নাও হতে পারে। এই গুহার অভ্যন্তর পালিশ করা, খোদাই করা নয়। এর ভেতরে রয়েছে আমার দেখা প্রাচীনতম স্তূপ, দেখে মনে হয়, যেন কোন ডাকাতদল এটা নিয়ে যাওয়ার সময়ে বাধা পেয়েছিল। বাইরেটা ঝোপে-লতায় অর্ধেক ঢাকা। কিন্তু এখনও গায়ে গর্ত দেখলে বোঝা যায়, সেখানে একসময়ে খোদাই-করা কাঠের কারুকাজ লাগানো ছিল। এখনও গুহার মুখে দাঁড়িয়ে দূরে, শহরের মাঝে, একটা স্তম্ভ দেখতে পাওয়া যায়, ফা-হিয়েন ৪০৪ খ্রীষ্টাব্দে একটা ছোট স্তূপের মাথায় কিংবা প্রাসাদের পূর্ব-দিকে এই স্তম্ভকে অক্ষত দেখেছিলেন।

তখন এই গুহা ছিল প্রাচীন রাজগীরের মন্দির। এখানে বুদ্ধ নিশ্চয় বিশ্রাম নিতেন, ধ্যান করতেন বা শিক্ষা দিতেন। আমাদের দলের একজন বললেন, নিশ্চয় এর সঙ্গে প্রাসাদের সংযোগকারী একটা পথ ছিল। এই সূত্রের ওপরে নির্ভর ক'রে আমরা সেই পথ খুঁজে বার করার জন্য বুনো ঝোপঝাড় ঠেলে এগিয়ে চললাম। গুহার বাইরে দেখলাম প্রাচীন অ্যাসফল্টের একটা সমান মেঝে, যেন ভেনিসের প্লাজা ডি সান মার্কো। এটা নিশ্চয় শহরের চত্বর ছিল, এখানে আমরা কল্পনায় ৫৪৩ খ্রীঃ পূঃ-এর প্রথম সঙ্গীতির দৃশ্য দেখলাম। আমরা একটা প্রাচীন 'চীনা সূত্রে' রাজগীরের একটা জায়গার কথা পড়েছি—সেখানে ময়ূরদের খাওয়ানো হত।"

"যেখানে ময়ূরদের খাওয়ানো হত", প্রথম এই কথাগুলি পড়ে আমরা কত কি ভেবেছিলাম। আর, আজ সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। কারণ, সেণ্টপল গীর্জার বাইরে যেমন পায়রাদের খাওয়ানো হয়, সে রকম একটা প্রাচ্য নগরীর মন্দিরের প্রবেশ-পথের সামনে অ্যাসফল্টের চত্বরেও নিশ্চয় খাওয়ানো হত, রোজ ময়ূরদের শস্য দেওয়া রাজকীয় মর্যাদা ও আভিজাত্যের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল।

অ্যাসফল্টের চত্বর নীচে নেমে নদী পেরিয়ে গেছে। কারণ, এখানে প্রাচীন সেতুর নীচে দিয়ে জল বয়। সেতুর তল একটু নেমে গেলেও আমরা তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেলাম। তারপর অনায়াসে এগিয়ে চললাম রাজকীয় প্রসাদের দিকে, চার কোণে চারটি স্তম্ভের দ্বারা এ প্রাসাদ স্পষ্টই চিহ্নিত। কিন্তু আবার সেতুর দিকে ফিরে দেখলাম, এই অ্যাসফল্ট পথেরই একটা রেখা আমাদের পথের পাশে নদীর তীর ধরে একটানা চলে গেছে, তবে ঐ অদ্ভুত ধ্বংসস্তূপ থেকে অনুসরণ ক'রে না এলে আমরা হয়ত এটা দেখতেই পেতাম না।

প্রাসাদের উল্টোদিকে এই নদীর মুখটা কি পেছনের দিকে পাহাড় দ্বারা সুরক্ষিত ছিল? যে পথ শহরের চত্বর থেকে ওপারে নদীর ঘাট পর্যন্ত এবং সেখান থেকে শহরের দরজা পর্যন্ত এসেছে—এটা কি প্রাচীন শহরের রাজপথ ছিল? দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে আর ভাবতে ভাবতে প্রায়ই আমরা এখনও অনাবিষ্কৃত কোন ভাঙা স্তূপ বা তার চিহ্ন দেখতে পাই। এখানে ফুটো পাথরের টুকরো কাত হয়ে পড়ে আছে, যেন নদীর ধারের পাঁচিলের বসার জায়গা ছিল। আবার দেখতে পাচ্ছি, সিঁড়ির চিহ্ন বা ভাঙা কারুকার্যের টুকরো। উল্টোদিকের তীরে এক জায়গায় মাটি আর গাছ-পালায় ঢাকা একটা ছোট খাদ নদীর তীর পর্যন্ত এসেছে, ওটা বাঁধানো বা অ্যাসফল্টের না হ'লে বোঝা যেত না যে, পম্পেই ও হার্কুলেনিয়ামের জন্মের আগে ওখানে একটা পথ ছিল—মনে হত, ওটা একটা গলি।

এই সব পথে যে বাড়ীগুলো থাকত, সেগুলো কেমন দেখতে ছিল? সেখানকার বাসিন্দাদের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? কতদিন শহরটা এখানে ছিল? কতদিন এ জায়গাটা বাসযোগ্য ছিল? এখন মলিন, নির্জন এই ভগ্নস্তূপ রাজধানীর গৌরবের চূড়ান্ত পরিবেশ কেমন ছিল? এরকম হাজার প্রশ্ন আমাদের মনে ভীড় ক'রে আসে, তার অনেকগুলিরই যে আমরা জবাব পাই, এটাও বিস্ময়কর। এক সময়ে পাহাড়ের গা-জোড়া ঝুলন্ত বাগান প্রাসাদ থেকে দরজা পর্যন্ত এবং তার পর পাহাড়ের গা বেয়ে সমতল পর্যন্ত আনন্দদায়ক দৃশ্য রচনা ক'রে রেখেছিল, ভারতীয় গ্রীষ্মের প্রচণ্ড বর্ষণধারা তাকে অনেকদিন নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছে।

তবু এখনও স্বাভাবিক পাথরের উঁচু স্তূপের মাঝে লাল পাথরের কৃত্রিম ছাদগুলো মসৃণ, সমান, এখনও ভ্রমণকারীরা হয়ত যেখানে দাঁড়ায়, সেখান থেকে রাজা বিম্বিসার তাঁর রাজত্বের গরিমা দেখতেন, অথবা, লোকে কষ্ট ক'রে দু এক জায়গায় পুরনো ক্রীড়াঙ্গনের পথ খুঁজে পায়, সেখান দিয়ে নিশ্চয় রাজার শিকারের দল অরণ্যের দিকে

যেত। সত্য বটে, আগেকার মত আজ আর পাহাড়ের গায়ে—মাথায় ঘন জঙ্গল নেই। যখন এ জায়গা ছিল স্বর্গ, রাজপ্রসাদকে ঘিরে থাকত রাজার বাগান, তখনকার উঁচু গাছ, ঘন অরণ্যের জায়গায় আজ রয়েছে বুনো গাছের ঘন ঝোপ, এখানে সেখানে পাথরের ফাঁকে আঁকাবাঁকা তালগাছ। এখনও ভাঙ্গা শহরের পেছনে পূর্ব ও দক্ষিণের পার্বত্য পথ থেকে আলাদা-করা অত্যস্ত পুরু দুটি পাঁচিল আমরা দেখতে পাই।

যে পাহাড় কেটে বিরাট সোন-ভাণ্ডার গুহা তৈরি হয়েছিল, তার গায়ে চৌকো ছিদ্রগুলির সূত্র ধরে আমরা মনে মনে প্রাচীন শহরের রূপ গড়ে নিতে পারি। কারণ, গুহার সামনের অংশে যে কাঠের কারুকার্য ছিল, তা এই ছিদ্রগুলিতে লাগানো থাকত। এখন, ভারতের পশ্চিমে বম্বে আর পুণার মাঝে কার্লে নামে একটা গুহা আছে, সেটা অনেক পরবর্তী যুগের হলেও এই এক পদ্ধতিতে তৈরি, সেখানে কাঠের সামনের কাঠের সামনের অংশ অক্ষত আছে। উপরন্তু, ফার্গুসন দেখিয়েছেন, ঐ কারুকার্যে একটা প্রাচীন রাস্তার ছবি আছে। তার থেকে আমরা জানতে পারি যে, পর পর নির্মিত বাড়ীগুলির দোতলার সম্মুখভাগে কাঠের বারান্দা, ঘর এবং সব রকম সুন্দর, অনিয়মিত কারুকার্যে সজ্জিত থাকত। সাঁচীর দরজায় সম্ভবতঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদাই-করা ছবিতে আমরা দেখি, গুহার ক্ষেত্রে এগুলির উদ্দেশ্য ছিল শুধু সৌন্দর্যবৃদ্ধি, বাড়ীর ক্ষেত্রে তা নয়। এর থেকে বিম্বিসারের প্রাসাদ এবং তাঁর প্রজাদের বাড়ী কেমন দেখতে ছিল, তার একটা ধারণা আমরা করতে পারি। তাহ'ল, প্রথম তলা ছিল মজবুত, ভেতরে ও ওপরে ঢালু, কোণে থাকত চারটে গোল স্তম্ভ। প্রথম তলা শুধু পাথরে তৈরি হত, বারান্দা হত খোলা। এই মজবুত একতলার শক্ত ছাদে তৈরি হত পরিবারের বাসের ঘর, ঘরগুলো হত কাঠের এবং অনেক কারুকার্যে ভরা। যুদ্ধের সময়ে যে স্ত্রীলোকদের একতলায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব হত, সেটা বোঝা যায় পাণ্ডাদের প্রদর্শিত উজ্জয়িনীর মাটি চাপা-পড়া ধ্বংসস্তূপ দেখলে। পাণ্ডারা বলে, ওটা বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদের অংশ, দেখলে মনে হয়, অশোক-যুগের দুর্গ। এখানে আমরা কঠিন, ধূসর পাথরে তৈরি, কালের আঘাতে মলিন যে ইমারত দেখতে পাই, তা মনে হয়, একটা উঠোনের ভেতরের অংশ; সাঁচীর স্থাপত্য দেখলে মনে হয়, এটা কোন রাজার বা অভিজাত ব্যক্তির বাড়ী ছিল। বাইরে, দেওয়াল প্রায় নিরেট; ভেতরে দেওয়ালের গায়ে বহুথামযুক্ত ঘর ও বারান্দা, একটা ঘরের মেঝে উঁচু—ওটা একসঙ্গে শোয়ার ঘর ও খাটের ভারতীয় সংস্করণ। আমাদের মনে হয়, শান্তির সময়ে এগুলিতে সৈন্যরা থাকত। বাড়ীটা এত বিশাল—যেন প্রকৃতির মত—এখনও কয়েকটা থাম রয়েছে—বহু থাম ছিল, একের পর এক রাজারা থামগুলিকে নানাভাবে, নানা পরিমাণে অলঙ্কৃত করিয়েছিলেন থামগুলির গঠনের সহজ রূপ দেখলে, যে সাঁচী দেখেছে, সে ভালভাবে বুঝতে পারবে, এ বাড়ী অশোকের আমল বা তার আগেকার।

তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি, রাজগীরের প্রাসাদ ছোট হলেও এই গঠন-রীতিতে নির্মিত হয়েছিল এবং তার পথে পথে শহরের অপেক্ষাকৃত অভিজাতদের বাড়ী ছোট ও ঘেঁষাঘেঁষি হলে এই ধরনেরই ছিল। একথা ঠিক যে, ওদের বাড়ীর একতলাগুলি দামী পাথরের বদলে এখনকার রাজগীরের তীর্থযাত্রীদের কুঁড়ের মত কাদা আর নুড়ি দিয়ে তৈরি হত। নদীর ধারে এরকম বাড়ীর ভাঙা স্তূপ থেকে যে কেউ নানা স্তরে গৃহস্থালীর পুরনো মাটির বাসন-পত্রের টুকরো পেতে পারে। কিন্তু এইসব বাড়ী ও দোকানের সামনের এবং ওপরের অংশ অবশ্যই কাঠ খোদাই করা থাকত, মন্দিরের সম্মুখভাগ শহরের জীবনযাত্রার যথার্থ প্রতিফলনকে তুলে ধরে। এরকম পথে যখন 'তরুণ যুবক' শাক্য রাজপুত্র বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে হেঁটে যেতেন, তখন রাজা দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখতেন প্রাসাদের ছাদ থেকে, যে দারিদ্র্যের গৌরবে তিনি আনন্দ পেতেন, কোন সম্মানের প্রলোভনে বিম্বিসার তাঁকে তার থেকে বিচ্যুত করতে পারেননি। "এই সাংসারিক জীবনেই দুঃখ, যে মুক্ত পরিবেশে থাকে, সে শুধু স্বাধীন" —এই কথা ভেবে তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর জীবন বরণ ক'রে নিয়েছিলেন।

রাজগীর থেকে দূরে রাজপুতানার উত্তরে রয়েছে অম্বর ও জয়পুর, ভারতে বেড়াতে এসে প্রত্যেকে এই দুটি শহর দেখতে চেষ্টা করে। দুটির মধ্যে অম্বর উঁচু জায়গায় অবস্থিত, জয়পুর রয়েছে উন্মুক্ত সমতলে, অম্বর বেশী প্রাচীন। বস্তুতঃ, ভারতে একটা ধারণা আছে যে, কোন শহর এক জায়গায় এক হাজার বছরের বেশী থাকা উচিত নয়। মনে করা হয়, মহামারী ও অন্যান্য দুর্যোগ এড়াতে নতুন জায়গায় চলে যাওয়া ভাল। এই নিয়ম অনুযায়ী, জয়পুরের নতুন শহর গড়ে উঠেছিল। শহর নির্মাণ শেষ হলে মহারাজা প্রজাদের নিয়ে নতুন শহরে চলে যান।

আধুনিক ভারতে সংঘটিত অম্বর ও জয়পুরের এই ইতিহাস এখনো রাজপুত স্মৃতিতে জীবন্ত, প্রাচীন রাজগীরের ইতিহাসের বহুক্ষেত্রে এ ঘটনা আমাদের পথ দেখাবে। বিম্বিসারের পুত্র—সেই ভাগ্যনিহত রাজা, অজাতশত্রু যার জীবনপথ পিতার মৃত্যুর রক্তচিহ্নে কলঙ্কিত হয়েছিল—বুদ্ধের জীবদ্দশায় তিনি বুঝেছিলেন, রাজধানী স্থানান্তরিত করা দরকার, তাই আগের রাজধানীর অনুরূপ পাঁচিল ও দরজাসহ খোলা মাঠে নতুন শহর গড়ে তোলেন। সেই শহরের ঘাসে ঢাকা ধ্বংসস্তূপ এখনো রয়েছে, বর্তমান গ্রামের পশ্চিমে, নতুন রাজগীরের স্মৃতিচিহ্ন,-শহরের সমাধি।

মহাভিনিষ্ক্রমণের সময়ে বিম্বিসার ছিলেন মগধের রাজা। অজাতশত্রু বুদ্ধের মৃত্যুর সময়ে রাজা ছিলেন। কিন্তু উচ্চভূমির সংরক্ষিত জায়গা ছেড়ে ওদের বাইরে নতুন শহর গড়ার ঘটনায় বুঝতে পারি যে, ওদের যুগের অন্ততঃ পাঁচশো বছর আগে প্রাচীন রাজগীরের জায়গায় একটা শহর ছিল।

এ কথা ভাবার কারণ নেই যে, ঐ শহর গড়ে উঠেছিল শুধু প্রাসাদ ও তার আনুষঙ্গিক নিয়ে। ঐ শহর যে জনবসতির নতুন কেন্দ্ররূপে বর্তমান গ্রামের

পূর্বসূরী হয়ে দেখা দিয়েছিল, তা বোঝা যায়, দুশো বছর পরে, যখন সম্রাট যাঁকে সম্মানিত করলে ধন্য হতেন, সেই বুদ্ধের উপযুক্ত স্মারক-নির্মাণের উৎসাহে মহান অশোক প্রধান দরজার উত্তর-পশ্চিম কোণে স্থান নির্বাচন করেন, সেখানে একটি স্তূপ ও শিলালিপিসহ অশোকস্তম্ভ থাকবে ঠিক হয়। পাহাড় ও থামের গায়ে ক্ষোদিত অশোকের বাণীগুলি যেহেতু ঘোষণাজাতীয়, অতএব, বোঝা যায়, ঐ পাহাড় ও থামগুলি অনেকটা আধুনিক সংবাদপত্রের কাজ করত। কারণ, এগুলির সাহায্যে রাজার ইচ্ছা জানানো হত এবং সেইজন্য জন-অধ্যুষিত শহর থেকে দূরে কখনো এগুলি তৈরি করার স্থান নির্বাচিত হত না। সারনাথের স্তম্ভলিপি রয়েছে মঠের দ্বারে বা প্রাঙ্গণে। অনুরূপভাবে, পাটলীপুত্রে যে স্তম্ভলিপিগুলির অবশেষ পাওয়া গেছে, রাজার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ সেগুলি স্থাপিত হত প্রাচীন কারাগারের ভেতরে বা ঐ স্থানে।

তাহ'লে আমরা ধরে নিতে পারি যে, বিম্বিসারের পরবর্তী কালে রাজগীর প্রায় পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং পরে যদি ওখানে রাজা বাসও ক'রে থাকেন, তবে তা মাঝে মাঝে, যেমন এখন অম্বরে হয়। তাহ'লে যে শহর দিয়ে বুদ্ধ বার বার গেছেন এবং যেখানে তাঁকে সম্মানিত অতিথি ব'লে মনে করা হত, সে শহর তখনই প্রাচীন হয়ে গিয়েছিল। এইসব প্রান্তরে, এই ধ্বংসপ্রাপ্ত পথগুলিতে অথবা শতপর্ণীর বিশাল গুহামন্দিরে এখনও বুদ্ধের কণ্ঠস্বর বাজছে চিরকালের জন্য।

তিনি এ পথে এসেছিলেন কেন? রাজধানীর আশেপাশে থাকত যে সব শিক্ষিত লোকরা, তাদের জন্য কি? পরবর্তী কালের বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় কি তখনই বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠেছিল, তাই কি তিনি আশা করেছিলেন, এখানে সে যুগের সমগ্র বিদ্যাচর্চা দেখতে পাবেন? যে কারণেই হোক, দীর্ঘ দিনের একাগ্র ধারণায় সমগ্র সত্তা দিয়ে যে জ্ঞানকে উপলব্ধি করেছিলেন, তা হৃদয়ে নিয়ে তিনি এখানে এসেছিলেন। এখানে আসার আগে ঐ সত্য সম্বন্ধে যদি তিনি নিশ্চিত না হতেন, তাহ'লে নদীতীরের গুহা, মাঠ আর পুকুরের মাঝের বিশালবৃক্ষসমন্বিত ঐ নির্জন বেলগাছের বনে জ্যামুক্ত শরের মত নির্দ্বিধায় চলে যেতেন না, এখন ঐ অরণ্যেই অবস্থিত বুদ্ধগয়ার সাধারণ গ্রামটি।

বিহার

পূর্বে পাটনা থেকে পশ্চিমে বেনারস পর্যন্ত জানুয়ারি মাসে ক্ষেত ভরে থাকে সাদা আফিঙের ফুলে। বৌদ্ধ জাতিগুলির এই পবিত্র ভূমিতে আজ এই মৃত্যুবাহী ফুল ফুটে থাকে। যে মাটিতে ঐ ফুল ফোটে তা দীর্ঘদিন আগে বুদ্ধের চরণস্পর্শে পবিত্র হয়েছে। প্রাচীন পাটলীপুত্র, যেখানে এখন বাঁকিপুর অবস্থিত, প্রায় ঐখানে তিনি মগধরাজ্যে ঢুকেছিলেন। যুগ যুগ ধরে লোকে নদীর ঐ জায়গাকে বলত

গৌতমের ঘাট এবং শেষবার উত্তরে যাওয়ার সময়ে তিনি যে দাঁড়িয়ে এখানে প্রথম দুর্গনির্মাণ দেখে এই রাজধানীর ভবিষ্যৎ মহিমার কথা বলেছিলেন, সে কাহিনী শোনাত। দূর দূর গ্রামে লোকে অনবরত বুদ্ধের মূর্তি দেখতে পায়, মূর্তিগুলি ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মন্দিরের ভেতরে বা বাইরে পূজিত হয়। যে কোন ক্ষেত চষতে গেলে চাষী মাটির তলা থেকে কোন স্মৃতিচিহ্ন বা ক্ষোদিত পাথরের টুকরো পায়। রাজপথের ধারে ঝোপঝাড় বা গাছের নীচে দেখা যায় মাটির তিনটি স্তূপ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, ওটা বিশ্বদেবতা জগন্নাথ, যিনি বুদ্ধের নামস্বরূপ ও প্রতীক, তাঁর মন্দির। এই বিহারী গ্রামের সরল ভক্তরা তাঁকে ভুলে গেলেও তাঁর স্মৃতিকে মনে রেখেছে। যে দেশে তিনি থেকেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে যাঁরা আজও অন্য নামে তাঁর পূজা করছে, তাদের কাছে সেই হারানো জ্ঞান এনে দেওয়ার জন্য আধুনিক শিক্ষাসংগঠনকে বহুদূর দেশে যেতে হয়, দীর্ঘবিস্তৃত ভাষায় লেখা শাস্ত্র পড়তে। অশিক্ষিতদের মাঝে অসীম করুণার অস্পষ্ট প্রথার মাধ্যমে সেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব বেঁচে আছে। কিন্তু দুহাজার বছর পরেও একথা তারা মনে রেখেছে। তিনি বিশেষভাবে এই মগধের কৃষকদেরই ছিলেন। যাদের তিনি শিশুকালে আদর করেছেন, তাদের রক্ত এদের শিরায় প্রবাহিত। তিনি তাদের মানুষের মর্যাদায় শিক্ষা দিয়েছিলেন। অতিগর্বিত অভিজাতদের মত এদেরও তিনি ডাক দিয়েছিলেন সব ত্যাগ ক'রে, আত্মবিলোপ ক'রে শান্তি খুঁজে নেওয়ার জন্য। হিন্দুধর্মে স্থানলাভের জন্য বিহারের কৃষক গৌতম বুদ্ধের কাছে ঋণী। তাঁর সাহায্যে সে জাতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধের যে সব কাহিনী আমরা পেয়েছি তাতে স্পষ্টতঃই বলা হয়েছে যে, তিনি সব প্রচলিত মতের মধ্যে সত্যের সন্ধান করেছেন। পাঁচজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর ভ্রমণ করবার ও উপবাস করার অর্থ এই। যে কোন নতুন চিন্তাবিদের প্রথম চেষ্টা হবে প্রচলিত মতবাদগুলিকে পুনরুদ্ধার ক'রে সেগুলির গভীরে চলে যাওয়া। ৫৩০ খ্রীঃ পূঃ রাজপুত্র গৌতম শাক্য রাজত্বের জনবহুল অঞ্চলে হঠাৎ আপন অসীম করুণা ও বিশ্ব-ভাবুকরূপ উপলব্ধি ক'রে সে যুগের পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখা করার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করলেন। অতএব, মগধরাজ্যে রাজগীর অঞ্চলের দিকে তিনি রওনা হলেন। সম্পূর্ণ ভৌগোলিক ভিত্তিতে আমরা দেখতে পাই, আলোচ্য সময়ের মত প্রাচীন যুগেও নিঃসন্দেহে আর-একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র ছিল একেবারে উত্তর-পশ্চিমে, তক্ষশীলায়। বুদ্ধের জীবনের একেবারে শেষে আমরা শুনেছি, সত্যিই একটি কিশোর মগধ থেকে ওখানে গিয়েছিল চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে—যেমন, মধ্যযুগের ইউরোপীয় ছাত্ররা যেত কর্ডোভায়।

এ কথা অনুমান করা যায় যে, তক্ষশীলায় যে শিক্ষা দেওয়া হত, তা বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়ে কিছুটা আন্তর্জাতিক ছিল। ভেষজবিদ্যা তুলনামূলক বিজ্ঞান, আর তক্ষশীলা চীন, নিনেভে; পার্সিপোলিস ও ব্যাবিলন যাওয়ার পথে পড়ত।

তক্ষশীলা ছিল ভারতের প্রবেশপথ বা প্রবেশপথের পার্শ্ববর্তী বিশ্ববিদ্যালয়; এইযুগেই যে অন্যান্য জাতির কাছে সে পরিচিত ছিল, তা বোঝা যায়,—৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বে আলেকজাণ্ডার ঐ পথে এসেছিলেন। বিদেশী বস্তু কিনতে, ভারতের বাইরের দেশ সম্বন্ধে জানতে, বিদেশের খবর, বিদ্যা জানতে, এমনকি সম্ভবতঃ সবরকম বিজ্ঞান শিক্ষা করতে সারা ভারতে তক্ষশীলার মত কেন্দ্র ছিল না।

অনুরূপ স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, সম্পূর্ণ জাতীয় সংস্কৃতির জন্য গঙ্গার উপত্যকার কাছাকাছি তাকাতে হবে। সবচেয়ে কম সংগঠিত মতবাদেরও কোথাও একটা কেন্দ্র থাকবেই; ভারতে দু' শতাব্দী পরে এই কেন্দ্র যে মগধে ছিল, তা বোঝা যায়, গ্রাকদের পরাজয়ের পর পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের বাস করায়।

তখন রাজার যে সামর্থ্য ছিল, তাতে ঐখান থেকে সীমান্তে সৈন্যচালনা করা মোটেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সামরিক পরিকল্পনা যদি মূল থেকে এতদূরে পরিচালনা করা যায়, তাহ'লে আমরা বলতে পারি না যে, মগধ সারা দেশের ধর্মকেন্দ্র হতে পারে না। সেই মহান যুগের আধ্যাত্মিক শক্তির প্রমাণ দিতে এর দু প্রান্তে রয়েছে বেনারস ও বৈদ্যনাথ। ষষ্ঠ খ্রীস্টপূর্বাব্দে হঠাৎ শক্তিভিত্তিক ধর্মের বদলে বিবেকভিত্তিক ধর্মের আবির্ভাবের যে অদ্ভুত ঘটনায় ঐতিহাসিকদের কল্পনা খেই হারিয়ে ফেলে, তা সঠিকভাবে দেখলে একটুও অদ্ভুত নয়। এই ধর্মগুলি চিরকালই ছিল; বিশেষ তারিখে তার সংগঠন শুরু হয়েছে মাত্র।

ইতিহাসের ঘটনা পদার্থবিদ্যার সূত্রের মত দৃঢ় নিয়মে চলে। ভারতে বুদ্ধ প্রথম ধর্মমতসংগঠক ও প্রথম জাতিনির্মাতা। কিন্তু উপনিষদ যে ভাবধারাগুলি প্রচার করেছে, বুদ্ধের চারদিকের পরিবেশ, সেই ভাবধারায় নিষিক্ত না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধ কাজ করতে পারেন নি। ধর্মের প্রবর্তকরা তাঁদের প্রচারিত মত কখনো সৃষ্টি করেন না। তাঁরা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে আপেক্ষিক মূল্য বিচার করেন, তাদের ব্যাখ্যা ও বিন্যাস করেন; এবং আপন ব্যক্তিত্বের অসাধারণ শক্তিতে সেগুলিকে অভাবনীয় শক্তি ও প্রাণময়তা দান করেন। কিন্তু ভাবধারাগুলি আগেই শ্রোতাদের মনে উপস্থিত থাকে। তা না হ'লে প্রচারককে কেউ বুঝতে পারত না। কত শতাব্দী ধরে উপনিষদের সংস্কৃতিকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ চলছিল? আভাসে-ইঙ্গিতে আমরা ক্ষীণ ধারণা করতে পারি মাত্র।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম আন্দোলনের কিছুটা সৌভাগ্য কিছুটা দুর্ভাগ্য যে, ব্যক্তিগত ধর্মমতের সঙ্গে এর যোগাযোগের ফলে আমাদের মনে হয় এটি বুঝি অমুক, অমুক বছরে হঠাৎ মানবমনের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়েছে। আমরা যথাযথভাবে বুঝতে পারি না যে, ঐ ধর্ম ও তার আনুষঙ্গিক সব কথা ও প্রতীক যাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে তাদের দীর্ঘ-পরিচিত পূর্বের প্রথা ও ধারণা থেকে নিশ্চয় উদ্ভূত। আমরা মনে করি, ভারতবর্ষে ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রথম অধিপতি ছিলেন বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত, কিন্তু বুদ্ধ যে বলেছিলেন, "যেখানে চারটি রাস্তার মিলনস্থল—সেখানে ওরা সার্বভৌম

সম্রাট—চক্রবর্তী রাজার স্মৃতিতে স্তূপ গড়ে তোলে," এতে বোঝা যায় যে, সেই প্রাচীন যুগের জনগণ সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ঘটনার সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ছিল এবং পাটলীপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের বসবাসের আশ্চর্য ঘটনা, সেখান থেকে পাঞ্জাব ও ভারত মহাসাগর পর্যন্ত শাসন করা মোটেই অদ্ভুত নয়। কারণ, তাঁর যুগের ভারতবর্ষ রাস্তা, ডাক, সরবরাহসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার ঘটনায় দীর্ঘদিন অভ্যস্ত ছিল।

ভারতীয় জনগণের ইতিহাসে বিহারের বিশেষ তাৎপর্য দেখা দিয়েছে, দুটি বিপরীত আধ্যাত্মিক প্রভাবের সীমানায় এর অবস্থানের ফলে। আজও ঐ জায়গা হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার মিলনস্থল। শিখ, আর্যসমাজী ও হিন্দুস্থানী রাজপুত গঙ্গার ধারা ধরে দলে দলে আগে পাটনা ও বাঁকীপুরের যুগ্মশহরে, এ দুটি শহর নিম্নবঙ্গের ঐক্যবদ্ধ সংস্কৃতভিত্তিক সভ্যতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সীমানা জুড়ে দেখা দিয়েছে পারস্পরিক সংযোগের সবরকম পরিবর্তিত প্রতিষ্ঠান। পোষাক, ভাষা, আচার-ব্যবহার সব কিছুতে এই বোঝাপড়ার পরিচয়। পাটনা থেকে বারাণসী হয়ে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক মান আজও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি, তার জন্য প্রয়োজন ছিল শ্রেষ্ঠ বর্ণের হিন্দুদের ফার্সী ও সংস্কৃত জানার, জগৎ যে অতি-প্রগতিশীল, পরিশীলিত সভ্যতা দেখেছে, তা এইভাবে গড়ে উঠেছিল।

জনবসতিপূর্ণ, কৃষিপ্রধান বাংলার উর্বরভূমি গড়ে উঠেছিল গৌড়ের রাজধানীকে কেন্দ্র ক'রে এবং গৌড় বারাণসী ও কনৌজের সংস্কৃতির উৎসরূপে তাদের সঙ্গে নির্দিষ্ট সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকায় ঐতিহাসিক যুগে কোন সময়ে বিশৃঙ্খল আক্রমণ বা ঔপনিবেশিকতার শিকার হয় নি। বর্বর জাতিগুলি কখনো বিহার দিয়ে যাতায়াত করতে পারে নি, বিহার চিরকাল ভারতের সবচেয়ে উদার প্রদেশ ছিল, আজও আছে। নিঃসন্দেহে তার সীমানার মধ্যে এত বিচিত্র উপাদানের ঘনিষ্ঠ অবস্থানের ফলে বিহার বার বার বিরাট রাজনৈতিক প্রতিভার জন্ম দিয়েছে। বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত, তাঁর পৌত্র অশোক, সমগ্র গুপ্তবংশ, শের শা, শেষে গুরু গোবিন্দ সিং একটা অপেক্ষাকৃত ছোট প্রদেশে ভারত ইতিহাসের এতজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির জন্মলাভ যথেষ্টের বেশী। প্রত্যেক মহান বিহারীই সংগঠক ছিলেন। কেউ অন্ধ ছিলেন না বা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হন নি। প্রত্যেকে সমসাময়িক অবস্থা সচেতনভাবে পর্যালোচনা ও উপলব্ধি ক'রে বুঝেছিলেন, নিজের অন্তরে কিভাবে এগুলির সমন্বয় ঘটিয়ে সঠিক পথে চলবার চরম, অপ্রতিরোধ্য প্রেরণা দান করতে পারবেন।
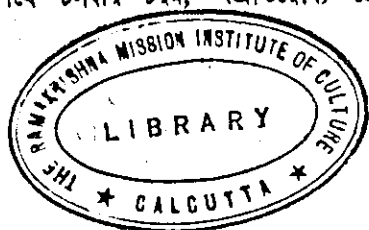
অজন্তার প্রাচীন মঠ

১

অজন্তার উপত্যকায় পূর্বমুখী পর্বতের গায়ে একটা বড় বাদ্যযন্ত্রের রেখা ও ছড়ের মত সার বেঁধে রয়েছে পাথরের খিলান ও থাম। মোট ছাব্বিশটা গুহা একটা দীর্ঘ, সমান রেখা সৃষ্টি ক'রে গাঢ় নীল পাথরের বৃত্তাকার প্রান্তে অবস্থান করছে, ঐ পাথর নিশ্চয় বহু, বহু যুগ আগে খোদাই ক'রে তৈরি হয়েছিল। এতে যে ঐক্যের সুষমা দেখা যায়, তা এই প্রাচীন মঠকে এতটা মহান ও সুন্দর করেছে। আমরা প্রথম যখন গুহাগুলি দেখি, তখন মনে হয়েছিল, দীর্ঘ, খিলান-যুক্ত বিরাট চৈত্যকক্ষে পরপর স্তম্ভযুক্ত বারান্দা চলে গেছে, মাঝে একটু ব্যবধানের পর তা দূরে মিলিয়ে গেছে।* এইভাবে আমরা প্রথম দশ ও ছাব্বিশ সংখ্যক গুহার কথা জানতে পেরে তার গম্ভীর ছন্দোময় রূপের সংগীতে মুগ্ধ হয়েছিলাম। বস্তুতঃ, নয় ও উনিশ নম্বর গুহাও চৈত্য। কিন্তু ও দুটি পাথরের স্তূপের দ্বারা কিছুটা আবৃত, অথচ প্রথম নজরে দশ ও ছাব্বিশ নম্বরকে দেখা যায়।

যে উপত্যকায় এদের দেখলাম, সেটি কি নির্জন, নিঃসঙ্গ! উপত্যকাটি আধখানা চাঁদের মত পাহাড়ের মাঝে অবস্থিত, তাই প্রতি গুহামঠ থেকে আর কিছু দেখা যায় না। উপত্যকায় প্রবাহিত নদীটি জলপ্রপাতরূপে উত্তর প্রান্ত থেকে প্রবেশ করেছে। এবং যেখানে এই পার্বত্য উপত্যকা থেকে বেরিয়ে গেছে, সেখানে দেখলে বোঝা যায় না এই আঁকাবাঁকা জলধারা চওড়া নদী হয়ে গেছে। এ রকম জায়গা চিরকাল সন্ন্যাসীদের পক্ষে আদর্শ। প্রাচীন স্তোত্র ও গ্রন্থের আবৃত্তির সঙ্গে একযোগে ছুটে-চলা জল ও জলপ্রপাতের ধ্বনি চিরন্তন সঙ্গীতের মত তার কানে প্রবেশ করে। সবুজ মাঠেরচার দিকে বৃত্তাকার আকাশপথে ভোরবেলা সূর্যের প্রথম আলো এবং গোধূলিতে শেষ আলোর সঙ্কেতে শোভাযাত্রার ঘণ্টাধ্বনি হত, দীপ জ্বলত, পবিত্র জল ছড়ানো হত। গ্রীষ্মের দিনে পাতার কম্পনে, শীতল, স্নিগ্ধ ছায়ায় শিক্ষার পরিবেশ গড়ে উঠত; প্রকৃতির নির্জনতায় থাকত জগৎ থেকে দূরে থাকার, পবিত্রতার একমাত্র

---

*চৈত্য—সম্মিলিত উপাসনার জন্ত বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ব্যবহারের গৃহ; যথার্থভাবে খ্রীস্টান গীর্জার সঙ্গে তুলনীয়, আজও গীর্জার সঙ্গে চৈত্যের খুব মিল। উপাসনাস্থল ও উপাসকদের বসবার জায়গার পার্থক্যও একরকম। বেদীর জায়গায় থাকতো দাগোবা। অজন্তায় চারটি চৈত্য আছে।

দাগোবা—মহান কোন ধর্মগুরুর চিতাভস্ম বা স্মারক চিহ্নের ওপরে নির্মিত স্তূপ। মুক্তাঙ্গন স্তূপ হল সাঁচী। অজান্তার চারটি চৈত্যতেই স্তূপ রয়েছে। এটি স্বভাবতঃ পবিত্র ছিল।

পরিবেশ গ'ড়ে তোলার ইঙ্গিত। যে সামান্য কয়েকজন সন্ন্যাসী সম্ভবতঃ অশোকের কয়েক শতাব্দী আগে অজন্তার স্বাভাবিক গুহায় বাস করতেন, তাঁদের নিশ্চয় এরকম মনে হত। যে অমসৃণ পথ বেয়ে তাঁরা তাঁদের উচ্চ বাসস্থানে পৌছতেন, সেখানে অল্প দিনে তাঁদের সহিষ্ণু হাতের স্পর্শে সাধারণ সিঁড়ি গড়ে উঠল। কিন্তু উত্তর দিক্ থেকে আসতে গেলে এখানেও নদীতীরের বড় বড় পাথর পেরিয়ে অনেক কষ্টে আসতে হত। মঠের পক্ষে আদর্শ স্থান। খান্দেশের উঁচু-নীচু বন্ধুর পার্বত্য প্রদেশে যে একটা উপত্যকা এত নির্জন ও সুন্দর হ'তে পারে, তা কল্পনা করা কঠিন।

মোট ছাব্বিশটা গুহা আছে; সরকারী প্রথায় কেমো ধরনে সেগুলি সংখ্যা-চিহ্নিত হয়ে পর পর উত্তর থেকে দক্ষিণে চলে গেছে। অবশ্য, যুগ অনুযায়ী ওগুলি চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগ, আট থেকে তেরো নম্বর গুহা রয়েছে মঠের ছাদে পৌছবার সিঁড়ির বাঁদিকে। ওখানে এলে ছয় ও সাত নম্বর গুহার মাঝামাঝি পৌছনো যায়, প্রথম সাতটী গুহা তৃতীয় যুগের। চোদ্দ থেকে উনিশ নম্বর গুহা হল দ্বিতীয় যুগের আর কুড়ি থেকে ছাব্বিশ চতুর্থ যুগের। এইরকম:—

১৩, ১২, ১১, ১০, ৯, ৮: ১ম যুগ।
১৯, ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪ : ২য় যুগ।
৭, ৬, ৫, ৪, ৩, ২, ১: ৩য় যুগ।
২৬, ২৫, ২৪, ২৩, ২২, ২১, ২০ : ৪র্থ যুগ।

যে কোন যুগের সব গুহা একত্রে গড়ে ওঠে নি। প্রত্যেক যুগে কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে। ষোল ও সতেরো নম্বর গুহায় শিলালিপি পড়ে বিষয়টি ভালভাবে বোঝা যায়; কারণ, এগুলি তৈরি হয়েছিল, বিখ্যাত গুপ্তসম্রাট মহারাজ দেবের সময়ে বা তাঁর মৃত্যুর পরে, (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, ৩৭৫ থেকে ৪১৩ খ্রী:) যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি এর কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। পাঁচ থেকে এক নম্বর গুহা বোধ হয় এর পরেই তৈরি হয়।

যাই হোক, আট থেকে তেরো পর্যন্ত প্রথম যুগের গুহাগুলিই শত শত বছর ধরে অজন্তার গৌরবকে বজায় রেখেছে। সম্ভবতঃ অশোকের অনেক আগে থেকে কিছু সন্ন্যাসী স্বাভাবিক গুহারূপে এইগুলিতে বাস করতেন। সে যুগে রাজা বড় শহর বা বড় জমিদারের পক্ষে সব চেয়ে প্রশংসনীয় কাজ ছিল সন্ন্যাসীদের বাসের জন্য গুহা নির্মাণ করা। অতএব কালক্রমে পর্বতের এই স্বাভাবিক গুহাগুলির (এটাই উদ্দেশ্য ও সূচনার কারণ বলে আমাদের মনে হয়) কেন্দ্রস্থল বড় ক'রে ছোট ছোট ঘর তৈরি ক'রে এগুলিকে সাধারণ মঠে রূপান্তরিত করা হ'ল; প্রতি ঘরে দুটি পাথরের খাট, নীচু দরজা থাকত আর ঘরগুলি একটি ফাঁকা জায়গাকে ঘিরে থাকত, এইভাবে জায়গাটি চত্বর বা উঠোন হয়ে উঠত। এর ওপরে, তেরো নম্বর গুহার সামনে একটি ছোট মাটির বারান্দাও ছিল। আট নম্বরে তা ছিল

না। মনে হয় যে, দুটি দিক্‌ থেকে অল্পবিস্তর একসঙ্গে "বসবাস শুরু হয়েছিল এবং পরে ভেতরের অংশেও বাস শুরু হয়, না হলে পাশাপাশি নয় ও দশ নম্বর দুটি গুহারই চৈত্য হওয়ার আর কি ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারি ?

আমাদের আরও মনে হয়, প্রথম বসবাস শুরু হয় অনেক আগে, যখন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাস দৃঢ় ছিল এবং সেই মহান শিক্ষকের জীবনের স্মৃতি নবীন ছিল। নদীতীরের এই রুক্ষ পাহাড়ে দশকের পর দশক এমন দৃঢ়বলে যে শক্তি টিঁকে ছিল, তার আর কি কারণ আমরা দেখতে পাই ? আমরা চিন্তা করি, ঐ প্রথম সন্ন্যাসীরা কি দক্ষিণাপথের দেশগুলিতে প্রচারের জন্য নিযুক্ত ভ্রমণরত শিক্ষকের দল না, উজ্জয়নীর শক্তিশালী সাম্রাজ্যে প্রেরিত প্রচারক, না ভীলসা ও সাঁচীর মূল সম্প্রদায় থেকে উদ্ভূত একটি সম্প্রদায় মাত্র ? সে যাই হোক, বর্ষাকালে গুহাগুলি বাসস্থানরূপে তাঁদের কাছে মূল্যবান ছিল, ঐ সময়ে সব ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের কোন নির্দিষ্ট বাসস্থানে একত্র হতে হয় ; আর যে আট-ন' মাস একটানা তাঁরা থাকতেন না, সেই সময়ে নিশ্চয় গুহাখননের কাজ চলত। তাঁরা ভাবতেও পারেন নি, যে দুটি জায়গা তাঁরা বেছেছিলেন এবং যে দিন ওখানে প্রথম এসেছিলেন, সেই জায়গা ও দিন কত সৌভাগ্যচিহ্নিত ছিল। তাঁরা না পারলেও আমরা বুঝতে পারি, প্রায় বারোশো বছর ধরে উন্নতি ও খ্যাতিলাভের পর তাঁদের সে বিদ্যা প্রচার করার দরকার ছিল ; সৌন্দর্য, রাজাদের সানন্দ শ্রদ্ধানিবেদন, পৃথিবীর দূরতম প্রান্তের পথ সব তাঁদের দ্বারে এসে মিশেছিল। সপ্তম খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি এখানে হিউয়েন সাং এসেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ জায়গা "এক অন্ধকার উপত্যকায় নির্মিত সঙ্ঘারাম। এর উঁচু ঘর, দীর্ঘ পথ পাহাড় জুড়ে ছড়িয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে, পাহাড়ের সামনে তলার পর তলা উঠে গেছে"। এখানে বোঝা যায়, ইংরেজ অনুবাদক লেখকের বর্ণনা ঠিক বুঝতে না পারায় বক্তব্য ঠিক প্রকাশ করেন নি। আমরা যদি পড়ি "এর উঁচু চৈত্য ও তার পাশে গভীর বিহারগুলি* "তাহলে তখনি অর্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে, পরে যখন শুনি, বিরাট বিহারটি প্রায় ১০০ ফিট উঁচু এবং তার মাঝে বুদ্ধের পাথরের মূর্তি ৭০ ফিট উঁচু, তার ওপরে সাত-ধাপওয়ালা একটি চাঁদোয়া ওপরে উঠে গেছে, বাইরে থেকে তা ঝুলন্ত মনে হয়† তখন বোঝা যায়

* বিহার—বৌদ্ধ মঠ। প্রথমে বিহারের মাঝখানে একটা অসমঞ্জস আকারের কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণ এবং চারদিকে ছোট ছোট ঘর থাকত। পরে ঐ প্রাঙ্গণ চতুষ্কোণ এবং প্রধান প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে। আর তার লম্বা দিকে একটা বড় মন্দির থাকত, তাতে বুদ্ধের মূর্তি, স্তম্ভযুক্ত বারান্দা, ঘর থাকত, যেমন প্রাচীন মঠে থাকত। অজন্তায় বাইশটি বিহার আছে, তার অনেকগুলি অসমাপ্ত।

† রমেশচন্দ্র দত্তের সিভিলাইজেশন ইন এনশেণ্ট ইণ্ডিয়া-র ২য় খণ্ড, ১৫৬-৫৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত।

বিখ্যাত চৈনিক ভ্রমণকারী কোন বিহারের কথা বলছেন না, বলছেন সেই যুগের প্রধান চৈত্যের কথা (উনিশ না ছাব্বিশ ?) এবং যে প্রস্তরমূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন, তা আসলে রয়েছে ঐ চৈত্যের দাগোবায়।

অজন্তা প্রথম রাজার সাহায্য লাভ করেছিল অশোকের সময়ে বা তার পরেই, তখন নয় নম্বর গুহা এবং বারো নম্বর বিহারে তৈরি হয়েছিল। যে কেউ ভারতের প্রাচীন জায়গাগুলি সম্বন্ধে জানতে চায়, যুগ সম্বন্ধে সে নিজস্ব সংকেত খুঁজে নেয়। সাঁচীতে অশোকযুগের প্রাচীরের অলঙ্করণে ক্রমপরিবর্তন থেকে যে কালানুক্রমিক অনুপাত পাওয়া যায়, তাতে নিশ্চিতরূপে আমরা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অন্ততঃ চারটি ভিন্ন ভিন্ন যুগকে দেখতে পাই। এখানে অজন্তায় যে যুগ প্রথম থেকে আমরা লক্ষ্য করি, তাতে চৈত্যের অলঙ্করণের সঙ্গে অশোক যুগের প্রাচীরের যোগ আছে। মনে হয়, সে যুগের গৃহস্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ছিল গোল ছাদ, যা আমরা এখনও অজন্তার পার্বত্য গুহায় দেখি; অশোক যুগের বেষ্টনী বারান্দার সম্মুখভাগে ব্যবহৃত হত; আর ছাদের রেখার মাঝে থাকত অশ্বক্ষুরাকৃতি জানালা। গুহানির্মাতাদের স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল গুহার সামনের অংশকে যতটা সম্ভব সে যুগের বাড়ীর বাইরের অংশের মত করবে।

কিন্তু একটা ধরন থেকে একটা রীতির সৃষ্টি হয় এবং তার জন্মের মূল কারণটি বিদায় নেওয়ার অনেক পরেও সে রীতি থেকে যায়। তাই অজন্তায় অশ্বক্ষুরাকৃতি জানালা ও অশোক যুগের বেষ্টনী ক্রমশঃ মূল উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরে গিয়ে একটা বাঁধা রীতি হয়ে উঠেছিল; এইসব ক্রম-পরিবর্তন থেকে আমরা গুহাগুলির যুগ সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করতে পারি। নয় ও বারো নম্বর গুহায় এ রীতি খুব আন্তরিকভাবে ব্যবহৃত হয়ে সে যুগের ধারণাকে প্রকাশ করেছে, ঠিক যেমন ইউরোপে প্রাচীন যুগের মুদ্রাকররা যন্ত্রে-ছাপা বইকে হাতে-লেখা বই-এর মত দেখানোর জন্য চেষ্টা করত। আট ও তেরো নম্বর গুহাতে এ রীতিই নেই। নিশ্চয় এ অলঙ্করণ করার মত আধুনিক বা ধনী ছিল না এদের নির্মাতারা। দশ নম্বর চৈত্যের সম্মুখ ভাগ পড়ে গেছে, তার কোন চিহ্ন রেখে যায় নি, শুধু দু' পাশের পাথরে ভাস্কর্য রয়ে গেছে। কিন্তু উনিশ নম্বর গুহা পর্যন্ত এই অশ্বক্ষুরাকৃতি অলঙ্করণ দেখা যায়। প্রথমে ওগুলি শুধু বাড়ীর সামনের জানালামাত্র। বারো নম্বর গুহায় এর ব্যবহার হয়েছে ঘরের দরজার ওপরে আলো হিসেবে এবং সহজ সৌন্দর্য রচনা ক'রে এগুলি সমস্ত দেওয়ালে পর পর বসানো হয়েছে। ছয়, সাত ও পনেরো নম্বর গুহায় ঐ আকারের অন্তর্ভাগ পদ্মের চিত্রে ভরা আর অর্ধবৃত্তাকার সম্মুখভাগের কোন নির্দিষ্ট অর্থ নেই। এখন আর ওগুলি জানালা নয়। এখন ওগুলি শুধু অলঙ্করণ। উনিশ নম্বর গুহার সম্মুখভাগের অলঙ্করণে বিদেশী প্রভাব দেখা যায়। কারিগরদের মধ্যে ভয়ঙ্কর স্থূলতা দেখা দিয়েছে, আজকের ভারতীয় শিল্পে নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয় রুচির প্রভাবের সঙ্গে এটি তুল্য। এই সুন্দর আকারগুলির প্রত্যেকটির ভেতরের অংশে

একটা বিশ্রী হাসি মুখ দেখা যায়, যার কোন অর্থ নেই। এখানে বারবার দাবার ছকের মত যে অলঙ্করণ দেখা যায় (এটি কলকাতার স্থাপত্য সংগ্রহে গান্ধার শিল্প বস্তুতে বহু-ব্যবহৃত), তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, এ প্রভাব এসেছে উত্তর-পশ্চিম থেকে। সম্ভবতঃ এটি পারস্যের মাধ্যমে আনীত গ্রীক প্রভাব। পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত ও পারস্যের মাঝে বিরাট যোগাযোগ ঘটেছিল এবং ভারতীয় রুচিতে পাশ্চাত্যের যুগ প্রভাবের ফল এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়।

তবু এখানেই ভারতীয় বুদ্ধির মার্জিত, সমন্বয়ী শক্তি সবচেয়ে দৃশ্যমান। (নানা শিল্পধারায় নিখুঁত অনুকরণ ও ধর্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের প্রকাশে দুঃসাহসিক রোমান্টিকতা থাকলেও অজন্তার উনিশ নম্বর গুহা জগতে স্থাপত্যের গর্ব হয়ে রয়েছে।) এ হল এক মহান নাগরিক জীবনের গৌরবময় রূপ। দুটি মজবুত থামের ওপরে দৃঢ়নির্মিত অলিন্দ থেকে জননায়কদের উপস্থিতি ও আলোচনার কথা বোঝা যায়; পাশের গ্যালারী, তার ভিত্তিও আনুষঙ্গিক ; এদিকে বড় জানালার সামনে আমরা রাজাদের অভিষেকের বা মৃতদের রাখার ঘর ও পটভূমি দেখতে পাই।

আমরা বেলজিয়ামের হোটেল দ্য ভিল-কে জগতের গণস্থাপত্যের চরম বলে ভাবতে অভ্যস্ত। কিন্তু এরকম সহজ সুষমা ও উৎকর্ষের তুল্য বেলজিয়ামের কিছুই নেই। এর সামনে একটি ছোট অঙ্গন রয়েছে, যেখান থেকে পা পিছলে গেলে গভীর খাদে পড়তে হবে। বোঝা যায়, এ রকম অবস্থানের জন্য এর উদ্ভব হয় নি। এখানে এবং আরও হাজার জায়গায় অজন্তা তার ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ যুগের ভারতের জীবন-ধারার ইঙ্গিত দেয়। উনিশ নম্বর গুহার সমসাময়িক সব স্থাপত্য যখন ধ্বংস হয়ে গেছে, তখন অক্ষয় পাথরে ক্ষোদিত এই গুহা গুপ্তশাসনে ভারতীয় নগরগুলির ঐশ্বর্য ও সংযমের স্মারক হয়ে রয়েছে।

(২)

বুদ্ধের নির্বাণের পরের বছরে রাজগীরে অনুষ্ঠিত প্রথম সঙ্গীতির কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি যে, বিহার নির্মাণ ও মেরামতের জন্য রাজার সাহায্য সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ নিতেন। বিহার নির্মাণ বা স্বহস্তে গুহা-খনন তাঁদের কাজ ছিল না; অবশ্য তাঁদের মধ্যে যাঁরা জগতের শ্রেষ্ঠ কারিগর ছিলেন, তাঁরা মঠের দ্বারা নিযুক্ত কারিগরদের একত্র ক'রে নির্দেশ দিতেন, যেমন, সব দেশে, সব যুগে মঠবাসীদের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, তাঁদের নিঃস্বার্থ সহযোগিতা, বিনিময়ের আশা না রেখে দেওয়ার ফলে অল্প সময়ে সন্ন্যাসীদের পক্ষে স্থায়ী কাজ করা সম্ভব হয়। কাজের ফল গড়ে তোলার বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কোন শিল্প-সংস্থার তুলনা হয় না। এর রহস্য হল, সন্ন্যাসীর কাজ করাই উদ্দেশ্য। যে কাজ তিনি করুন, বাড়ি তৈরি বা শিক্ষাদান বা অন্য কিছু তৈরি, তাঁর আদর্শ হল যে, ঐটিই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হবে। কোন স্বার্থের উদ্দেশে কাজ না ক'রে তিনি কর্তব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। কাজ

থেকে যে ফল পাওয়া যায় অর্থে বা দক্ষতায়, তা ব্যবহার করা হয় কোন বৃহত্তর, মহত্তর কাজে।

তাই ইউরোপের প্রাচীন মঠ ও তার সঙ্গে যুক্ত গীর্জাগুলি এত সুন্দর। বড় বড় গীর্জা তৈরির মত টাকা ওতে খরচ হয় নি। নির্জন জায়গায় স্থাপিত এই গীর্জাগুলি গড়ে তুলেছে শুধু কৃষক ও গ্রামীন শ্রমিকরা। কিন্তু প্রত্যেক পাথরের অলঙ্করণ ও তদারকি করেছেন সন্ন্যাসীরা। বহু বছরের কল্পনা রূপ পেয়েছে গম্বুজযুক্ত ছাদে, স্তম্ভগুচ্ছে, প্রসারিত খিলানে, গীর্জার মূর্তিতে, পবিত্র জলাধারে বা পেটিকা-আকৃতির মন্দিরগঠনে। সব শ্রেণীর লোকদের সন্ন্যাসী হিসেবে গ্রহণ করা হত, কিন্তু এই সঙ্গে আমরা ধরে নিতে পারি যে, যে কামার বা ছুতোর ধর্মজীবন বেছে নিত, তার চিন্তা ও সংগঠন-ক্ষমতা, আদর্শ ও স্বপ্ন সমশ্রেণীর লোকদের চেয়ে কিছু বেশী হত।

ইউরোপে প্রমাণিত এই নিয়ম ভারতের ক্ষেত্রেও সমান সত্য। সর্বত্র সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এটা বৈশিষ্ট্য। সন্ন্যাসের আদর্শে এর মূল রয়েছে এবং অজন্তায় তার প্রমাণ আমরা সবচেয়ে বেশী পাই। কারণ, ইউরোপের মত বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও ছিল গণতান্ত্রিক। কোন কলঙ্ক বা জন্মের বাধা তাদের মঠে প্রবেশে বাধা হত না। খ্রীস্টের জন্মের সাড়ে তিনশো বছর আগে মেগাস্থিনিস বলেছেন শ্রমণরা জন্ম থেকে সন্ন্যাসী নন, তাঁরা সব শ্রেণীর মানুষ থেকে এসেছেন। অতএব তাঁরা ছিলেন সে যুগের সমগ্র জাতীয় জীবনের প্রতিনিধি, তাঁদের স্থাপত্যের সৌন্দর্যের রুচি ও কল্পনার জন্য আমরা তাঁদের কাছে ঋণী।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, অর্থ সংগ্রহের জন্য সন্ন্যাসীরা স্থানীয় রাজা ও শহরের ওপরে নির্ভর করতেন। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জন্য গুহাখনন বা চৈত্য-অলঙ্করণ অতি মহৎ কাজ ছিল। রাজারা বহু গ্রামের সম্পূর্ণ রাজস্ব দান ক'রে দিতেন, তা মঠের সম্পত্তি হয়ে যেত। অভিজাত ব্যক্তি ও বড় বড় মন্ত্রীরা মূর্তি, প্রার্থনা-গৃহ, মন্দির তৈরির জন্য বহু টাকা দান করতেন। কুডা গুহায়* শিলালিপিতে দেখা যায়, রাজার পদস্থ কর্মচারীরা পরিবার ও পুত্রবধূসহ একটা বৌদ্ধ মন্দির তৈরির প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট বহু উপাদানের ব্যয় একত্রে দান করেছেন। এইভাবে সংগৃহীত পুণ্য কর্ম থেকে এই ভক্তিমান, অনুগতদের কাউকে বাদ দেওয়া যাবে না! এখানে অজন্তায় ষোল নম্বর গুহা গড়ে তুলেছেন বরাহদেব নামে বাকাটক-রাজাদের এক মন্ত্রী; সতেরো, আঠারো ও উনিশ সংখ্যক গুহা করেছেন আদিত্য নামে এক সামন্তরাজ বা বড় ভূপতি; কুড়ি নম্বর গুহা করেছেন যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও প্রতিপত্তিশালী এক ব্যক্তি, তাঁর নাম উপেন্দ্র গুপ্ত; আর চৈত্য, অর্থাৎ ছাব্বিশ নম্বর গুহা করেছেন সন্ন্যাসী বুদ্ধভদ্র তাঁর অধীন ধর্মদত্ত এবং শিষ্য ভদ্রবন্ধুর সহায়তায়।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের এভাবে দান করার প্রথা সমগ্র পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত ছিল, এমনকি শৈব ও বৈষ্ণব পরিবাররাও এভাবে দান করত। ক্রমশঃ পরবর্তী কালে নিয়ম

---

* বোম্বাই-এর ৪৫ মাইল দক্ষিণে একটা জায়গা। খুব প্রাচীন গুহা।

হয়ে গেল একটা শিলালিপি লেখা, তাতে প্রার্থনা করা হত যে, এই কাজের পুণ্যফল যেন প্রথমে লাভ করেন দাতার বাবা-মা, তারপর সব জীবিত প্রাণী—এখনও এ প্রথা কিছু বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায়।

তাহলে ষোল ও সতেরো নম্বর গুহা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, বড় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল অজন্তা অঞ্চল, তা বাকাটক রাজাদের অধীন ছিল, মনে হয়, তৃতীয় শতাব্দীর শেষ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এঁরা মধ্যভারতের এক বিরাট অংশ শাসন করেছিলেন, এই বংশ এতটা শক্তিশালী ছিলেন যে, ৪২০ থেকে ৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পাটলীপুত্রের বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্তের বংশের কন্যাকে বিবাহ ক'রে এনেছিলেন।*

কারা এই বাকাটক? কোথায় এঁরা রাজত্ব করতেন? তাঁদের রাজত্ব ও শক্তি কি ধরনের ছিল? ষোল সংখ্যক গুহার শিলালিপিতে আছে যে, রাজা হরিসেন, যাঁর অধীনে এটি এবং সতেরো সংখ্যক গুহা খনন করা হয়েছিল (৫০০—৫২০ খ্রীঃ)। তিনি অন্যান্য জায়গার সঙ্গে উজ্জয়িনী, উড়িষ্যা ও কোশল জয় করেছিলেন। এর থেকে কি আমরা ধরে নেব যে, এঁরা ছিলেন মালওয়ায় শাসনকারী রাজপুত, যে জায়গা সম্বন্ধে হিউয়েন সাং বলেছিলেন এক শতাব্দী পরে যে, বিস্তার ক্ষেত্র রূপে একমাত্র মগধের সঙ্গে এর তুলনা হ'তে পারে? সামন্ত সম্প্রদায় অশ্মক,—যাদের মন্ত্রী আদিত্য সতেরো, আঠারো না উনিশ নম্বর গুহা করেছিলেন—ছিল আশেপাশের অঞ্চলে আবদ্ধ এক স্থানীয় শক্তিমাত্র? যে ছাত্ররা ভূগোলের দ্বারা এসব তথ্যের অনুসন্ধান করবে, ভারতের ইতিহাসের জন্য আজ তাদের কত প্রয়োজন! আসল কাজের জন্য কয়েকটি তথ্য ও সংকেত জুগিয়ে প্রাচীন যুগ আমাদের খুব উপকার করেছে। কিন্তু এখন আমাদের এ সত্য উপলব্ধি করার সময় এসেছে যে, ভারত ইতিহাসের বিরাট প্রবাহে যুক্ত না হ'লে অজন্তারও মূল্য খুব সামান্য। আমাদের জানতে হবে, সে যুগে জীবনের সঙ্গে অজন্তার কি যোগ ছিল, জগতের জন্য সে কি করেছে; কারা তাকে ভালবেসেছে, সেবা করেছে; সে কাজে তারা কেমন আনন্দ পেয়েছে এবং তারা জন্মকালীন পরিবেশের সেই জীবন্ত অতীত সম্পর্কে আরও হাজার তথ্য। অজন্তার সামাজিক পরিবেশ আজও কেউ প্রকাশ করার চেষ্টা করে নি। তবু এই কথাটাই আমাদের জানতে হবে। তখন ধর্মীয় শক্তি ও শিক্ষাকে ঘিরে থাকতে যে উন্নত নগরগুলির সমষ্টি, তা এখনও জাতীয় কল্পনায় আসেনা। তবু সমগ্র অঞ্চলের বিশদ আলোচনার দ্বারা আমরা অজন্তার মত জায়গার উন্নতি সম্বন্ধে সঠিক সূত্র পেতে পারি।

আমরা ভুলে যাই যে, প্রত্যেক যুগই নিজেকে আধুনিক মনে করে, এক সময়ে এই শূন্য কক্ষগুলি মানবজীবনের উষ্ণ স্পন্দনে স্পন্দিত হত, এদের প্রতিটি রেখা, প্রতিটি কারুকার্যের পেছনে ছিল মানুষের ভালবাসা ও বিশ্বাস, মানুষের জন্য

---

* "রাজাদের রাজা, দেবগুপ্ত"—এ কথার আর কোন অর্থ আছে, এটা ভাবা অবান্তর।

চিরন্তন আশ্বাসের ভূমির সন্ধানে এই সব কক্ষের দেওয়ালে, জানালায় মানুষের চিন্তা অবিরাম পাখা ঝাপটাত। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর পেলেও আরও একটা উত্তর বাকী থাকে, সেটাও সমান জরুরী, সমান গুরুত্বপূর্ণ। এত সব কাজ কি ভাবে শেষ হয়ে গেল? ভারতে বৌদ্ধধর্মের মৃত্যুর ইতিহাস এখনো সমালোচনামূলক অনুসন্ধানের যথার্থ মনোভাব নিয়ে লেখা হয় নি, কিন্তু যখন সে কাজ শুরু হবে, তখন কি বিশাল জায়গা আবিষ্কৃত হবে।

এখানে অজন্তার আশেপাশে বহু আকর্ষণীয় এবং সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ বস্তু আছে। রেলপথ চল্লিশ মাইল দূরে এবং দুর্গপ্রাকারে বেষ্টিত পেরি নামক বিরাট পুরনো বাজার ও শহরের বাণিজ্যসম্পর্ক এখানে এখনো দেখা দেয় নি। গুহাগুলির প্রায় আট মাইল উত্তরে রয়েছে ডাকঘরযুক্ত শহর ভাকোস্ত। এর সঙ্গে কি 'বাকাটক' কথাটির কোন যোগ আছে? এক দিকে চার মাইল দক্ষিণে, আবার অন্যদিকে চার মাইল উত্তরে রয়েছে অজন্তা ও ফর্দাপুর শহর। দুটি শহরই মোগল দুর্গসমন্বিত, এতে প্রমাণ করে যে, প্রাচীনকাল থেকে এ অঞ্চল ছিল দৃঢ় ও স্বাধীন। অজন্তায় একটা প্রাসাদ এবং দশটা খিলানযুক্ত এক সেতু আছে, সঙ্গে রয়েছে জলাশয়, এর নীচে সাতটা ফোয়ারা মঠের উপত্যকা পর্যন্ত চলে গেছে।

ফর্দাপুরের মলিন, জীর্ণ গ্রামে আওরংজেবের একটা দুর্গ রয়েছে। এখন তা উট রাখার জন্য ও সরাইখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সমগ্র জায়গাটির চেহারা প্রাচীন, দুর্গনগরীর মত, দুর্গটির চেহারা হঠাৎ রাজগীরে খ্রীস্টের পাঁচ-ছশো বছর আগে বিম্বিসারের যুগে বুদ্ধের প্রবেশের ঘটনাকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। প্রত্যেক প্রাচীরের ভিত্তিও চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত; তার ওপরে বাড়ির মত আকারে পোড়ামাটির স্তর গড়ে তোলা হয়েছে। নীচের অংশ চওড়া, ওপরের দিক্ বেশ সরু এবং একটি প্রাচীর থেকে অন্যটি পর্যন্ত ঢালু অংশ সামান্য অবতল হয়ে গেছে। এমন কি, মোগল-দের ইঁটের দুর্গও চুন-সুরকীর দেওয়ালের প্রাচীন ভিত্তির ওপরে গঠিত। এইভাবে মাটি দিয়ে গড়ে তোলার পদ্ধতি শোনা যায়, বাংলার পশ্চিমাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। নিঃসন্দেহে এপদ্ধতি প্রাগৈতিহাসিক। প্রতিটি বাড়ীর ঢালু চেহারার জন্য দুর্গের মত দেখায়, সত্যিই ওগুলি দুর্গ এবং মধ্যযুগীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে অতি প্রশংসনীয় উপাদানে গঠিত।

(মোগল দুর্গের নীচে প্রাচীন দুর্গের প্রাচীর দেখা না গেলেও আমাদের জানা উচিত, ওখানে দখলকারী সৈন্যদের দুর্গই শুধু ছিল না, প্রাচীন লোকবসতিও ছিল।) এটা প্রথমতঃ বোঝা যায়, এর আকার থেকে। আসলে, এ জায়গা ছিল প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণ, প্রাঙ্গণে একটা ফোয়ারা এবং একটা উপাসনাস্থল ছিল। এর চারিদিকে ছিল শত শত লোকের বাসস্থান, দরজায় ও কোণের স্তম্ভগুলিতে ছিল পদস্থ কর্মীদের বাড়ী। এখানে সমগ্র অঞ্চলের মানুষ, কোন সেনাবাহিনীর বা উপজাতির আক্রমণ ঘটলে স্ত্রীলোক ও গবাদি পশুসহ আশ্রয় নিতে পারত।

দাক্ষিণাত্য যুদ্ধের শেষে দিল্লীর মত শক্তিশালী সরকার যে এখানকার এই অখ্যাত গ্রামকে অধিকার করার যোগ্য ভেবেছিল, তা এই মারাঠা অঞ্চলের শক্তি ও শত্রুতার হাজার হাজার বছরের সুসংগঠিত স্বাধীনতার প্রকাশ।

দুর্গের বাইরে শহরটি প্রাচীরবেষ্টিত, প্রাচীরের ভেতরে প্রবাহিত নদী শহরের দ্বারে পরিখার কাজ করেছে, তার ওপরে এখন তিনখিলানযুক্ত চমৎকার পুরনো সেতুর ধ্বংসাবশেষ দাঁড়িয়ে আছে। সে রাস্তা একটা শহরের বাইরের দরজায় সেতু পেরিয়ে এসে থেমেছিল, সেখানে একটা প্রাকারভিত্তি রয়েছে, এখন সে স্থানকে পবিত্র বলে মনে করা হয়, (সেখানে হিন্দু ও মুসলমান দেবীর পূজা করতে আসে)। এখানে রয়েছে নিম ও অশ্বত্থ বা বোধিবৃক্ষ। গাছ দুটির পায়ের কাছে সিঁদুরে লাল কয়েকটি পাথর এবং ভাঙা কাঁচের চুড়ি মানত করার সাক্ষ্য দেয়।

এই হল ইতিহাস ও প্রাগৈতিহাসিকের মিলন। এই সমগ্র অঞ্চলে আমরা হিন্দুধর্মের সুপ্রাচীন উৎসের কাছাকাছি পৌঁছে যাই। নিম ও ছুঁচলো পাথরের প্রতীক এ জায়গা মিরি-আম্মা বা ধরণীমাতার পূজার স্থান। এখানে সেখানে হনুমানের মন্দিরও আছে। কিন্তু পূর্ণিমার রাতে এক বাড়ীতে এক ব্রাহ্মণকে সত্যনারায়ণের পূজার পাঁচালী পড়তে শুনলেও আমি শিব বা বিষ্ণুর কোন মন্দির দেখতে পাই নি। অজন্তার পথে এই অশ্বত্থ গাছের নীচে হয়ত বৌদ্ধ যুগে সন্ন্যাসীদের ধর্মশালা ছিল। এখানে এই দরজায় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েন সাং ও তাঁর অনুচররা হয়ত কর দিতে থেমেছিলেন অথবা হয়ত চার মাইল দূরের মঠে যাওয়া-আসার পথে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। নিমের পাশে অশ্বত্থ গাছ জায়গাটির পরিবেশের উপযুক্ত, বারোশো বছর আগে জনপূর্ণ মন্দিরের স্মৃতি জাগিয়ে তোলে, এদেশের দীর্ঘ, দীর্ঘ ইতিহাসে ঐ কালের ব্যবধান অপেক্ষাকৃত আধুনিক ঘটনার স্মারক।

৩

হীনযান ও মহাযান

ইতিহাসের ছাত্ররা ইতিহাসের দিক দিয়ে বৌদ্ধধর্মকে রাজগীর, পাটলীপুত্র ও তক্ষশীলাযুগে ভাগ করতে পারে। অথবা, ঐ প্রত্যেকটি যুগে যে রাজা ছিলেন প্রধান, তাঁর নামে আমরা যুগের নাম দিতে পারি। রাজগীর-যুগে প্রধান হ'লেন রাজা বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রু, পাটলীপুত্র যুগে অশোক আর তক্ষশীলা যুগে, কুশাণ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা কণিষ্ক এই নামের যুগগুলি তিনটি প্রধান বুদ্ধ-সঙ্গীতির সমসাময়িক। বৌদ্ধধর্মের সম্পূর্ণ ইতিহাসে মহান কণিষ্কের প্রভাবকে বাদ দেওয়া যায়না। কারণ, চৈনিক ভ্রমণকারীরা বলেছেন, তাঁর যুগ থেকে বিখ্যাত মহাযানবাদ বা উত্তরপন্থী মতবাদের সূচনা, এই মতবাদে চীন, জাপান, তিব্বত প্রভাবিত হয় আর ব্রহ্ম, সিংহল ও শ্যামদেশ দক্ষিণীবাদ বা হীনযানের অনুবর্তী হয়।

আজও পর্যন্ত এই দুটি দলের অনুগামীদের মধ্যে বিরাট বিদ্বেষ। উত্তরপন্থীরা কণিষ্কের সঙ্গীতির দ্বারা বৌদ্ধশাস্ত্রগুলির নতুন রূপদান করে। দক্ষিণীদের অবলম্বন সহজ ও প্রাচীন বইগুলির মধ্যে রয়েছে তিনটি ত্রিপিটক।

অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে হিউয়েন সাঙের শিষ্যদের মতে মহাযানের বিশিষ্ট মতবাদ হল, এক পার্থিব ও শ্রেষ্ঠ বুদ্ধসহ বোধিসত্ত্বদের শ্রদ্ধাপ্রদান। দক্ষিণী বা হীনযানরা বোধিসত্ত্বের প্রতি আনুগত্য প্রচার করে না। কিন্তু সহজেই বোঝা যায়, এই সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার আড়ালে রয়েছে দৃষ্টিভঙ্গী ও শিক্ষার বিরাট পার্থক্য। ভারতীয় ও হিন্দু ধর্মগুরুর প্রবর্তিত কোন ধর্ম-আন্দোলনের পর্যালোচনা করতে গেলেই দুটি বিরোধী প্রভাব চোখে পড়বে, দুটির জন্ম প্রায় এক সময়ে। প্রথমটি হল, স্বয়ং গুরুর ব্যক্তিগত উপলব্ধির অতিদার্শনিক মতবাদ ও নেতিবাদের ধারা। কোন দেবতা নেই, কোন মূর্তি নেই, কোন অনুষ্ঠান নেই, রয়েছে শুধু চারদিকে জগৎরূপ মায়া এবং প্রকৃতি, তার মনে এই ধারণাই প্রবল হয়ে দেখা দেয়। স্বর্গের কথা ভাবা চলবে না, আত্মার একমাত্র সম্ভাব্য লক্ষ্য হল পূর্ণতা। ইত্যাদি। কিন্তু সেই সঙ্গে ভারত ও জগতের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য গভীর সহানুভূতি থাকায় সবরকম জটিলতার পথ খুলে দেওয়া হয় এবং শিষ্য হাজার রকম বস্তু গ্রহণ করতে পারে (উচ্চতর সত্যের আহ্বানে যে সব বস্তু সে ত্যাগ করেছিল, তারও দু-একটা গ্রহণ করতে পারে)। বিদেশীর মনে ভারতীয় ধর্মগুরুর এই দ্বিমুখী প্রভাব সর্বদা দেখা দেয়।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে এই ঘটনাই আমরা দেখতে পাই। এখানে প্রথম যুগের সম্প্রদায়ের প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত দক্ষিণী দেশগুলি বুদ্ধের সম্প্রদায়ের বিশ্বাসগুলির কঠোর ও ব্যক্তিগত ধারণাকে পেয়েছিল। এই মতবাদ নিরীশ্বরবাদী, শূন্যবাদী এবং চরমরূপে দার্শনিক, কঠোর। অশোকের রাজত্বেও আমরা বেষ্টনী, স্তম্ভ, স্তূপনির্মাণ, পবিত্র জায়গায় মহিমাপ্রচার, পবিত্র স্মারকের পূজা দেখতে পাই, কিন্তু পরে যে অসংখ্য বাহ্যিক উপাদানকে গ্রহণ করা হয়েছিল, তার চিহ্নও দেখি না।

বহু বড় বড় চৈত্য অশোক-যুগ ও খ্রীস্টযুগের মাঝে তৈরি হয়েছিল, কিন্তু এই সময়ের স্তূপগুলি নিরাড়ম্বর স্মারকমাত্র। দাগোবাতে কোন মূর্তি নেই, যদিও সাধারণতঃ ওখানে অশোকযুগের বেষ্টনীর অলঙ্করণ থাকত। এই প্রাচীন যুগে ভাস্কর্য ছিল, কিন্তু সর্বদাই তা ধর্মব্যতীত অন্য কাজে ব্যবহৃত হত ব'লে মনে হয়, যেমন, কার্লে বা ভারহুতে। মনে হয়, এই যুগে বুদ্ধের প্রতি ভক্তির ধর্মীয় প্রতীক ছিল গাছ, স্তূপ, বেষ্টনী, অশ্বক্ষুরাকৃতি অলঙ্করণ, কখনো বা পদচিহ্ন। সে যুগে এই নিরাভরণ, সহজ রূপ যে ভক্ত মনে কতটা সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা জাগাত, তা আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারি না।

অবশ্য, কণিষ্কের সঙ্গে বোধিসত্ত্বের যে স্বীকৃতি দেখা দিয়েছিল, সে যুগও দীর্ঘকাল-

ব্যাপী। এতে যথার্থই বোঝা যায়, যাকে এশীয় সমন্বয় বলে, পরে অথবা আগে, সেটি অম্নবিস্তর সম্পূর্ণ গৃহীত হয়েছিল। মনে হয়, এর সঙ্গেই একত্র বজায় ছিল বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের উপাসনা। বস্তুতঃ এই মতবাদের উদ্ভবের জন্য ভারত তখন থেকে বিখ্যাত। খ্রীস্টধর্মে যাকে অবতারের ধর্ম বলা হয়, যে পূজাপদ্ধতির জন্য প্রোটেস্ট্যান্ট ইংল্যাণ্ড গত পঞ্চাশ বছরে দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে, এ হল সেই প্রবণতার প্রকাশ। এর আগে বুদ্ধের পূজা বৌদ্ধধর্মে প্রচলিত থাক বা না থাক, যে কেউ প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি পড়েছে সেই বুঝবে যে, বৌদ্ধধর্ম চিরকাল এরকম মতবাদের জন্য প্রস্তুত ছিল। প্রত্যেক বার তাঁর নাম উল্লেখ করলে একটা সূক্ষ্ম আবেগ দেখা দিত। প্রাচীন লেখকদের কাছে তাঁর প্রতিটি আচরণ যে অত্যন্ত পবিত্র ছিল, তা বোঝা যায়। মহানির্বাণের মুহূর্তের মত প্রাচীন স্মারকপূজার প্রথাকে প্রমাণ হিসেবে তুচ্ছ করা যায় না। বুদ্ধের ঈশ্বরত্ব এবং তাঁর আবির্ভাবের জন্য দীর্ঘদিন প্রস্তুত জগতে তাঁর অলৌকিক জন্ম ১৫০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত একটা থিলানের মূল প্রেরণা ছিল। মায়ার জগতে যারা আপন কর্মফলে আনীত হয়, তাদের চেয়ে অনেক মহত্তর ও প্রসন্ন এক আত্মার আত্মপ্রকাশের ছবি আমরা এখানে পাই। এই তত্ত্ব খ্রীষ্ট, রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য ইত্যাদি নামে নানা সময়ে, নানাস্থানে আমরা দেখতে পাই। এমনকি, পারস্যের বাব যে ধারণার ফলে এই ভারতীয় "কুসংস্কারে" ধরা দিয়েছিলেন, তার জন্য তিনি ঋণী।

এই আন্দোলন অজন্তায় ক্ষোদিত প্রত্যেক নতুন বিহারে বুদ্ধমন্দির স্থাপন করেছিল। সাত অথবা এগারো নম্বর গুহা, কোন্‌টি বেশী প্রাচীন, বোঝা কঠিন; কিন্তু প্রত্যেকটির মন্দিরে মূর্তি আছে। এই সময়ের আর একটি উন্নতির সঙ্গে এই সত্যের যোগ আছে। ভিক্ষুগৃহসহ প্রাচীন মঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হতে শুরু করে। এই নতুন উচ্চাশবাদী বিহারগুলির প্রত্যেকটি একসঙ্গে মহাবিদ্যালয় ও মঠ। ব্রহ্ম ও জাপানকে দেখে আমরা এই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত, এতে প্রত্যেক ছাত্র মাঠের তত্ত্বে শিক্ষানবীশ। আজকের দিনে অক্সফোর্ড অনেকটা এরকম দেখা যায়। এটা যে অজন্তার ছিল্, এ বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে না। বিদ্যার স্থানরূপে সঙ্ঘারামের কাজে এইভাবে জোর দেওয়ায় সেই বিখ্যাত গুরুর মূর্তি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। একত্র উপাসনার জন্য চৈত্যকক্ষগুলি সর্বদা উপযুক্ত হত। নিশ্চয় মন্দিরের মূর্তির সামনে সকাল ও সন্ধ্যায় কোন অনুষ্ঠান করা হত—সর্বোপরি, মূর্তির সামনে ধূপ জ্বলত—কিন্তু এর আসল উদ্দেশ্য ছিল, সেই বিরাট গুরুর কথা ছাত্রদের মনে জাগিয়ে রাখা, সেই স্বর্গীয় শিক্ষক ও আদর্শের অদৃশ্য উপস্থিতিতে সব কাজ হত। অজন্তার জীবনের এই শিক্ষাগত দিকের সাক্ষ্য রয়েছে একটি যুগে ক্ষোদিত বিহারের দীর্ঘ সারিগুলিতে। চার থেকে এক নম্বর গুহা সতেরো নম্বর গুহা থেকে বেশী দূরে নয়, এই সত্যের একমাত্র ব্যাখ্যা এটিই হতে পারে। এই সব মঠ-বিদ্যালয়ে কিরকম শিক্ষা দেওয়া হত,

তা হিউয়েন সাঙের লেখায় পড়ি। প্রথম থেকে বইগুলি অবিরাম মঠকক্ষে পড়া হত। কিন্তু সাধারণ শিক্ষাও মাঝে মাঝে চর্চা করা হত—স্পষ্টতঃ আমাদের নালন্দা কথা বলা হয়েছে, সেখানে গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা পড়ানো হত এবং রাষ্ট্রীয় জলঘড়ি দ্বারা মগধ রাজ্যের জন্য সময় গণনা করা হত।

অজন্তার ভাস্কর্যের সব উন্নতি কণিষ্কযুগের নয়। কয়েক শতাব্দী পরে উনি নম্বর গুহার সম্মুখভাগ দেখলে বোঝা যায়, মহামানববাদ কি অপূর্ব উপায়ে বিভি উপাদানের সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের পথ খুলে দিয়েছিল। সেখানে শুধু গুরুরূপী বুদ্ধের প্রতি চিহ্ন ও পায়ের দাগই পবিত্র বলে মনে করা হত না, উপরন্তু মহান ঐতিহাসিক চরি রূপে বহুভাবে, বহু দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তাঁর মূর্তিকে অঙ্কিত করা হয়েছে। তাঁকে সম্রাটরূপে আঁকা হয়েছে। তিনি ধর্মের পতাকা বহন করছেন। তাঁর ভঙ্গী এব চারদিকের শ্রদ্ধানত মূর্তিগুলির বিন্যাসে একটা স্বাধীনতা রয়েছে। সেই স অশোক-যুগের বেষ্টনীর বদলে দাবার ছকের মত অলঙ্করণের পুনর্ব্যবহার গান্ধার প্রভাবের প্রমাণ, এ রকম অলঙ্করণ এখন বিস্মৃত। সে রকম অশ্বক্ষুরাকৃ অলঙ্করণের মধ্যে পদ্মের বদলে হাসিমুখের ব্যবহার প্রাচীন, বিশুদ্ধ ভারতী ভাবধারার ওপরে বিদেশী প্রভাবের বিজয়কে প্রমাণ করে। বুদ্ধ মূর্তির গায়ে বিশেষ পোষাকটিও তার প্রমাণ। আমার এই পোষাককে চৈনিক তাতারের চেয়ে পশ্চিম এশীয় পোষাক ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ কথা বলা দরকা যে, এ পোষাক খাঁটি ভারতীয় নয়। উনিশ নম্বর গুহার তারিখ কি? কণিষ্কে সময় ১৫০ খ্রীঃ বা তার কাছাকাছি, সতেরো নম্বর গুহার সময় ৫২০ খ্রীঃ। সতের নম্বরের শিলালিপিতে উল্লিখিত গন্ধকুটী বা মূর্তিগৃহরূপে উনিশ নম্বর গুহাকে ধরে নেওয়ার একটা প্রথা রয়েছে। সমালোচকরা গঠনরীতির মিল দেখে এদের সমসাময়িক বলেছেন। আমার নিজের মনের কথা বলতে হলে বলব, আমি এরকম মিল দেখতে পাই না। আমার বিশ্বাস, গন্ধকুটী হ'ল সতেরো নম্বরে পেছনের মূর্তিগৃহ। অনুরাগী প্রতিষ্ঠাতা নিশ্চয় এটাকে, গুহাকে এবং জলাধারকে তিনটে আলাদা বস্তু বলে মনে করতেন। এর সমর্থনে আমি হিউয়েন সাঙের রচনা উল্লেখ পেয়েছি, তিনি গন্ধকুটী বা সুরভি-গৃহের কথা বলেছেন, অর্থাৎ, তক্কের রাজবে বিহারে ধুপ জ্বালানো হত। আমার মনে হয় না, সতেরো নম্বরের সমকালে বা তা নির্মাতার দ্বারা উনিশ নম্বর গঠিত হয়েছিল। আমার মনে হয়, এটা অনেক পরে নির্মিত এবং আরও প্রগতিশীল, পুরোপুরি ভারতীয়। সেই সঙ্গে মনে হয়, নিশ্চ এটা হিউয়েন সাঙের বর্ণিত "মহা-বিহার"। তিনি বলেছেন, সে বিহার ১০০ ফিট উঁ এবং তার মাঝে বুদ্ধের ৭০ ফিট উঁচু পাথরের মূর্তি রয়েছে। তার ওপরে সাতধাপে একটা পাথরের চাঁদোয়া আছে, সেটা ওপরে উঠে গেছে এবং দেখলে মনে হয়, শূ ঝুলছে। ভাষার ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ হয়েছিল এটা ধরে নিচ্ছি। যারা গুহা দেখেছে তা ঠিকভাবে পরিভাষাগুলি ব্যবহার করেছে; তবু এই গুহার খ্যাতি ও সৌন্দর্য যথ

ছিল, তখনকার দর্শকের দেখার সুন্দর বর্ণনা এতে পাওয়া যায়। আমার ধারণামত এই গুহা যদি ৬০০ খ্রীঃ ক্ষোদিত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ শতাব্দীর মাঝামাঝি চৈনিক ভ্রমণকারী যখন এ মঠ দেখেছেন, তখন এটি ছিল অজন্তার প্রধান উপাসনাস্থল এবং অন্যতম আকর্ষণ। এই গুহা সম্পর্কে অন্ততঃ আর-একটি বিরাট তাৎপর্য রয়েছে। এ গুহার ভাস্কর্যের বুদ্ধ মূর্তির সঙ্গে জাভার বোরোবুদুরের ভাস্কর্যের রীতির মিল রয়েছে। মনে হয়, তখন রীতিটা যেন সবে গড়ে উঠেছিল। পোষাকের ধরন একরকম এবং দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তির ভঙ্গীতে অনেকটা এক ধরনের সৌন্দর্য ও শান্তভাব, কিন্তু গভীরতার প্রকাশ এক্ষেত্রে চরম পর্যায়ে পৌঁছয় নি। মিঃ হ্যাভেলের ছবিতে দেখা যায়, জাভার বুদ্ধমূর্তিতে একটা অলৌকিক মহিমা রয়েছে। তার সঙ্গে এই মূর্তিগুলির তুলনা হয় না। তবু তার আভাস রয়েছে। এবং ভেতরে স্তূপের ওপরের বড় আবক্ষ মূর্তিতে সেইরকম দৃষ্টি দেখা যায়? যে অভিযান জাভাকে উপনিবেশে পরিণত করেছিল, শোনা যায়, তা সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে পশ্চিম ভারতের গুজরাট থেকে এসেছিল এবং তারা সুকুমার কলার এই ধারণা নিয়েই ফিরে গিয়েছিল।

হিউয়েন সাঙের এই মঠ পরিদর্শনে আমরা যে অপূর্ব বিশ্বজনীনতার উদাহরণ পাই, তা সম্ভবতঃ এখানকার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল। চৈত্য নিজে অতি স্পষ্ট ক'রে যা বলে, এটা সেই কথাকেই অন্যভাবে বলা। ভারতের সব জায়গা থেকে চীনা, গান্ধার, পারসিক ও সিংহলী উপাদান মিশে এই জটিল ও অপূর্ব স্থাপত্য গড়ে তুলেছে। বাইরের থামগুলির মণিমুক্তার মত কারুকার্য আমাদের মগধের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভেতরের অপূর্ব স্তম্ভগুলি আমাদের মনকে এলিফ্যাণ্টার, হয়ত রাজপুত রাজত্বে নিয়ে যায়। ভক্তদের বসার জায়গা ও স্তম্ভের ওপরের অংশের কারুকার্য আগে পলেস্তারাযুক্ত ও রঙীন ছিল। এক সময়ে স্তূপও চুনরঙে ঝকমক করত। অতএব ভেতরের অংশও নিশ্চয় সে যুগের উদার রুচি অনুযায়ী সজ্জিত ছিল। মধ্যভারতে বাকাটক বংশ যে সাম্রাজ্য শাসন করত, সেখানে নিশ্চয় খুব উঁচু স্তরে পৌঁছেছিল। সে রাজ্যে বিদেশী শক্তির সঙ্গে উদার ও স্বাভাবিক যোগাযোগ ঘটত। সর্বোপরি, মঠের আতিথেয়তায় প্রাচীন বিশ্বজনীন ছাত্রজীবন সবরকম স্বাধীনতা লাভ করত। যে স্বর্গীয় জগতে অবিরাম নানা উপাদানে বেড়ে চলছিল, সেখানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব ছিলেন অসাধারণ সত্তা। বাইরের ছোট অংশটির ভাস্কর্য সম্পূর্ণ হিন্দু, যেন বলছে যে, তীর্থযাত্রী গৃহস্থের কম সংহত ধর্মীয় ভাবধারা ও প্রীতির প্রতি মঠের মনোভাব কঠোর ছিল না। যে পৌরাণিক মত জাপান, চীন ও ভারতে প্রায় একরম, মহাযান মতের আড়ালেও সেটি ছিল। এর ফলে ভারতের সব পবিত্র ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ গ্রন্থকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া হয়েছিল। হিউয়েন সাং শিষ্যদের ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে পাণিনির মন্তব্য শিক্ষা দিতেন। সে যুগের প্রাকৃতিক জ্ঞান, যোগ ব্যাখ্যা করার সঙ্গে স্মৃতিসৌধ ও মন্দিরের বিষয়ে বুঝিয়ে দিতেও সমান

আগ্রহী ছিলেন। বস্তুতঃ মহাযানবাদ গঠিত হওয়ার পরেই ভারত এশিয়ার জ্ঞান-জগতে নেতা ও প্রধানরূপে সন্দেহাতীত খ্যাতি লাভ করেছিল।

৪

ভারতীয় শিল্পে গ্রীক প্রভাবের তত্ত্ব

বর্তমানে বহু বিচিত্র জায়গা থেকে উদ্ভূত বহু বিচিত্র ও নৈরাশ্যজনক তত্ত্বের শিকার হল ভারতবর্ষ। চিকিৎসকরা আমাদের বলছেন, নির্বাণে বিশ্বাস বদহজমের লক্ষণ; জাতিতত্ত্ববিদ্‌রা বলছেন, গ্রীষ্মকালীন দেশের বাসিন্দারা উন্নত যোগ্যতম অধিকারী হতে পারে না; ঐতিহাসিকরা বলছেন যে, বাদামী রঙের লোকরা কখনো সাম্রাজ্য গঠন করে নি, ইত্যাদি। সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতার নামে এই সব পক্ষপাতী ব্যক্তিদের বক্তব্যের মধ্যে ভারতের জনগণের কাছে সবচেয়ে নৈরাশ্যজনক বোধ হয় এই কথা যে, তাদের প্রাচীন জাতীয় শিল্প ও বিদেশীয় উৎস থেকে গৃহীত ঋণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। "শুধু দেশীয় ছদ্মবেশে তাকে নিখুঁতভাবে সাজানো হয়েছে।" এ সব মতকে যে রকম মজার মনোভাব নিয়ে উড়িয়ে দেওয়া উচিত, ভারতের অবস্থা এখন সেরকম নয়। আপাততঃ তার স্বরূপ ও নিজস্ব জগৎ সম্বন্ধে সত্যকে জানার খুব দরকার। তাকে আপন অতীত ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি, নিজের সত্তায় প্রবাহিত গঠনমূলক যে শক্তি তার দান নিয়ে নিজের সীমানার বাইরে অন্য জাতির কাছে মাঝে মাঝে পৌঁছেছে, তার কথা জানতে হবে। যখন সে নিজেকে এইভাবে দেখবে,—নিজেকে হীন, ক্ষুদ্র, তুচ্ছ বলে ভাববেনা, ভাববে সে সব ভাবধারা, বিশ্বাস ও সভ্যতার গতিময় কেন্দ্রস্বরূপ, পৃথিবীর সব মানুষের প্রেরণার সে উৎস, তখন তার পক্ষে আর অকর্মণ্যতা, জড়তায় মগ্ন হওয়া অসম্ভব হবে। যখন সে বড় বড় কথার দ্বারা নয়, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও গৌরবময় তথ্যের দ্বারা বুঝবে তার অতীত কত মহান ও প্রাণশক্তিময় ছিল, তখন একটিই ফল হতে পারে। সে নিজের যোগ্য ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবে। অনেকের কাছে যা খুব তুচ্ছ যুক্তি মনে হবে, এই সব তথ্যের দ্বারা তাকে আরও ভাল ক'রে বোঝা যাবে।

ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের স্থাপত্য পাশ্চাত্ত্য থেকে এসেছে, এই ধারণার বিপরীতে আমার বিশ্বাস যে, ঐ স্থাপত্য ভারত ও ভারতীয় বৌদ্ধ মনের সৃষ্টি; মগধ, বর্তমান বিহার, ছিল তার উৎস ও প্রধান কেন্দ্র; ঐ কেন্দ্র থেকে তা আপন আদর্শকে সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে, সে প্রভাবের সীমা নির্ণয় করা এখনও কঠিন। এই আলোচনার উদ্দেশ্য হ'ল দেখানো যে, বিশেষভাবে গান্ধার ও ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রে প্রকৃতির নিয়ম উল্টে যায়নি, সন্তান মাকে জীবন দান করেনি অথবা, যে দেশে এই শিল্পের চর্চা তার থেকে অনেক দূরের দেশ এর উৎস নয়। বিপরীত মতের অভিজ্ঞ সমর্থকরূপে অধ্যাপক গ্রুনুওয়েডেল পণ্ডিতদের মধ্যে স্বীকৃত। এ বিষয়ে তাঁর বই

'ভারতে বৌদ্ধ শিল্প' মূল্যবান উপাদানের খনিস্বরূপ। অবশ্য আমার মনে হয়, তিনি যদি ভারতের পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ ক'রে বুদ্ধের জীবৎকাল ও জাভার বোরোবুদুরে নির্মাণের মধ্যবর্তী সময়ে ধর্মীয় ঘটনাগুলির প্রাণময়তা ও শক্তি দেখাতেন, তাহ'লে তিনি যেভাবে উপাদানগুলিকে ব্যবহার করেছেন, তা করা অসম্ভব হ'ত। বৌদ্ধধর্ম হল ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় প্রতিভার ফল। নিজের পথে প্রতি পদক্ষেপে সে নতুন বিশ্বাস জাগিয়ে তুলেছে এবং হিন্দুধর্ম থেকে তার জন্ম নেওয়ার সময় যেহেতু নিরূপণ করা যায়, অতএব, বৌদ্ধধর্মের পূর্বের চরিত্র জানবার আমাদের নিশ্চিত উপায় আছে। যখন বিহারে বৌদ্ধধর্ম বিশ্বমাতার ভাবধারাকে গ্রহণ করছিল, যখন বাংলায় হিন্দুধর্ম বহুভুজাকে গ্রহণ করেছিল তখন জাভার গুজরাতী রাজারা যে সব মঠ নির্মাণ ও যে ভাস্কর্যকে উৎসাহদান করছিলেন, তাতে আদিবুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে দেখা দিয়েছেন প্রজ্ঞাপারমিতা। মগধের এই অবস্থা, আমার মতে সমগ্র ভারতীয় ইতিহাসের উন্নতির একমাত্র ব্যাখ্যা। সে উন্নতিতে গান্ধার শিল্প এবং তার সঙ্গে পাশ্চাত্য শিল্পের সম্বন্ধে নেহাতই একটা ঘটনামাত্র। আমার অনুমান হচ্ছে, বরং ঐ শিল্পের গুরুত্ব পরবর্তী যুগে ইউরোপের খ্রীষ্টান শিল্পে খুব বেশি।

বুদ্ধকে দুটি পৃথক এবং বিপরীত দৃষ্টিতে, দেখার চেয়ে বেশী আর কিছু অজন্তার বোঝা যায় না। এর একটি দেখি মন্দিরের বুদ্ধমূর্তিতে, এটি বারাণসীতে প্রথম উপদেশের সময়ের। বুদ্ধ সিংহাসনে বসে আছেন,মাথার পেছনে জ্যোতির দিকে দেবতারা উড়ে আসছেন। তাঁর আসনের নীচে রয়েছে প্রতীকী পশুরা, আর তাদের মাঝে রয়েছে ধর্মচক্র। প্রভুর দেহে রয়েছে সূক্ষ্ম সাদা মসলিনের উত্তরীয়। কোন-না-কোন ভাবে সিংহাসনে পদ্মের আভাস রয়েছে, হয়ত বস্ত্রের ভাঁজের আকারে। এইসব দিক দিয়ে, আমাদের মনে সারনাথ ও সাঁচীর বুদ্ধের যে ছবি আছে, সেই ধরনের সঙ্গে খুব নিকট-সাদৃশ্য দেখা যায়। এখানে বুদ্ধের মুখে সারনাথের চেয়ে অনেক বেশী পৌরুষ—এই মূর্তির আড়ম্বর ও নিপুণতায় বোঝা যায়, এটি ঐ রীতির পরবর্তী সময়ে গঠিত—কিন্তু সব মিলিয়ে সেই একই উপাদান রয়েছে: উড়ন্ত দেব, চক্র, পদ্ম আর জ্যোতি; বস্ত্রও সেইরকম সূক্ষ্ম, প্রায় অদৃশ্য। বিশেষ ক'রে পনেরো নম্বর গুহার মূর্তির মাথা থেকে জ্যোতিকে বিচ্ছিন্ন করায় যে ছায়ার সৃষ্টি হয়েছে, তাতে মূর্তিটিতে প্রাণের ও মুক্তির ভাব দেখা দিয়েছে এবং অসাধারণ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। বহু উদাহরণের এটি অন্যতম, এতে রীতিকে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয় নি, কিন্তু একটা সাধারণ প্রতীকী প্রথার ভিত্তিতে অজন্তা বা সাঁচী বা সারনাথের ভাস্কর্য গড়ে উঠেছে। সাত, এগারো, পনেরো, ষোল ও সতেরো নম্বর গুহায় এই বুদ্ধ রয়েছেন, নিঃসন্দেহে ঐ গুহাগুলি উনিশ নম্বরের পূর্ববর্তী। ছয় থেকে এক নম্বর পর্যন্ত গুহাতেও একই রকম বুদ্ধ দেখা যায়, কিন্তু এগুলি সতেরো-র আগে ক্ষোদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় উনিশ নম্বরের পূর্ববর্তী যুগের ওপর নির্ভরশীল কোন যুক্তি আমরা এক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাইনা। অতএব ঐ রীতির পরিবর্তনের সময়ে

এগারো থেকে সতেরো নম্বর গুহায় প্রাপ্ত সারনাথ বুদ্ধের ওপরেই আমরা শুধু নির্ভর করব।

উনিশ নম্বর গুহায় আমরা হঠাৎ এক নতুন রীতির সাক্ষাৎ পাই। এখানে বিরাট দাগোবায় বুদ্ধ দাঁড়িয়ে আছেন, সাধারণতঃ এটি শিক্ষাদানের ভঙ্গীরূপে পরিচিত; অবশ্য প্রকৃতপক্ষে, যে সন্ন্যাসী ও ছাত্ররা বিহারগুলি ব্যবহার করতেন, তাঁরা সম্ভবতঃ প্রথমতঃ উপদেশদানের ভঙ্গীটিকে বুদ্ধের শিক্ষাদান বলে মনে করতেন। সে যাই হোক, দণ্ডায়মান বুদ্ধ দাগোবায় মসলিনের বস্ত্রের ওপরে একটা চোগা পরে আছেন। এই চোগা-জাতীয় পোষাক কণিষ্কের স্বর্ণমুদ্রায় দেখা যায়। আসলে এটা শীত রঙের পোষাক, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর পীত উত্তরীয় মাত্র নয়। এটা অজন্তা ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের শীতল অঞ্চলের যোগাযোগের স্পষ্ট ও সন্দেহাতীত প্রমাণ, ঐ সময়ে মধ্য ভারতের বৌদ্ধ প্রতীকবাদের ওপরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়। অন্যান্য গৌণ প্রমাণের দ্বারাও এই প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, সে বিষয়ে এখন আমাদের আলোচনা করার দরকার নেই। এখন প্রশ্ন হল, ভারতের শিল্পের ওপরে উত্তর-পশ্চিমী প্রভাবের এই ধারার কাছেই কি ভারত সারনাথ-বুদ্ধের ভাবধারার জন্য ঋণী?

সাধারণভাবে বলতে গেলে, আমরা এই ধারণায় অভ্যস্ত যে, যে জায়গায় আমরা ঐ শিল্পরীতি দেখতে পাই, মোটামুটি ঐ অঞ্চলেই তা উদ্ভূত হয়েছিল। ভেলাসকুয়েজ যে স্পেনের বা টাইটিয়ান ভেনিসের, একথা আমাদের বিশ্বাস করাতে কোন যুক্তির দরকার হয় না। একথা না জানলেও আমরা ধরে নিতাম। অবশ্য এতদিন পর্যন্ত এই নিয়মের ক্ষেত্রে ভারত ছিল ব্যতিক্রম। তার অতীত অনুধাবন করলে প্রচুর বৈদেশিক প্রভাব দেখা যায়। আধুনিক পদ্ধতি বাইরে থেকে দেশের ওপরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এ ঘটনা যে আগে ঘটেনি, এটা যে ভারতীয় উন্নতির একটা বৈশিষ্ট্য নয়, একথা বহিরাগতদের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত। জার্মান পণ্ডিত গ্রুনওয়েডেল বৌদ্ধ শিল্পের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বারবার এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন যে, ভারত বিদেশী সূত্র থেকে তার নতুন ভাবধারাগুলি পেয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্য সম্পর্কে দীর্ঘকালের গবেষণার সদ্যোপ্রাপ্ত ফলগুলির দ্বারা অভিভূত ফার্গুসন বৌদ্ধ শিল্পে খাঁটি দেশীয় উপাদানকে অবজ্ঞা করতে পারেন নি এবং গান্ধার-রীতির দ্বারা অনেক কম প্রভাবিত হয়েছেন, পরবর্তী গবেষকদের তুলনায়। বোধ হয়, এ কথাটা জানা দরকার যে, ঐসব লেখকদের সকলেই বৌদ্ধ প্রতীকবাদে দেশীয় অবদানের তুচ্ছতার বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন, সবচেয়ে বেশী নিশ্চিত এঁদের মধ্যে আধুনিকতম ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর 'ভারতের প্রাচীন ইতিহাস'-এ। একথা উল্লেখযোগ্য, কারণ, এতে আমাদের মনে করিয়ে দিতে পারে যে, বৌদ্ধ রীতির ওপরে গান্ধার প্রভাবের মত এত দৃঢ়, নির্দিষ্ট বিষয়ের আমাদের প্রমাণিত সত্যের চেয়ে একটা প্রবল সংস্কারের সম্মুখীন হতে হয়। ফার্গুসনের চেয়ে মত-গঠনের ক্ষমতা ভিনসেন্ট স্মিথের বেশী নয়।

বরং, অনেক বিষয়ে তাঁর যোগ্যতা কম, অথচ, তাঁর মত অনেক বেশী দৃঢ়। একজন যাকে অনুমানভিত্তিক প্রস্তাব হিসেবে বলেছে, অন্যজন তাকেই ভিত্তিরূপে ব্যবহার করে। সাধারণতঃ আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকেরা যা বিশ্বাস করতে চায় বা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, তাই সে বিশ্বাস করে এবং প্রত্যেক প্রবল বিশ্বাসের ক্ষেত্রে পূর্বনির্ধারিত ধারণা কিছুটা থাকে। তাই বৌদ্ধ মূর্তিবাদের উদ্ভব সম্বন্ধে এখন যে ভয়ংকর মত রয়েছে, তার ভিত্তি আমাদের সাবধানে পরীক্ষা ক'রে দেখতে হবে। বরং ঐ মত আমাদের পরীক্ষা ক'রে দেখার যোগ্য। যে তিনটি বিখ্যাত নাম বলা হয়েছে, তার মধ্যে যে ভারতকে সবচেয়ে বেশী জেনেছে এবং বৌদ্ধ শিল্পে বৈদেশিক প্রভাবকে তেমন গুরুত্ব দেয় না, তার মতটি প্রবল। আর একজন প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় শিল্পকে জানে না, সাধারণ মতের দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়, বলে এ শিল্পের উদ্ভব বিদেশে এবং দেশের অক্ষমতা অযোগ্যতার কথা প্রসন্নভাবে বলে।

বৌদ্ধ যুগে ভারতীয় শিল্পে বৈদেশিক প্রভাব সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন মত রয়েছে। একটি হল, প্রথম থেকে ভারত প্রায় সব শিল্প-সংক্রান্ত বিষয় বিদেশ থেকে নিয়েছে। অশোকস্তম্ভগুলি পার্সিপোলিসের মত, পাখাযুক্ত পশুগুলি অ্যাসিরীয়, পদ্ম ও লতাগুলি পশ্চিম এশীয়। যে দল এইভাবে দেখায় যে, শিল্পের ক্ষেত্রে ভারতের কোন মৌলিকতা নেই, সে দল বৌদ্ধ প্রেরণার উৎস সন্ধান করে আলেকজাণ্ডারের যুগ থেকে ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীক কারিগরদের বসতিতে। এই গ্রীকদের বংশধররা ভারতীয় শিল্পের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এভাবে যা আসে নি তা পারস্য প্রাচ্যকে দিয়েছে। এই দুটি উৎসের মিলনে শিল্পক্ষেত্রে ভারতের মহত্বের জন্ম, একাহিনী আমরা নিঃসন্দেহে, প্রসন্নমনে গ্রহণ করতে পারি।

অন্য মতটি পবিত্র মূর্তিরূপে বুদ্ধমূর্তির বিবর্তনের ওপরে বিশেষভাবে, নির্দিষ্টভাবে জোর দেয়। বলা হয়, এটা ভারতীয় আবিষ্কার নয়। প্রথম এ ভাবধারার সূচনা ঘটেছিল ভারত ও পাশ্চাত্যের মিলনস্থল গান্ধারদেশে। এখানে, খ্রীস্টযুগের প্রারম্ভ এবং ৫৪০ খ্রীস্টাব্দে যখন অত্যাচারী মিহিরকুল সব ধ্বংস করেছিল, দুটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়ে স্তূপ ও মঠ আকারে বৌদ্ধধর্মের প্রভূত উন্নতি হয়। এই বৌদ্ধ উন্নতিতে যে ইউরোপীয় উপাদানগুলি দেখা যায়, তার সংখ্যা সম্বন্ধে গ্রুনওয়েডেলের যুক্তি গ্রহণ করা যায়। এখনও আলোচ্য অঞ্চলে অত্যন্ত শিল্পোন্নত জনমণ্ডলী বাস করে, কাশ্মীরে ও উত্তর পাঞ্জাবেও এরা রয়েছে প্রায় তিব্বত পর্যন্ত এবং আফগানিস্তান ও পারস্যের অপর প্রান্তে এ জায়গায় যে জাতিগুলি রয়েছে, সূক্ষ্ম শিল্পের সব শাখাতে এদের নিপুণতা প্রশ্নের অতীত। কোন উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক যুগে অসাধারণ নতুন উপাদান প্রচুর পরিমাণে এলেও ওরা তা দ্রুত গ্রহণ করতে পারবে। এ ঘটনা যে ঘটবেই, সেটা ওদের অসাধারণ কুশলতার অঙ্গ। কাশ্মীরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে স্বভাবতঃ গান্ধারের বৌদ্ধ কার্যকলাপ

দেখা দিয়েছিল এবং হিউয়েন সাঙের মাধ্যমে জানতে পারি, প্রথম শতাব্দী ও ৫৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তা প্রবল ছিল, এমনকি সোৎসাহে আরও দুশো বছর বজায় রেখেছিল নিজেকে। এ কথাও আমরা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারি যে, আলেকজাণ্ডারের সময় থেকে ভারত ও পাশ্চাত্যের যোগাযোগকারী প্রাচীন বাণিজ্য-পথ ধরে যানবাহন পূর্বমুখে আসত। আমরা বলতে পারি না, আলেকজাণ্ডার এই পথগুলি তৈরি করেছিলেন। তাঁর পূর্ববর্তী বহু যুগ ধরে ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী, বণিক, পণ্ডিত, সন্ন্যাসীদের পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এ পথ গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যে ভারতীয় দর্শনের খ্যাতি আলেকজাণ্ডারের আগে থেকে। যত কমই হোক, ভারতীয় বণিকদের পিছু পিছু ভারতীয় চিন্তাবিদ্‌রাও বিদেশে যেতেন। তাহ'লে এ ঘটনার ব্যাখ্যা করতে গেলে এই দেশের বিরাট ভৌগোলিক ঐক্য ও বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবতে হবে। পূর্বমুখী আন্তর্জাতিক ভ্রমণের একটা পথের প্রান্ত হল ভারতবর্ষ। নিশ্চয় সে যুগের স্থলপথ প্রধানতঃ রোমসাম্রাজ্যের অধীন ছিল। উন্নত সভ্যতা-সম্পন্ন ভারতের কাছে রোমক সাম্রাজ্য আসত তার বিলাসদ্রব্যের জন্য, প্রাচ্যের রেশম, হাতীর দাঁত, মণিরত্নের জন্য রোমের স্বর্ণ ব্যয় হওয়ায় প্লিনি দুঃখ করেছেন। মথুরায় নেমীয় সিংহের সঙ্গে সাইলেনাস ও হেরাক্লিসের মত বহু সুস্পষ্ট গ্রীক-স্মারকচিহ্ন পাওয়ায় বোঝা যায় যে, প্রাচীন বাণিজ্যপথ সমুদ্র দিয়ে এসে দেশের অভ্যন্তরে যমুনা নদীর ওপরে ঐ শহরে থেমেছিল। কিন্তু যে সব পথ গান্ধারে শেষ হয়ে সেখানকার বৌদ্ধধর্মে ইউরোপের প্রভাব এসেছিল, সেগুলি নিশ্চয় প্রাচীন বাইজানটিয়াম ও রোমের সঙ্গে যুক্ত ছিল। মথুরায় গ্রীক শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক-রোমান শিল্পের চেয়ে উন্নত কিছু নিশ্চয় দেখা যায় নি। এসব তথ্য স্বীকৃত হবে। বলা হয়, আলেকজাণ্ডার ও তাঁর পরবর্তী গ্রীক-ব্যাকট্রিয়ান সাম্রাজ্যের ফলে এক বিশেষ জাতির দ্বারা রোমক সাম্রাজ্যের যুগে গান্ধার অঞ্চলে শিল্প দক্ষতা গড়ে ওঠে, এ কথায় খুব গুরুত্ব দেওয়ার দরকার নেই। দখলকারী সৈন্যরা দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের এত সংখ্যায় সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসে না যাতে কিছুটা ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, কিছুটা রক্তের সম্পর্কের দ্বারা ঐ অচেনা জনগণের ওপরে আত্মিক প্রভাব বিস্তার করা যায়। অনুরূপ পরিবেশে অনেক বেশী সুযোগ পেয়ে আধুনিক জনগণ কি করেছে, সেটা তুলনা করতে পারি যদি বক্তব্যটাকে উড়িয়ে দিতে চাই। কিন্তু আসলে এ বিষয়টাকে এত গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়।

এ অনুমানের সবচেয়ে ভাল জবাব রয়েছে দু ধরনের শিল্পের মধ্যে অসাধারণ পার্থক্যের ক্ষেত্রে। গ্রীকজগতের শিল্প সম্পূর্ণরূপে মানুষের রূপের সঙ্গে জড়িত। ঐ শিল্পে ঘোড়া, হরিণ, ঈগল, তালগাছ অচেনা ছিল না। কিন্তু উদ্ভিদ জগৎ বা সমগ্র প্রাণীজগতের সৌন্দর্য সম্পর্কে গভীর অনুভূতির আশ্চর্য অভাব দেখা যায়। আর ঠিক এই দুটি ক্ষেত্রেই গান্ধার দেশের মানুষ সবচেয়ে নিপুণ ছিল, আজও

আছে। কঠোরতম পবিত্রতা ও অলঙ্করণের সংযম গ্রীসের লক্ষণ। ওদিকে উচ্ছ্বাস প্রাচ্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য। সে আবিষ্কার করতে ভালবাসে। তার ফুল ও পাতার বৈচিত্র্য অনন্ত। উন্নত ধরনের শিল্প ব'লে সে যেথায় মাধুর্যকে প্রকাশ করতে জানে। প্রাচ্য অলঙ্করণরীতি, সে চৈনিক, পারসিক, তিব্বতী, কাশ্মীরী বা খাঁটি ভারতীয় যাই হোক, তার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ প্রায় দেখা যায়, যে ক্ষেত্রে তা ব্যবহৃত হয়েছে, তার চরম সামঞ্জস্য ও নতুনত্বে। কিন্তু বহুমুখী উৎপাদনের শক্তিও তার রয়েছে। গ্রীসে ও রোমে তার সম্পূর্ণ অভাব। অতএব, গান্ধার-শিল্পের মূল উপাদান ছিল হেলেনিক জনগণের বংশধরদের মধ্যে, একথা অবাস্তব। এই স্তরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনে উদ্ভূত যে একটি মাত্র ফলের কথা বলা হয়েছে, তার এতটুকু চিহ্ন কখনও ছিল না। আমরা শুধু পাশ্চাত্ত্যের, শুধু প্রাচ্যের এবং সম্পূর্ণ স্থানীয় ও নিরপেক্ষ উপাদানগুলিকে বেছে নিতে পারি।

প্রাচীন মৌর্য শিল্পে পার্সিপোলিসের স্তম্ভ ও পাখাযুক্ত পশুর ক্ষেত্রেও একথা সত্য। আন্তর্জাতিকতার প্রমাণ এরা দেয়, কিন্তু এগুলি আদৌ সচেতন অনুকরণ নয়। জগতের এত বিরল ও দুর্মূল্য বস্তুর উৎপাদক ভারতবর্ষ প্রাচীন দেশগুলির মধ্যে সবচেয়ে আন্তর্জাতিক ছিল। ভারতের যে সব বণিকরা চৈত্য বা কার্লের গুহা ক্ষোদিত করিয়েছিল, তারা হয়ত রাজাদের চেয়ে অনেক ধনী ছিল। পৃথিবীর অতি জরুরী পথগুলি দাক্ষিণাত্য ও পাটলীপুত্রের সঙ্গে ব্যাবিলন ও নিনেভের, বা মিশর ও আরবের সঙ্গে সিংহল ও চীনের যোগাযোগ ঘটিয়েছিল। এতে ভারতের মর্যাদা ও আন্তর্জাতিকতা বোঝা যায়, সে জাতীয় সঙ্কীর্ণতার কোন অপরিণত বা কৃত্রিম বোধের বাধা ছাড়াই সে যুগের শ্রেষ্ঠ উন্নতিকে পেয়েছে। গ্রুনওয়েডেল সাঁচীর যে পাখাযুক্ত পশুর কথা বলেছেন, সেটা দেখলে দেখব, ঐ পশুগুলির চালক বিদেশীদের পোষাক, বর্ম ইত্যাদিতে যুগোপযোগী নিখুঁত রূপ দেওয়া হয়েছে দেখা যায়। যারা ভাবতে চায়, পার্সিপোলিসের থাম আছে, অতএব ভারতের সভ্যতার উদ্ভব পশ্চিম এশিয়া থেকে, তারা ভারতের নিজস্ব সভ্যতার উপাদান-গুলিকে অবজ্ঞা করে। কার্লের চৈত্যের থামগুলি পার্সিপোলিসের নামে চলতে পারে, কিন্তু চৈত্য কক্ষটি কখনই ভারতীয় ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। থামের মাথায় একদল পশুসহ থামটি কার্লের মত কাঠামোর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয় নি। এটা এশিয়ার এমন যুগের সৃষ্টি, যখন থাম ভার-বহনের কাজ করত না, থাম ছিল দিগ্‌দর্শক, প্রচারের মাধ্যম, জয়ের স্মারক, এমনকি দীপস্তম্ভ। কিন্তু ভারতসহ এশিয়ার সর্বত্র এটা প্রচলিত ছিল; যদিও এ্যাকামেনিডস্ ছয় খ্রীস্টপূর্বাব্দে স্তম্ভ দিয়ে পার্সি-পোলিসকে সজ্জিত করেছিলেন এবং অশোক তৃতীয় খ্রীস্টপূর্বাব্দে সারনাথ বা সাঁচীতে স্তম্ভ ব্যবহার করেছেন, তবু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, অশোক দূরদেশের স্তম্ভের অনুকরণ করেন নি, সম্ভবতঃ তাঁর জনগণ ও যুগের কাছে যার দারুময় রূপ প্রচলিত ছিল, তাকেই প্রস্তরে রূপ দিয়েছিলেন। কার্লের সমসাময়িক যুগে

নয় ও দশ নম্বরের নিরাড়ম্বর গুহা অজন্তায় ক্ষোদিত করেছিলেন কোন ধনী বণিক-রাজপুত্রের বদলে সাধারণ সন্ন্যাসীরা—ঐ দুটি গুহার মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত প্রসারিত স্তম্ভগুলি নিরবচ্ছিন্ন ও অনাড়ম্বর। এর ফলে হয়ত স্বচ্ছতা ও আড়ম্বরের অভাব হতে পারে; কিন্তু এতে অবশ্যই গাম্ভীর্য ও সামঞ্জস্য দেখা দেয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, এই দুটি উদ্দেশ্যর চরমসীমা ভারতীয় প্রতিভার ফল।

অন্য সব কিছু এক হলে আশা করা যায়, আদর্শের উৎস থেকে প্রতীকের উদ্ভব হবে। এর উদাহরণের জন্য আমরা ইউরোপের ম্যাডোনা—পূজার দিকে দৃষ্টি দিতে পারি। যে গীর্জাগুলি আদর্শের উদ্ভব ও প্রচার ঘটিয়েছে, তারাই এর বাহনরূপী প্রতীকের জন্য দায়ী। মনে হয়, একমাত্র আদর্শের বাহনরূপেই প্রতীক আবিষ্কৃত বা উদ্ভূত হতে পারে। এখন যদি আমরা জানতে চাই, বৌদ্ধধর্মের ভাবধারা ও লক্ষ্য কোন্ কেন্দ্র থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাহলে নির্দ্বিধায় উত্তর আসবে—মগধ থেকে। বৌদ্ধধর্মের পবিত্র দেশ ছিল বারাণসী ও পাটলীপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এখানে রাজগীরে বুদ্ধের মৃত্যুর পরের বছর প্রথম মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে পাটলীপুত্রে অশোকের রাজত্বে ২৪২ খ্রীঃ পূঃ বিরাট দ্বিতীয় মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বুদ্ধের জীবনকালে বৌদ্ধধর্মের গুরুত্বকে স্বীকৃতিদানে মগধের এত উপযুক্ত নেতৃত্ব বজায় ছিল এবং ধর্মের নিয়ম-কানুন প্রতিষ্ঠার জন্য কণিষ্কের যে অধিবেশন হয়, তাতে নিশ্চয় মগধের মঠগুলি থেকে অসংখ্য প্রতিনিধি এসেছিলেন। বিশেষতঃ নালন্দা থেকে, খ্রীষ্টীয় যুগের সপ্তম শতাব্দীর মাঝে হিউয়েন সাঙের সময়েও ধর্মপ্রচার ও ব্যাখ্যার জন্য নালন্দার স্থান ছিল শ্রেষ্ঠ। যতক্ষণ না বিপরীত প্রমাণ পাচ্ছি, ততক্ষণ, আদর্শ বাহনরূপে প্রতীককে সৃষ্টি করে এবং বৌদ্ধ-ধর্মের ভাবধারার উৎস বরাবর ছিল মগধ, এ কথাকে গ্রহণ ক'রে আমরা আশা করব যে, বৌদ্ধ শিল্পের ক্ষেত্রেও দেশ সৃষ্টিশীল হয়ে উঠবে এবং বুদ্ধের মূর্তি পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেবে। সপ্তম শতাব্দীতে এ বিষয়ে সাধারণের এইরকম বিশ্বাস ছিল। উপরন্তু হিউয়েন সাঙের জীবনী থেকে মনে হয় এটা খুব স্বাভাবিক, তাঁর জীবনী-লেখক ও শিষ্য হুই লি বলেছেন, হিউয়েন সাং পথে গান্ধার দেশ পেরিয়ে চীনে বহু মূল্যবান বই ও মূর্তি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বারাণসীতে প্রথম উপদেশদানের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ। এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, চীনে অন্ততঃ সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ ছিল প্রামাণিক মূর্তি, বই ও ব্যাখ্যার কেন্দ্র। ভারতের কাছে, বিশেষতঃ মগধের কাছে প্রাচ্য নিজের প্রেরণাকে সঞ্জীবিত ও গভীর করতে বারবার এসেছে। চরম সিদ্ধান্তের জন্য মানুষ সীমান্তের দেশ ও উপধর্মগুলির আশ্রয় নেয় নি।

এখনও বিহারে প্রাচীন মগধে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের বহু স্তর ও উন্নতির দীর্ঘ ইতিহাস দেখা যায়। প্রাক্ বৌদ্ধ যুগে ভারতে মানব-দেহভিত্তিক ভাস্কর্যের অস্তিত্ব কেউ অস্বীকার করে নি। কার্লে চৈত্যের সামনে (১২৯ খ্রীঃ পূঃ) আমরা নর-নারীদের

করজোড়ে মূর্তি দেখতে পাই, ওগুলি রাজা-রাণীদের বা দাতাদের ও তাদের স্ত্রীদের মূর্তি হতে পারে। ভারহুতের প্রাচীরে মানব মূর্তি ও প্রচুর পশুর মূর্তি দেখা যায়। নাগাজাতীয় মূর্তিগুলি প্রাচীন কাল থেকেই প্রচলিত।

কেউ কখনো বলে নি, এ সব ভাস্কর্যের উৎস বিদেশে। বস্তুতঃ যোগ্য সমালোচকরা ভারতীয় শিল্পে দেশীয় ভাবধারার অস্পষ্ট ছায়ার প্রকাশ দেখতে ব্যগ্র নন। অতএব, বুদ্ধগয়ায় অশোক-যুগের প্রাচীরে আমরা বিদেশী উৎসের ধারণা নিয়ে যাই না। আমরা খোলাখুলিভাবে এগুলিকে ২৫০ খ্রীঃ পূঃ বা তার কাছাকাছি সময়ের ভারতীয় শিল্পের উদাহরণ বলে মনে করতে পারি। এখান থেকে বিহারে বৌদ্ধ শিল্পের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এখানে পবিত্র গাছের চারদিকে বেষ্টনী দেখতে পাই। আবার গয়ার মত পদচিহ্নও দেখতে পাই। এখন যা বিষ্ণুপদ বলে পূজিত হয় তা নিশ্চয় আগে বৌদ্ধ প্রতীক ছিল। এক সময়ে বিহার স্তূপে পূর্ণ ছিল, কিন্তু ওগুলি যে এখন ঢিবি বা পাহাড়ে পরিণত হয়েছে, তাতে বোঝা যায়, ওগুলি এখনকার মত তখনো সারনাথ বা সাঁচীতে অশোকের যুগে ও রকম ছিল। এ কথা সত্য যে জন্মকালে বৌদ্ধধর্ম ঐ সাধারণ গম্বুজাকৃতি মাটি ও ইটের স্তূপে পবিত্রতা দেখতে পেত, কখনও রাজগীরের মত ওতে পবিত্র স্মারক রাখা হত, কখনো বা সাঁচীর মত কিছুই রাখা হত না। তীর্থযাত্রী ও দর্শকদের পবিত্র মন্দিরে যে রকম ছোট স্তূপ গঠনের প্রথা ছিল, তার উন্নতির অনেক স্তর আছে।

স্তূপে স্পষ্টতঃ পাঁচটি অংশ রাখতে হত এবং এক দার্শনিক মতবাদে ঐ পাঁচটি অংশকে—মাটি, বাতাস, আগুন, জল ও শূন্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল।

নিশ্চয় অশোকের পরেই বুদ্ধের মূর্তি গড়ার চেষ্টা হয়েছিল। ভারতীয় চরিত্র ও প্রাথমিক হীনযান মতের কঠোরতা অনুযায়ী এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রচেষ্টা খুবই বাস্তববাদী হয়েছিল। সে সব মূর্তিকে যথার্থরূপের মত করার চেষ্টা ছিল। দূর সাঁচীতে ১৫০ খ্রীঃ পূঃ, আমরা বিশাল দরজায় বুদ্ধ ব্যতীত উপাসনাযোগ্য যে কোন বৌদ্ধধর্মীয় দেহের আবক্ষ মূর্তি দেখতে পাই। কিন্তু আমরা যদি পূর্ব-অনুমানমত এক্ষেত্রে মগধকে অগ্রাধিকার দিই, তাহলে এটা মেনে নিতে পারি। সাঁচীতে প্রাচীন যে শিল্পধারা দেখা যায়,—যাতে ছবির মাধ্যমে কাহিনী বলা হত—তার দ্বারা প্রভাবিত ছবি পরবর্তী কালে কান্‌হেরীতে দেখতে পাই এবং অলৌকিক মানুষ সংক্রান্ত এই সাধারণ পবিত্র মানুষদের মধ্যেও বীরোচিত মনে হত। এই বিশেষ অংশটিতে জাতকের জন্মকাহিনী রয়েছে, এ কাহিনী বৌদ্ধ মতের প্রথমাবস্থায় প্রধান সাহিত্য ও ধর্মান্দরূপে ছিল, ঐ মতাবাদের প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্ব পরে ধর্মের ক্ষেত্রে যে স্থান লাভ করেছিল, তার ইঙ্গিত এই কাহিনীগুলিতে পাওয়া যায়। পূর্বজন্মের এক বুদ্ধের এই মূর্তি নগ্ন নয়,। তবে এত সূক্ষ্ম বস্ত্রে আবৃত যে বস্ত্র প্রায় অদৃশ্য। গ্রুনে ওয়েডেল বুদ্ধগয়ার একটা মাটির সীলের ছবি দিয়েছেন, তাতে আমরা বুদ্ধকে আদর্শায়িত করার বিষয়ে ঐ যুগের আর-একটা উদাহরণ পাই। এতে যে ছোট

অলঙ্করণগুলি আছে, তা স্তূপের। কিন্তু বুদ্ধের মূর্তি রয়েছে এক মন্দির স্তূপের সামনে।

সম্ভবতঃ এই যুগেরই একটি কাহিনী রয়েছে যে, অজাতশত্রুর একবার প্রভুর ছবি রাখার ইচ্ছা হওয়ায় তিনি একটা কাপড়ের ওপরে দেহের ছায়া ফেলেন। পরে বাইরের রেখার ভেতরের অংশ রং দিয়ে ভরে নেওয়া হয়। গ্রুন্‌ওয়েডেল বলেছেন, এই কাহিনীতে বুদ্ধ মূর্তির ওপর দাবী প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা দেখা যায়। একথা ঠিক হোক বা না হোক, অন্ততঃ এটা বোঝা যায় যে, বৌদ্ধ জগৎ নিজেই প্রভুর মূর্তির উদ্ভাবনার কৃতিত্ব মগধকে দিয়েছিল। এই জাতীয় ভাস্কর্যের চরম নিদর্শন নিঃসন্দেহে নালন্দার বিশাল বুদ্ধ আজও এ মূর্তি বড়াগাঁও-এর গ্রাম্য মানুষের গর্ব, তারা একে বলে মহাদেব। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের বুদ্ধমূর্তিও এই ধরনের ভাস্কর্য। সিংহলের অনুরাধা-পুরমের বুদ্ধও এই ধারার নিদর্শন বলে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

এগুলি যথার্থ মূর্তি, আবক্ষ নয়। বৌদ্ধ মূর্তিগুলির মধ্যে এগুলির প্রাচীনত্বের বিরাট প্রমাণ সম্ভবতঃ এখানে রয়েছে যে, এগুলি সিংহলে প্রাপ্ত, অশোকের পরবর্তী যুগে সিংহলের সঙ্গে ভারতে যোগাযোগের আগ্রহ ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে বহু পুরাণ কাহিনীর প্রতীকরূপী মূর্তির প্রতি হীনযান মতবাদ সৌহার্দ্যমূলক ছিল না।

মাটির শীলমোহরটি খুব আকর্ষণীয়। দেখা যাচ্ছে, বুদ্ধ নিজে বুদ্ধগয়ার মন্দিরের মত কোন মন্দিরে বসে আছেন, তাঁর পেছনে ও মাথার ওপরে পবিত্র গাছের শাখা-প্রশাখা। চারদিকে সাধারণ স্তূপে ঐ প্রতীকের সমসাময়িক উন্নতি দেখা যায়। একসময় ছিল, যখন পাঁচটি অংশকে একযোগে পরিবর্তিত ক'রে স্তূপকে এমন চেহারা দেওয়া হত, যাকে আমরা এখন মন্দির বলি। এই সময়কার বহু নিদর্শন নালন্দার আশেপাশে দেখা যায়, কেউ এ ধরনের বেশ কিছু নিদর্শন সংগ্রহ ক'রে বড়াগাঁওয়ের স্নানের ঘাটে রেখেছে। গ্রুন্‌ওয়েডেল কর্তৃক উপস্থাপিত এই মাটির শীলমোহর এবং রাজগীরের সোনভাণ্ডার গুহায় দৃশ্যমান স্তূপ ব্যতীত আমি এই যুগের স্তূপে মূর্তির কথা মনে করতে পারছি না। রাজগীরের উদাহরণটি পুরনো মনে হয়, বুদ্ধের দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে আড়ষ্টতার কারণে। তিনি পা ফাঁক ক'রে দাঁড়িয়ে আছেন, যেমন শিশুদের ছবিতে দেখা যায়। কিন্তু এই মূর্তিতে যে গভীরতা ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস দেখা যায়, তার তুল্য কোন শিল্পকর্ম আমি কখনও দেখি নি। বুদ্ধের দেহে সে যুগের প্রচলিত অদৃশ্যপ্রায় বস্ত্র। তাঁর ভঙ্গী আড়ষ্ট, অদ্ভুত, বিশালত্বের ভাবমণ্ডিত। সে অবনত স্থানটিতে তাঁর মূর্তি ক্ষোদিত, তার বাইরে বুদ্ধমূর্তির ওপরে, ডানদিকে ও বাঁদিকে পরিচিত ধরনের গাছের ডাল-পালা, এরকম প্রতিটি শাখার ভেতরে নির্দেশক অঙ্গুলিসহ একটি হাত অর্ধেক প্রকাশিত। সমগ্র প্রভাবটি অসাধারণ। যেন শোনা যাচ্ছে, "ইনিই তিনি"। অনুভূতির এই স্বচ্ছতা এবং ভঙ্গীর আড়ষ্টতা দেখলে মনে হয় এটি প্রাচীন যুগের, এর সঙ্গে ঐ মাটির শীলমোহরের সাক্ষ্যের মিল আছে। কিন্তু এরূপ ভাস্কর্যকে যদি আমরা প্রাচীন যুগের

বলতে চাই, তাহ'লে প্রাক্‌বৌদ্ধ ভারতীয় শিল্পকে অর্ধসভ্য, স্থূল ব'লে ভাবা ছাড়তে হবে। এই পরিমাণ প্রকাশ শক্তি এবং নির্দিষ্ট প্রতীকের দ্রুত পরিবর্তন ঘটানোর এই অপ্রতিরোধ্য আবেগ থেকে বোঝা যায়, যন্ত্রপাতি ও নমনীয় পদ্ধতির সঙ্গে দীর্ঘ কালের পরিচয় ছিল। হীনযান মতবাদ প্রথমে স্তূপনির্মাতাকে নিরাকার পদ্ধতির দিকে নিয়ে যেতে চাইবে, কিন্তু মানবপূজার প্রতি ভারতীয় জাতির স্বাভাবিক দক্ষতা এবং প্রতীক সম্বন্ধে তার মূল নির্ভীকতা শেষে সব তত্ত্বের কৃত্রিম বাধাকে জয় করবে, স্তূপে মূর্তি নিশ্চয় প্রতিষ্ঠিত হবে। আমাদের মাটির শীলমোহর এরই স্মারকচিহ্ন।

পরবর্তী পদক্ষেপ হল, অপরিবর্তিত স্তূপের চারদিকে চারিটি ছোট বুদ্ধ ক্ষোদিত করা। এর স্থলে মূল ভাবটি আমরা ভালভাবে বুঝতে পারি। দাগোবা একটি ভৌগোলিক বিন্দু, ওখান থেকে বুদ্ধের প্রভা জগতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই ভাবধারা থেকে পরবর্তী যুগে জাপানে রোশনো বুদ্ধের বিশাল মূর্তিগুলো গড়ে ওঠে। প্রভু ও তাঁর বৈদেশিক দূতের আধ্যাত্মিক সাম্রাজ্যের চিন্তা একটা ভৌগোলিক ধারণা জাগিয়ে তুলেছিল। এই ভৌগলিক ধারণাই চারটি ক্ষোদিত বুদ্ধ মূর্তিযুক্ত ছোট, সাধারণ স্তূপগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে, সে সব মূর্তিগুলোর এক-একটি হাতের তালুতে ধরা যায়। এর অনুকরণে অনেক পরে সাঁচীতে বিরাট স্তূপের চারিদিকে চারিটি বুদ্ধমূর্তি স্থাপিত হয়।

এই যুক্তিগুলো প্রতিষ্ঠিত হ'লে ইতিহাসের ধারা যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যে বৌদ্ধ শিল্পের উন্নতিকে বুঝতে চায়, তাকে শুধু স্তূপের উন্নতিকে বুঝতে হবে। এ উন্নতিতে আকারের ক্রমবিকাশ যেন কালানুক্রমিক মাপে বাঁধা। প্রথমে আকার ছিল নিরাড়ম্বর, যেমন সাঁচিতে। তারপর তা অশোক যুগের বেষ্টনীতে অলঙ্কৃত হল, সে বেষ্টনী এতদিনে অন্যান্য স্থাপত্যের সাধারণ নিয়মের অংশভোগী হয়েছে, যেমন কার্লে, ভাজ, কান্‌হেরী অজন্তার নয় ও দশ নম্বর গুহায়। তারপর তা দীর্ঘায়িত হয়ে যাকে আমরা মন্দির বলি, তাই হয়ে উঠল। তখন ছোটস্তূপে চারটি বুদ্ধ মূর্তি দেখা দিল। ক্রমশঃ তার পরিবর্তন ঘটল। এখানে উন্নতির ধারা একটু দ্বিধান্বিত হয়ে নতুন পথে চলে গেছে। চারটি মূর্তি হয়ে উঠেছে চারটি মাথা, কিন্তু তা ব্রহ্মার না বিশ্বজননীর, তা এখনও ঠিক বোঝা যায় নি। ক্রমশঃ পরমেশ্বরের নাম জয়ী হল, চারটি মাথার মাঝে স্তম্ভের মত শীর্ষদেশ স্পষ্ট হয়ে উঠল, এবং এই উন্নতির ধারাপথে শেষ পর্যন্ত স্তূপ হিন্দুধর্মের শিবের প্রতীকে পরিণত হল। আজও একটি পূজোর মন্ত্রে শিবকে পাঁচটি মুখের অধিকারী বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর প্রতীক ভক্তের কাছে এখনও চারটি মাথার মাঝে একটি স্তূপের মত বস্তু।

যখন চারটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি চারটি মাথায় পরিণত হচ্ছে, তখন স্তূপ থেকে বুদ্ধ মূর্তি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বস্তুর মূর্তি বা প্রতীকস্বরূপ নতুন উন্নতির

স্তরে প্রবেশ করছে। এরকম ঘটছিল বলে স্তূপ নিজেই শিবে একে পরিণত করার মত পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছিল। এই অবস্থাকে আমরা বারাণসীর প্রথম উপদেশের মূর্তির ক্রমবিকাশ বলতে পারি। সাধারণতঃ এ ক্রমবিকাশকে যতটা নির্দিষ্ট মনে করা হয়, তা নয়। অজন্তার দ্বিতীয় যুগের গুহাগুলো—সাত, এগারো, পনেরো, ষোল, সতেরো—দেখলে আমরা নিজেরাই প্রথাটির কড়াকড়ি বা শিথিলতা বুঝতে পারি। কোন দুটি গুহা একরকম নয়। সাত নম্বর প্রাচীনতম গুহাগুলোর একটি, কারণ, চৈত্য দাগোবার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় প্রার্থনাকক্ষ এখানে দেখা যায়, প্রবল পরিশ্রমে তৈরি করা হয়েছে মন্দিরের মূর্তির জন্য। এতে বোঝা যায়, খোদাইকররা তখনও দুটির পৃথক ব্যবহারে অভিজ্ঞ ছিল না। তখনও মন্দিরে বা গন্ধকুটি হিউয়েন সাঙের বর্ণনামত শুধু ধূপ জ্বালানোর কক্ষমাত্রে পরিণত হয় নি। মন্দিরের এই ক্রমব্যবহার থেকে এখানে পাশের দেওয়ালের অতিবিশদ ক্ষেদাই-এর কারণ বোঝা যায়, পরে তা বর্ণনা করা হবে। যে মূর্তি এখনও সারনাথে অল্পবিস্তর অক্ষত আছে, তাতে আমরা ভাস্কর্যে এক বিস্ময়কর কমনীয়তা লক্ষ্য করি। বেষ্টনীও অপ্রত্যাশিত, তাতে পূজার মূর্তিরা বেষ্টনী ও ধর্মচক্র ঘোরাচ্ছে, বিস্ময়কর পরিবেশে পাশাপাশি শান্ত জন্তুরা শুয়ে আছে। গ্রূন্‌ওয়েডেল দেখিয়ে দিয়েছেন যে, জ্যোতির ব্যবহার থেকে দেশে এক প্রাচীন শিল্পীদলের পরিচয় পাওয়া যায়। উড়ন্ত দেবগণ, চক্র ও প্রতীকী পশু থেকেও তা বোঝা যায়। শিল্পী যে ভাষায় কথা বলেছেন, তা লোকে বুঝত। আদর্শকে প্রিয় ব্যক্তির আকারে বিদেশীদের কাছে প্রকাশ করার বাসনায় প্রথম মূর্তিগুলোর উদ্ভব হয়েছিল। এই বিশেষ মূর্তিটি একটি বিশেষ সত্যের চিহ্নস্বরূপ বিখ্যাত হয়েছিল যে, বিহারগুলি মহাবিদ্যালয় হয়ে উঠছিল। বৌদ্ধ ধর্ম জাতীয় শিক্ষা গবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করছিল।

কিন্তু মূল দেশে মূল ভাবধারার উন্নতি বন্ধ হল না। সর্বদা নমনীয় বাস্তবতার মাধ্যমে জাতীয় বিশ্বাসের ক্রমবর্ধমান ও ক্রমপরিবর্তমান আকারকে প্রকাশ করার এক অদম্য চেতনা ছিল। যেহেতু মূল হীনযানের ধারা থেকে প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল শিব ও শৈবমত, অতএব, অন্ততঃ বিহারের ক্ষেত্রে তাতে মূর্তির পরিবর্তে চরম অভিব্যক্তিরূপে প্রতীকের ব্যবহার প্রথম দেখা দেয়। এর ফলে উদ্ভব ঘটে, কিছু বর্ণনামূলক ভাস্কর্যের, যেমন, ধারা যাক, কার্তিকেয়ের ক্ষেত্রে, কিন্তু তাপরবর্তী কালের শিল্প ও ভাস্কর্যের চেতনার সম্পূর্ণ অংশভাগী হয় নি। তবু, মাতা বা আদিশক্তির প্রাচীন ভাবধারা অবিকৃত থেকে গেল এবং এই সংক্রান্ত কাহিনীর ভাস্কর্য বৌদ্ধ শিল্পের পরবর্তী স্তরে সুলভ হয়ে উঠল, এর সঙ্গে ছিল সেই ধর্ম যা গুপ্ত সম্রাটের অধীনে রাষ্ট্রীয় ধর্মরূপে সব কিছুকে অতিক্রম করেছিল। এখানে আমরা সম্পূর্ণ এক নতুন প্রতীকবাদের সম্মুখীন হই, সে প্রতীকবাদ নারায়ণ বা বিষ্ণুর কৃষ্ণভক্তদের তিনি পরমেশ্বর। শিল্পের দিক্ দিয়ে বলতে গেলে বস্তুতঃ ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে শিবের সঙ্গে জড়িত ভাস্কর্যের প্রেরণা মন্দীভূত হতে বহু শতাব্দী লেগেছিল এবং এ

বিষয়ে অনেক ইতিহাস লেখা হয়েছে। শিব ত্রিপ্রতীকের তৃতীয় প্রতীকরূপে দেখা দিলেন—এ হল বৌদ্ধ প্রতীক, বুদ্ধ ধর্ম, সঙ্ঘ—এ ধারণার প্রমাণ রয়েছে এলিফ্যাণ্টার বিরাট গুহায়। ইলোরা ও এলিফ্যাণ্টার শিব প্রায় চরম শ্রদ্ধা পেয়েছেন, শিল্পীর কল্পনায় তার আধিপত্য এত বেশী ছিল যে, তারা তাঁকে নিয়েই গড়ে তুলেছে চিত্রসম্পদ। অবশ্য মগধে এই সময়ে সৃজনমূলক শিল্প দুটি পৃথক ভাবধারা নিয়ে মগ্ন ছিল। সে দুটি হল মাতা—পরে এর সাহায্যে ব্রাহ্মণ্য ও মঙ্গোলীয় ভাবধারার মিলন ঘটে—এবং বিষ্ণু বা নারায়ণের ভাবধারা। বস্তুতঃ অযোধ্যায় ত্রিপ্রতীকের দ্বিতীয়টি থেকে আগেই মানবরূপী অবতাররূপে বুদ্ধের মানবিক রূপের উদ্ভব হয়েছে, রামায়ণে এই বাণী প্রচারিত হয়েছে। কবি কালিদাস হিন্দুধর্মের উভয় শাখা নিয়ে কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ কাব্য রচনা করেছিলেন। এই যুগের সব রচনায় রাম ও শিবের সাধর্ম্য বোঝাবার অবিরাম চেষ্টা হয়েছে। এর থেকে ভালভাবে বোঝা যায় শিবের পূজার প্রথা বিষ্ণু বা তাঁর অবতারের পূজার চেয়ে প্রাচীন। আরও বোঝা যায়, ভারতীয় ঐক্যের দর্শন জাতীয় মনকে কত প্রবলভাবে অধিকার করেছিল। এখনও স্তূপ থেকে চিন্তাধারা পরিবর্তনশীল স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব মাঝে মাঝে রাজগীরে প্রচুর চরণদ্বারা আবৃত যে শিবলিঙ্গগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিকে নিঃসন্দেহে এই যুগের বলতে পারি।

অবশ্য শিবের পর মগধের ভাস্করদের দৃষ্টি ক্রমশঃ কেন্দ্রীভূত হল নারায়ণ মূর্তিতে। এই আগ্রহ শুধু মূর্তিতে আবদ্ধ ছিল, এ কথা মনে করা বোধ হয় ভুল। অপরিবর্তিত অভিব্যক্তি চিরকাল ক্রমবিকাশের সমাপ্তি, কখনও সূচনা নয়। পশ্চিমে শিবের মত মগধে নারায়ণও বহু রকমের ক্রমপরিবর্তনের মাধ্যমে বুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত। মাঝে মাঝে এক একটা মূর্তিতে আমরা চৈনিক প্রভাব দেখতে পাই। মনে হয়, গুপ্তদের আবির্ভাব এবং স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন ঘটলে চৈনিক মন্ত্রীদের নিয়োগ করা হয়েছিল, যেমন, কণিষ্ক তাঁর যুগে নিজের রাজধানীতে এক উদ্দেশে নিঃসন্দেহে গ্রীকদের নিয়োগ করেছিলেন। এইসব চীনা শ্রমিকদের দিয়ে মাঝে মাছে মূর্তি করানো হত, এ কথা ভাবা কঠিন নয়। মূর্তি যে ওদের দ্বারা উদ্ভূত নয়, সে কথা সবচেয়ে ভাল বোঝা যায়, বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে জড়িত ক্রমপরিবর্তনের দ্বারা। ভারতীয় উদ্ভাবনা-শক্তির অসম্ভাব্যতা সম্বন্ধে এত হালকাভাবে এত কথা বলা হয়েছে যে, ছোটখাটো ভুল ধারণার বিষয়ে মাঝে মাঝে সতর্ক হওয়া দরকার। এ ধরনের আর-একটা কথা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধেও উঠেছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধধর্ম ঐসব ধারণার ফল। কিন্তু সংগঠনের বিপুল শক্তিতে সে দেশ ও জনগণের এমন ঐক্য ঘটিয়েছিল যে, ব্রাহ্মণরাও হিন্দু-ধর্মকে সংগঠিত করতে বাধ্য হয়েছিল।

গুপ্তরা নারায়ণের ধারণাকে জাতীয় বিশ্বাসের ভিত্তিরূপে গড়ে তুলেছিল। এর থেকে দেখা দিলেন কৃষ্ণ এবং সে কাহিনী মহাভারতে লিখিত আছে। গুপ্তদের শিক্ষা ও প্রচারসংক্রান্ত উৎসাহের ফলস্বরূপ ভ্রমণরত প্রচারকরা এই রূপকে দক্ষিণে

নিয়ে গিয়েছিলেন, আজও সেখানে এই রূপের পূজা হয়। এই রূপেরই একটা মূর্তি স্কন্দগুপ্ত ভিতারি লাতের মাথায় বসিয়েছিলেন, ঐ স্থাপত্য তিনি নির্মাণ করান ৪৫৫ খ্রীঃ বাবার স্তম্ভে নিজের হূণবিজয়ের ঘটনা লিপিবদ্ধ করার জন্য।

এইভাবে বিহারে ভাস্কর্যের এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস চলেছে, বৌদ্ধযুগের প্রথম থেকে শুরু হয়ে ক্রমশঃ সহজে অনুধাবনযোগ্য স্তরের মধ্য দিয়ে আধুনিক হিন্দুধর্মের বিভিন্ন রূপে। এই অবিরাম প্রবাহে আমরা স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোকে চিনতে পারি এবং যারা বিদেশী প্রভাবের কথা বলে তাদের কাছে এই উত্তরই শ্রেষ্ঠ।

বুদ্ধগয়ার অপেক্ষাকৃত স্থূল, কারিগরজাতীয় কাজের সঙ্গে বড়গাঁও বা প্রাচীন নালন্দার কমনীয়, অপূর্ব ক্ষোদিত ও ঢালাই মূর্তিগুলি মিশিয়ে ফেলা যায় না। আবার, রাজগীরের হিন্দু মূর্তিগুলি উভয়ের থেকে স্বতন্ত্র। অতএব, মগধের ভাস্কর-গোষ্ঠীর একটি রীতির কথা বলা যায় না। রাজগীরের অধিকাংশ মূর্তির বিষয়বস্তু শৈব, কারণ, এগুলি বড়গাঁওয়ের নারায়ণ-ধারার পূর্বেকার।

সুতরাং, আদি বৌদ্ধ ধর্মের দুটি ফল: আবক্ষ মূর্তি ও মূর্তিযুক্ত স্তূপ। স্তূপ থেকে আবার উদ্ভূত হয়েছে শিবের প্রতীক ও যথাযথ মূর্তির। সে মূর্তিই বুদ্ধে পরিণত হল এবং নারায়ণের মূর্তির পরবর্তী রূপের জন্ম দিল। কিন্তু পরিবর্তনের এই অসাধারণ উৎসাহের সঙ্গে যখন আমরা ভারতীয় মনের অপূর্ব ধর্মতাত্ত্বিক ও দার্শনিক উদ্ভাবনশক্তি মনে করি, তখন মনে হয়, আসল স্তূপের পরিবর্তন থেকে গিয়েছিল। তবু এর আগে অন্ততঃ একটা সুচিহ্নিত স্তর ছিল। সন্ন্যাসীর কাছে জগৎ ধ্যানমগ্ন মূর্তিতে পূর্ণ। আদর্শগতভাবে ধর্মসম্প্রদায় প্রভুর শক্তিলাভ ক'রে বিরাট আশ্রয় হয়ে উঠেছিল। যে পদ্মে তিনি বসেছেন, তার অনেক ভালবাসা ছিল। এই ধারণাও স্তূপে রূপলাভ করেছে। একই ভাবধারা পরিশ্রম ক'রে অজন্তার সাত নম্বর গুহার দেওয়ালে ক্ষোদিত হয়েছে। আরও সুদূরে গেলে দেখব, নিঃসন্দেহে এই উন্নতি থেকে অজস্র ছোট ছোট ধ্যানরত মূর্তির সমরেখায় বা গাছপালার মধ্যে গড়ে তোলা হয়েছিল, যেখানে স্থাপত্য সুযোগ পেয়েছে সেখানেই এ মূর্তি করেছে।

এ সব থেকে বোঝা যায় (শুরু থেকে) সমগ্র বৌদ্ধযুগে ধর্মতত্ত্ব ও প্রতীকধারার উৎস ও সৃষ্টি কেন্দ্র ছিল মগধ, প্রতীকের মাধ্যমে সেই তত্ত্ব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ত। ওয়াডেল কয়েক বছর আগে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে এক চিঠিতে লিখেছিলেন যে, তিব্বতের মহাযানী মূর্তিগুলির মূল রূপ খুঁজতে হবে মগধে। উনি খুব ঠিক কথা বলেছিলেন, এর থেকে আমরা ধারণা করতে বাধ্য হই যে, বোধিসত্ত্বের মতবাদ মগধেই জন্ম নিয়ে সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল কণিষ্কের মহাসঙ্গীতি, তক্ষশীলায় বা জলন্ধরে কান্দাহারে। দীর্ঘদিন ধরে পূর্বকেন্দ্রে যে সব মত ও অনুমান জড়ো হচ্ছিল, তাকে কার্যকরী করেছিল কণিষ্কের মহাসঙ্গীতি। বোধিসত্ত্বের মতবাদ সম্পূর্ণ পরিণত অবস্থায় জলন্ধরে এসেছিল, সেখান থেকে শক্তি সংগ্রহ ক'রে চীন সাম্রাজ্যে গিয়েছিল। বস্তুতঃ এই মহাসঙ্গীতির ভাষ্য যে সংস্কৃতে লেখা হয়েছিল,

এর থেকে স্পষ্ট অনুমান করা যায়। মহাসঙ্গীতিতে প্রাচ্যের উপাদানের শক্তি ও প্রবলতা কতটা ছিল এবং এ সব উপাদান থাকায় অধিবেশনের সম্মান যে কতটা বেড়েছিল, এটা তারও প্রমাণ। এই অধিবেশন, শোনা যায়, কয়েক মাস ধরে চলেছিল, আমাদের স্পষ্ট বলা হয়েছে, সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের যে আঠারটি মতবাদ প্রচলিত ছিল, এই অধিবেশনের কাজ ছিল, সেগুলির মধ্যে মতসমন্বয় ঘটানো ও তাদের রক্ষণশীলতার অন্তর্ভুক্ত করা। অর্থাৎ, এ অধিবেশন নতুন মতবাদকে প্রচলিত করার কথা বলে নি। যে সব মতবাদ চরম হয়ে ওঠার চেষ্টা করছিল, এ শুধু তাদের বিভিন্ন স্তরকে স্বীকার ক'রে নিত। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, এর সদস্যরা বৈদান্তিক উদারতায় বিশিষ্ট প্রাচ্য ভাবধারাযুক্ত ছিলেন। ধর্মীয় ইতিহাসে, এই অধিবেশনে বৌদ্ধধর্ম একা দেখা দেয় সংগঠনশক্তি ও বাস্তবতার মিলন এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় প্রবণতা ও ভক্তিবিশ্বাসের উদাহরণ হয়ে। স্পষ্টতঃ আমরা জানতে পারছি, ঐ গ্রীষ্মে গান্ধারে বহু পণ্ডিত সন্ন্যাসী এসেছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁদের অনেকে আর নিজেদের সম্প্রদায়ে ফিরে যান নি, পরে গান্ধারের যে মহান সন্ন্যাসাশ্রমের উন্নতি ঘটেছিল, তার ভিত্তি গঠন করার জন্য এখানেই থেকে যান।

মগধের প্রাধান্য প্রমাণ করতে আরও একটু যুক্তির দরকার। অধিবেশনের সময়ে মহাযান মতবাদের সারসঙ্কলন অল্প বিস্তর সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এর সঙ্গে এই তথ্যটিও যুক্ত যে, কণিষ্কের সম্প্রতি আবিষ্কৃত স্মারক পেটিকায় তিনটি মূর্তি আছে—বুদ্ধ ও দুজন বোধিসত্ত্ব। এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আর-একটি তথ্য হল, গান্ধার দেশে এখনও পর্যন্ত যে কয়েকটি শিলালেখ আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সবগুলিরই তারিখ ৫৭ খ্রীঃ থেকে ৩২৮ খ্রীঃ মধ্যে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, গান্ধারের অলঙ্কৃত, কারুকার্যপূর্ণ রীতির ক্রমবিকাশের পর বৌদ্ধধর্মের পক্ষে ভারতে আবার এক নতুন শিল্পকলা, তার ক্রমবর্ধমান প্রতীকবাদের শ্লথগতি, সত্য ইতিহাস রচনা করার শক্তি থাকা সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ চতুর্থ শতক এবং পঞ্চম শতকের প্রথম দিকে গান্ধার তার শিল্প-সফলতার চরমে পৌঁছেছিল, ওদিকে মগধ তখনই নারায়ণের মূর্তি সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার স্তরে পৌঁছে গেছে।

২

অতএব, ভারতীয় স্থাপত্যে ধর্মীয় ভাবধারার কালানুক্রমিক বিকাশের একটা নির্দিষ্ট তত্ত্ব গড়ে তোলা গেল। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দর্শন ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐক্যের উৎস ও কেন্দ্র ছিল মগধ। বস্তুতঃ এই রাজ্য এমন এক দেহের কেন্দ্র ছিল, যার রক্তপ্রবাহের উচ্চ ও নিম্নচাপ অনুভব করা যায় বিশেষ নিয়ন্ত্রিত ছন্দের স্পন্দনে দেহের প্রান্ত সীমায়, এটি স্পন্দিত হচ্ছে ভাবনা ও প্রেরণার প্রবাহরূপে। এক্ষেত্রে সিংহলের ভাস্কর্য প্রাচীন প্রেরণার ফল। গান্ধার অনেক পরবর্তী এবং এটা যদি এ প্রশ্ন আলোচনার উপযুক্ত হয়, তাহলে আমরা দেখব, তিব্বত ঐ কেন্দ্রীয়

শক্তির স্পন্দনের আরও পরবর্তী ফল। তাই যদি হয়, তাহলে প্রমাণিত হয়, ধর্মীয় প্রতীকবাদের ক্ষেত্রে গান্ধার গুরু ছিল না, ছিল শিষ্য। প্রশ্ন হল। এই সম্বন্ধ কি দেখানো যায়, কিভাবে দেখানো যায় ?

গান্ধার শিল্পকলায় যদি অন্যত্র থেকে গৃহীত কোন রীতি দেখা যায় তাহলে পরীক্ষা খুব কঠিন হবে। পুরানোর মত সৃষ্টিশীল কাজেও প্রায় সর্বদা অজ্ঞাতসারে তার উৎস ও সম্বন্ধজনিত চিহ্ন থেকে যায়। যা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে বলে তা অসত্য হতে পারে, বা বর্তমান উদাহরণটির মত, লোকে তাকে ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু ধৈর্যশীল ব্যক্তির কাছে, সাধারণতঃ তাদের বক্তব্য প্রকৃত সত্যের পরিচায়ক। আগেই শ্রীযুক্ত ই. বি. হ্যাভেল তাঁর 'ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রকলা' বইতে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, গান্ধার শিল্পের প্রকৃত প্রবক্তা বুদ্ধমূর্তিগুলোকেও সম্ভবতঃ মূল নিদর্শন বলে ভুল করা যায় না। কেউ যদি কষ্ট ক'রে কলকাতা যাদুঘরের কক্ষে গিয়ে নিজে দেখে, তা হ'লে এই যুক্তির কি জবাব হবে, তা বোঝা শক্ত। যে বুদ্ধের সম্পর্কে প্রাচ্য ধারণা—তাঁর সেই নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, অতুলনীয় নিরাসক্তি এবং অসীমের মত বিশালতাতে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছে—সে ওখানে প্রদর্শিত, সপ্রতিভ, সময়োচিত ভঙ্গিমার যুবকদের মূর্তি অতি যত্নে ছ'টা অত্যন্ত সুন্দর তাঁদের গোঁফ, নিখুঁত বাস্তবতা ও পার্থিব ভাবকে কি সন্তোষজনক মনে করতে পারবে ? শ্রীযুক্ত হ্যাভেল বলেছেন, এই গান্ধার বুদ্ধমূর্তিগুলির উৎপত্তির বৈশিষ্ট্য তাদের মুখে স্পষ্ট মুদ্রিত রয়েছে।

তবে একথা মনে করা যায় যে, এটা বিতর্কের শেষ, শুরু নয়। অনেকে মুখের ভাব বিচার করতে পারবে না, তারা বিচারের জন্য আরও মৌলিক ও দৃঢ় ভিত্তি চাইবে, তাদের জন্য আমাদের প্রচুর প্রমাণ রয়েছে।

১৮৪৮ ও ১৮৫২-তে ভাস্কর্য-সম্পদসহ গান্ধার মঠগুলির আবিষ্কার ইউরোপীয় পণ্ডিতদের খুব স্বাভাবিকভাবে মনে হয়েছিল একটা মহত্তম শিল্প ও ইতিহাসের তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা ; ফার্গুসন তাঁর অমূল্য বইতে সেই মনোভাবের বিবরণ লিখে রেখে গেছেন এবং তার যে সব কারণ লিখে গেছেন, তা সে ভাষায় আর কখনও লেখা হবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আবিষ্কারগুলি অত্যন্ত অবহেলা ও অযোগ্যতার সঙ্গে দেখা হয়েছে, অতএব তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও কাহিনী আর উদ্ধার করা যায় না। যে আট-দশটি জায়গা পরীক্ষা করা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে অবশ্য বলা যায় জামাল-গার্হি ও তখ্‌ত-ই-বহি সম্ভবতঃ সবচেয়ে আধুনিক, অন্যদিকে শাহ্‌-ধেরি বোধ হয় প্রাচীনতম। এই শেষে উল্লিখিত মঠ সম্পর্কে ফার্গুসন যে পরিকল্পনা ও বর্ণনা দিয়েছেন, তা বিচার করলে মনে হয়, এলিফ্যান্টার এক নম্বর পুরনো, অব্যবহৃত গুহায় বর্ণিত বৌদ্ধধর্মের যুগ ও স্তরের সমসাময়িক এটি—ঐ গুহা দীর্ঘ বারান্দাজাতীয় চৈত্য গুহা, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, চতুষ্কোণ বেদীতে গোলাকৃতি দাগোবা ছিল। ফার্গুসনের মতে পরবর্তী মঠগুলির ভাস্কর্য এবং পরিকল্পনার মনে হয় বৈশিষ্ট্য ছিল অত্যধিক পরিমাণে পুনরাবৃত্তি। তার সঙ্গে জড়িত স্থাপত্য মনে হয়, চরিত্রে অত্যন্ত

সঙ্কর ও অসংযত ছিল। স্তম্ভের পত্রাবলীর মধ্যে শত শত ছোট বুদ্ধ রয়েছে। কিন্তু ফার্গুসন ঐ মত প্রকাশ না করলেও স্পষ্ট বোঝা যেত, এগুলি পরবর্তী উদাহরণ। প্রতিটি মঠের প্রধান কক্ষ মনে হয়, একটা চতুষ্কোণ বা গোলাকৃতি বড় ঘর বা উঠোন ছিল, তার মাঝে দাগোবা যুক্ত একটা বেদী ছিল। এর চার দিকে দেওয়ালগুলি ছোট ছোট প্রার্থনা-গৃহে বিভক্ত থাকত, প্রতিটি গৃহে থাকত একটি ক'রে মূর্তি এবং সমগ্র গৃহটি অতিরিক্ত অলঙ্কৃত হত। এর দ্বারা তত্ত্বগতভাবে প্রাচীন কালের বিহার-পরিবৃত দাগোবা বোঝানো হয়েছে, ফার্গুসন এ কথা মনে করে এই ঘটনায় খুব সঙ্গতভাবে বিস্মিত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর পরিচিত ভারতের কোন বৌদ্ধ স্মারক স্থানে মূর্তির জায়গা করে দিতে সন্ন্যাসীদের ঘর থেকে বার ক'রে দেওয়া হয়নি। যদি তাঁকে এগুলি পরিকল্পনা কি, কোথা থেকে এসেছে, বলা না হত, তাহ'লে তিনি নির্দ্বিধায় বলতেন, ওগুলি নবম ও দশম শতাব্দীর জৈন মঠ থেকে আগত। স্থাপত্যগত দিক্ থেকে তিনি মনে করেন, এখানে যে ক্লাসিক প্রভাব দেখা যায়, তা নিশ্চয় কন্‌স্টান্টিনের ও তার পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ৩০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল এবং এতে রোমের চেয়ে বাইজানটিয়ামের প্রভাব অনেক বেশী স্পষ্ট। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয়, কিভাবে সুদূর অঞ্চলে বাইজানটিয়ামের প্রভাব এত জোরালো হল, অথচ মধ্যবর্তী রাজত্বের শিল্পে তার প্রভাব পড়ল না; যেমন, সাসানীয় রাজ্য। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি যে, এটা প্রকৃত অসুবিধা নয়, কারণ, একেবারে চরম বিন্দুতে এসে ঐ প্রভাবগুলি কার্যকর হয় এবং বিশ্বের প্রধান বাণিজ্য পথগুলির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। আধুনিক যুগে ভারতীয় প্রতিভাবান ব্যক্তি মার্সেইতে থাকলেও ফ্রান্সে নয়, লণ্ডনে তার ব্যক্তিত্ব অনুভব করা যায়।

অবশ্য আমরা যখন গান্ধারে বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণকে স্বীকার ক'রে নিই, তখন প্রশ্ন ওঠে, বাইজানটিয়ামকে পশ্চিমী রাজত্ব যতটা প্রভাবিত করেছিল, গান্ধারও ততটা করে নি কি। এইভাবে প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী আমরা এইসব গান্ধার ভাস্কর্যের মধ্যে আলঙ্কারিক উপাদানের এক বিরাট মিশ্রণ দেখতে পাই, সবগুলিরই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূর্তির মাধ্যমে বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের চিরন্তন সৌন্দর্য ও স্বচ্ছতা তুলে ধরা, এতে বোঝা যায়, বুদ্ধের মূর্তি মগধের শিল্পরীতি থেকে অল্পবিস্তর অপরিবর্তিত রূপে গৃহীত হয়েছে। অশোক বেষ্টনীর গান্ধার ধাঁচে ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষায় এটা ভালভাবে আমাদের প্রথম যুক্তি হয়ে উঠতে পারে। আমরা জানি, বৌদ্ধধর্মের প্রথম যুগে এই বেষ্টনীর পবিত্রতা ছিল প্রতীকরূপী। মগধের আধ্যাত্মিক অঞ্চলের খুব কাছে এবং বিশেষ ক'রে সারনাথের সঙ্গের ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সাঁচীতে আমরা শুধু চিত্রে এর ব্যবহার দেখি না, জায়গার সীমারেখা ও বিভাগ চিহ্নিত করার জন্য ব্যবহার হত। আমরা দেখেছি, অশোক বেষ্টনী এবং অশ্বক্ষুরাকৃতি অলঙ্করণের মত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অর্থের ক্রমান্বয়ে বিস্মৃত হওয়ার ঘটনা থেকে কালানুক্রমিকতার খুব ভাল হিসেব পাওয়া যায়, তার দ্বারা ভারতীয় স্মারকস্তম্ভের তারিখ পাওয়া যায়। গান্ধার-পদ্ধতির

বেষ্টনীর মত এর এত ভাল উদাহরণ আমরা আর কোথাও পাই না। মহম্মদ নবীর মূর্তি থেকে এই ক্রমবিস্তৃতির অনেকগুলি স্তর পাই, শেষে তা হয়েছে নীচের প্যানেলের মাথায় একটা দাবার ছকে পরিণত হয়েছে। উপরন্তু, এই মূর্তি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান, কারণ, অত্যন্ত বৈষম্যমূলক পরিস্থিতিতে বুদ্ধের মূর্তি জোর ক'রে ঢোকানো হয়েছে বিশেষভাবে। আমরা প্রায় দুটো বিপরীত প্রথা দেখছি, বুদ্ধের প্রাচ্য অঞ্চলের বস্ত্র এবং শিথিল ভঙ্গী ও পরিবেশের অসামঞ্জস্য। অবশ্য, বুদ্ধ যে প্রথা থেকে উদ্ভূত, তার তিনি খুব উজ্জ্বল উদাহরণ নন। যে উচ্চতায় তিনি খুব অস্বাচ্ছন্দ্যে বসে আছেন, দেখা যায়, সেখানে তাঁর মুখভাব অস্বস্তিপূর্ণ ও বিরক্ত।

এই ছবিতে দর্শককে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্য বিস্মিত করবে, তা হল পদ্মাকৃতি সিংহাসনের অদ্ভুত ব্যবহার। দেখলে মনে হয়, ভাস্করকে যেন বলা হয়েছে, তার মূর্তিকে একটা পদ্মে বসাতে হবে, কিন্তু কিভাবে বসাতে হবে, সে বিষয়ে তাঁর ধারণা খুব অস্পষ্ট ছিল। যে মৌখিক আদেশ তাঁকে পালন করতে হয়েছে, আমরা যেন তা কানে শুনতে পাই। লোরিয়ান টাঙ্গাই থেকে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তিতেও অনুরূপ সমস্যার আর একটা উদাহরণ রয়েছে। এই দ্বিতীয় মূর্তির ভাস্কর আদেশ অনুযায়ী ঠিক বুঝেছিলেন যে, আসন ঐ মহামানবকে সম্ভবতঃ বহন করতে পারবে না, বুদ্ধের আকৃতির সামঞ্জস্যের জন্য দুটি পূজারত মূর্তির স্থাপনের কৌশল গ্রহণ করেছেন। অবশ্য আরও লক্ষ্যণীয় যে, দুটি পা বা দুটি পদ্মপাপড়ির বিপরীত দিককে তিনি গ্রহণ করেছেন পদ্মসিংহাসনকে পদ্মবাহী তেপায়ায় পরিণত করার জন্য। এর সঙ্গে আমরা নেপাল থেকে প্রাপ্ত পদ্মসিংহাসন সম্পর্কে প্রকৃত ভারতীয় মনোভাবের তুলনা করতে পারি। সেই সঙ্গে বিহারে সাঁচীতে একটি অশোক যুগের তোরণে পদ্মাকৃতি অলকরণের প্রথম যুগ দেখা যায়, পরবর্তী কালে এই একমাত্র তোরণের পরিবর্তন ঘটে নি। একটি মৌখিক বা লিখিত বর্ণনা অনুযায়ী প্রতীকী দৃশ্য গঠনের আর একটি অদ্ভুত উদাহরণ দেখা যায়, বারাণসীতে প্রথম উপদেশের পরিচিত চিত্রে। এখানে চিত্রবিন্যাসের শক্তি সন্দেহাতীত। অনভ্যস্ত ইউরোপীয় চোখে অজন্তার মন্দির জাতীয় প্রাচীন সারনাথের মূর্তির চেয়ে এর সৌন্দর্যের আবেদন বেশী মনে হতে পারে। তবু অর্ধ-উপলব্ধ একটি ভাবধারা এবং প্রথাকে সুবিন্যস্ত করার স্পষ্ট চেষ্টার প্রমাণ পাওয়া যায়। ধর্মচক্র-অধিকৃত জায়গাটি যেন এই সংগ্রামের স্বীকৃতির স্বাক্ষর। এটাও লক্ষ্য করা যাবে যে, এই ধর্মচক্র ভুল। ত্রিশূলের মুখ চক্রের বিপরীত দিকে থাকা উচিত ছিল। এই ধরনের আরও অদ্ভুত ও আকর্ষণীয় উদাহরণ যাদুঘরে দেখা যাবে।

গ্রুন্‌ওয়েডেল বস্ত্রের বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু মনে হয়, তথ্যের সম্পূর্ণ তাৎপর্য না বুঝে করেছেন। এই সব ছবিতে দেখা যাবে যে, শিল্পীরা শীতের আবহাওয়ার উপযোগী বস্ত্র বুদ্ধকে পরাতে চেয়েছেন। এ বিষয়ে মহম্মদ নবীতে প্রাপ্ত মূর্তির ছবি বিশেষ মূল্যবান। সম্ভবতঃ এটা গান্ধার যুগের প্রথম দিকের, কারণ,

বুদ্ধের পোষাক ও স্ত্রীলোকদের অলকার সঠিক রাখার চেষ্টা অত্যন্ত স্পষ্ট, এবং তাছাড়াও তা মোটেই সার্থক হয় নি। মনে হয়, এই মূর্তি গড়েছেন যে সন্ন্যাসী, তিনি মগধের লোক ছিলেন। কিন্তু মগধের কোন কারিগর এভাবে হাঁটু বা হাতে মসলিন জড়াত না। তবু খোলা ডান কাঁধ দেখে সঠিক ইচ্ছে বোঝা যায়। পরে পবিত্র মূর্তিগুলোর জন্য নিজস্ব ধরনের পোষাকের রীতি তৈরি ক'রে গান্ধার-শিল্পীরা এই সমস্যার সমাধান করেছিলেন। এটা নিজস্ব বলে এ রীতিতে কাজ ক'রে ওরা খুশী হত। কিন্তু ভারতীয় চোখে আর একটা যে প্রশ্ন ধরা পড়ে, সে স্ত্রীলোকেদের গয়না সম্পর্কে। এ বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বলা হয়েছে কেন, তা আমরা বুঝতে পারব। কিন্তু ফল চেষ্টাকৃত ও ত্রুটিযুক্ত, শুধু ওদের ব্যর্থতাকে স্পষ্ট করে। এ বিষয়ে প্রচুর উদাহরণ রয়েছে। আরও বিশদ ব্যাখ্যার দরকার নেই।

যাকে বলে স্থাপত্যের অলঙ্করণ, তা এই সব ছবিতে খুব দেখা যায়। বৌদ্ধরীতি বলে যা আমরা ভাবতে অভ্যস্ত, তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। ছবির ফাঁকা জায়গাগুলো সর্বত্র খেজুর ছড়িতে ভরা এবং ছবির প্রান্ত ও সীমারেখা কুশ্রীরকম আধুনিক ও ধর্মসম্পর্কহীন। যে ভাস্কর্যের উদ্দেশ্য ধর্মীয় ব্যবহার, তাতে ধর্মীয় অনুভূতির এতটা অভাব আর কোন যুগে বা জায়গায় বোধ হয় পাওয়া যাবে না। যারা প্রাচীন এশীয় অলঙ্করণের গাম্ভীর্য ও তাৎপর্য দেখতে চায়, তাদের কাছে কোরিন্থীয় ফুলের ছবি অতি বিরক্তিকর। লোরিয়ান টাঙ্গাই-এর বুদ্ধ মূর্তি এর চমৎকার উদাহরণ। এখানে আমরা মূর্তিশিল্পের একটি ধ্বনিময় রূপ দেখতে পাই। এর মাধ্যমে প্রকাশিত অনুভূতিটি অপূর্ব! যে ময়ূর পেখম ছড়িয়ে বিশ্বে নির্বাণের আবির্ভাবের গৌরব ঘোষণা করছে, তার চেয়ে থাবা মুড়ে বসা ধর্মীয় পশু-মূর্তি কম সুন্দর নয়। তবু এখানে স্কুলের ছাত্রীরা সূচীশিল্পের মত প্রান্তরেখায় একটা বৈষম্যের সুর ফুটে উঠেছে।

তবে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ভাস্কর্যে নির্দিষ্ট সময়ে গান্ধারের প্রভাব দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ঐ রীতি চরমে পৌঁছলে তবে এই প্রভাব শুরু হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর অপেক্ষাকৃত প্রথম দিকে দেশে দেখা দেয় হুণ আক্রমণ, একটি বিশেষ বছরে, ৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের স্পষ্ট বলা হয়েছে, অত্যাচারী মিহিরকুল প্রবল প্রতিহিংসার নিষ্ঠুরতম মঠ ও স্তূপ ধ্বংস করতে থাকেন। এই ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হয় নি, কারণ, একশো বছর পরে তীর্থযাত্রী হিউয়েন সাং ভারতবর্ষে ভ্রমণের সময়ে অনেক মঠকে অত্যন্ত সজীব অবস্থায় দেখেছিলেন। তবু, বহুসংখ্যক গান্ধার দেশীয় সন্ন্যাসীরা বিহারে ও ভারতের মঠ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই ঘটনা অজন্তার উনিশ নম্বর গুহাবলীতে অঙ্কিত আছে। এখানে প্রথম আমরা বাইরে মূল স্থাপত্য পরিকল্পনার অলঙ্করণের অংশরূপে বুদ্ধমূর্তির ব্যবহার দেখতে পাই। উপরন্তু, এ বুদ্ধ মূর্তি ধর্মীয় নয়; আগেই বলেছি, এ বুদ্ধকে মহান ঐতিহাসিক চরিত্ররূপে নতুন দিক থেকে দেখা হয়েছে। তিনি পতাকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর মাথার ওপরে উড়ন্ত মূর্তি এখানে-

সেখানে অশোক মূর্তির বদলে দাবার ছকের মত নকশা। ঘরের মধ্যে দেখি অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি স্তম্ভের ওপরে, অত্যন্ত অলঙ্কৃত কুলুঙ্গিতে, ফাগুর্সনের গান্ধার-মঠ সংক্রান্ত বর্ণনায় এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। কিন্তু বাইরের প্যানেলগুলির তুলনায় এগুলি আরও ভারতীয় ও ধর্মীয়। নতুন প্রভাবের তারিখ ও উদ্ভব আরও নির্দিষ্ট হয় দাগোবায় বুদ্ধমূর্তির পরিহিত চোগা বা বস্ত্রের নিশ্চিত তথ্যে।

আমরা দেখেছি, শিলালিপির প্রমাণ অনুযায়ী, সতেরো নম্বর গুহায় মন্দির এবং আঠারো নম্বরের চৈত্য ৫২০ খ্রীঃ নাগাদ শেষ হয়েছিল মনে হয়। আমার ব্যক্তিগত মত হল, ছয় থেকে এক নম্বর পর্যন্ত ডানদিকের গুহাগুলির কাজ শুরু বা শেষ হয়েছিল এই তারিখের অল্প পরে এবং গান্ধার থেকে উদ্বাস্তু আসার ঠিক আগে। অজন্তা নিশ্চয় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এর শিল্পের ওপরে উত্তর-পশ্চিমের প্রভাব উনিশ নম্বর গুহায় থেকে যায় নি। ছাব্বিশ নম্বর গুহার কাজ সম্ভবতঃ শুরু করেছিলেন শ্রমণ বুদ্ধভদ্র সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউয়েন সাঙের ভ্রমণের সমসময়ে—এই গুহার সম্পূর্ণ অভ্যন্তরভাগ মূর্তিতে আবৃত, এই মূর্তিগুলির বিপুল ব্যবহার চরমে পৌঁছেছে সাম্প্রতিক গান্ধারবিদদের অতিপ্রিয় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে। বুদ্ধের এই মূর্তি ২৩ ফুট দীর্ঘ, এমনকি যে তেপায়ায় ভিক্ষাপাত্র ও দণ্ড থাকত, তাও ক্ষোদিত হয়েছে। পরিচিত বিষয়ের এমন প্রকাশ অপূর্ব।

তাহলে আমরা বলতে পারি যে, গান্ধার ও অজন্তার মধ্যে একটা বড় রকম শৈল্পিক সম্বন্ধ ছিল এবং এই প্রসঙ্গে তেইশ নম্বর গুহার তোরণে অলঙ্করণের মধ্যে খেজুর ফুলের ঘনিষ্ঠ স্মারক খেজুরপাতার ক্ষোদিত নকশা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু গান্ধারে দ্বিতীয় একটি বিপর্যয় ঘটেছিল, সে দেশে মঠজাতীয় সৌধের ধ্বংসলীলা সম্পূর্ণ হয়েছিল। সারাসেনীয় মুসলিম ও চীনসাম্রাজ্যের যুদ্ধ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাচ্যশক্তির সম্পূর্ণ পরাজয় ও বিতাড়নের ঘটনায় চরমে পৌঁছয় (৭৫১ খ্রীঃ)। নিশ্চয় তখন গান্ধারের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আরবরা ছড়িয়ে পড়েছিল, যে সন্ন্যাসীরা পালান নি, তাঁদের নিশ্চয় হত্যা করা হয়েছিল। ফলে, ভারত অবশ্যই শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল এবং ভারতীয় মঠ ও রাজাগুলির আতিথেয়তা তারা শোধ করেছিল একমাত্র শিল্প ও শিক্ষার দ্বারা। শুধু অজন্তায় নয়, কান্হেরি, কার্লে এবং নিশ্চয় অন্যত্র সব প্রাচীন গুহায় সর্বত্র যে ছোট বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়, তা নিশ্চয় এই যুগের। কানহেরির বিরাট দরবার-কক্ষ (১০ম গুহা) এরকম অলঙ্করণের চমৎকার পরিকল্পনা ও সুষম রূপায়ণে পূর্ণ। কিন্তু সব সময়ে শিল্পীরা তত বিবেচনার পরিচয় দেন নি। তাঁরা পুরনো নকশার মাঝে বা পাশপাশি নিজেদের কাজ শুরু করেছেন—সম্ভবতঃ যেখানে কোন ছবি আঁকা ছিল না, সেই সব জায়গায়—সামঞ্জস্য যথাযথ হবে কি না, একটুও ভাবেননি। নিশ্চয় কয়েক বছর ধরে পাহাড়ের গায়ে এইসব পরিশ্রমী ভাস্কররা সবাই একত্রে কাজ করতেন। তারপর আর কোন রাজনৈতিক বিপর্যয় সব ভাস্করের যন্ত্র এক নিমেষে থামিয়ে দিয়েছিল। হঠাৎ

অধ্যাপনার আনন্দিত গুঞ্জন এবং পাথরে যন্ত্রের সঙ্গীত নীরব হয়ে গেল। গুহাগুলিতে সন্ন্যাসী বা ছাত্র কেউ থাকলেন না; এবং ধ্বংস না হলেও অজন্তা তার সামনের গান্ধার মঠগুলির মত বহু শতাব্দী ফাঁকা পড়ে রইল।

কিন্তু গান্ধারের কিছু শরণার্থী লোকশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন এবং সম্ভবতঃ ৭৫১ খ্রীঃঅব্দে গান্ধারে আরবজয়ের সময় থেকে বৌদ্ধদের মঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ ব্রাহ্মণ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টোল ও আখড়ায় উদ্ভবের সময় ধরতে হবে, ৫৭ খ্রীঃপূর্ব থেকে এই সময়ে উত্তর ভারতের সর্বত্র শক-অব্দ ছড়িয়ে পড়ে। অতএব, এক সুদূর অঞ্চল মগধ ও ভারতের মাতৃভূমির প্রতি ঋণ পরিশোধ করল।

এদের পারস্পরিক তারিখের কথা ভাবতে গেলে দেখি বাইজানটিয়ামের মাধ্যমে ইউরোপীয় শিল্পে গান্ধার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। গ্রুণওয়েডেলের বই-এর ছবির কথা দূরে থাক, কলকাতার যাদুঘরে প্রদর্শিত লুম্বিনী কাননের দৃশ্য যে কেউ দেখলে, চতুর্থ শতাব্দীর শেষ থেকে পরবর্তী কালে গান্ধারের কাছে খ্রীস্টান শিল্পের ঋণের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আজও ইউরোপে যেমন আমাদের অনেকের কাছে সবচেয়ে উন্নত সঙ্গীত হল জর্জীয় সঙ্গীত, তেমন ক্যাথলিক শিল্প একমাত্র সম্পূর্ণ ধর্মীয় বলে মনে হয়, কারণ এতে বাইজানটাইন শিল্পের প্রথম যুগের আড়ষ্টতা ও গাম্ভীর্য রয়েছে এবং এটি গান্ধারে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উপাদানের মিলনের স্পষ্ট ফল। কারণ, গান্ধারশিল্প ইউরোপীয় ক্লাসিক শিল্পের মহাকাব্যিক অনুভূতির সঙ্গে প্রাচ্য অলঙ্করণের সৌন্দর্যকে মেলাবার অপূর্ব চেষ্টা করেছিল। এরকম মিলনের চেষ্টা কৃত্রিমভাবে বা বাঁধাধরা পথে করা যায় না। আমরা এ মিলন চাইলেই ঘটে না। এটা ঘটে অজ্ঞাতসারে, স্বভাবতঃ, কোন ভাবধারাকে কেন্দ্র ক'রে সে ভাবধারায় সমগ্র হৃদয় ডুবে থাকে। গ্রীক শিল্পের 'ইপোস' থেকে 'প্যাথোস' অর্থাৎ বীরত্বের মর্যাদা থেকে মানবিক আবেগে অবনতির জন্য অ্যারিস্টটল্ দুঃখ করেছেন। কিন্তু আবেগকেও বীরত্বমণ্ডিত করা যায়, আদর্শের প্রতি সমর্পণের মাধ্যমে, একথা প্রাচ্য ভালভাবে জানত; গান্ধার শিল্পীরা সে আদর্শ খুঁজে পেয়েছিলেন বুদ্ধের মধ্যে। সেখানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়েই প্রাচ্যের জাদুতে অভিভূত হয়েছিল। একজন মানুষ, যে একই সঙ্গে ঈশ্বরের অবতার, তার কথা ভেবে সবাই মুগ্ধ হয়েছিল। প্রতিটি ভাবধারার মানবিক ও বীরোচিত দিক্কে তুলে ধরার যে প্রবণতা ক্ল্যাসিক যুগে ইউরোপের ছিল, তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা বুদ্ধের সঙ্গী ও শিষ্যদের মূর্তি গড়তে আগ্রহী হয়েছিল। প্রভুর মত এগুলিও দৈববাণীর অংশ হয়ে উঠেছিল। সাঁচীতে আমরা যেমন দেখেছি, আবক্ষ মূর্তিশ্রেণীর মাধ্যমে কোন গল্প বলার প্রাচীন এশীয় প্রথা, তা এখানে কাজে লাগল এবং আমরা পাথরে একটি গভীর ভাবধারার বীরোচিত রূপায়ণ দেখতে পেলাম। চতুর্থ শতাব্দী থেকে বাইজানটাইন রোমক বা গথিক খ্রীস্টান শিল্পে যে সাধুদের সারি বা সভা দেখেছি, তা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে

গান্ধারে শুরু হয়েছিল। ওখানে বৌদ্ধ শ্রমণরা কারিগরদের মগধের অনুভূতি বা শিল্পরীতি শেখাবার চেষ্টা করতেন, তাঁদের থেকে স্বর্গীয় মহাকাব্য রচনার ক্ষমতা ছড়িয়ে পড়ে। সে মহাকাব্যের নায়ক মনকে জয়ী করেছেন, পবিত্রতা ও করুণায় পূর্ণ এবং তাঁর আবেদন কোন বিশেষ দেশ বা রাজ্যের মানুষের কাছে নয়, নয় কোন ব্যক্তিগত আবেগের কাছে, তাঁর আবেদন এই দুয়ের পারে বা দুটির মিলনে, সে হল উন্নতিকামী আত্মার আবেগে।

আমরা ভালভাবে বুঝতে পারি না যে, গান্ধার শিল্প যখন বৌদ্ধবাদের ভারতীয় আদর্শে কোন অবদান রাখেনি, সে যখন নালন্দার নামহীন শিল্পীর কাজের সঙ্গে এক নিমেষের জন্যও তুলনীয় কিছু সৃষ্টি করে নি, তখনও সে বুদ্ধকে পেয়েছে এবং তাঁর জীবন ও শিষ্যদের মাধ্যমে প্রতীচ্যের জন্য একটা ধর্মীয় আদর্শ গড়ে তুলেছে। বস্ফোরাসের তীরে প্রাচীন জায়গায় যখন কনস্ট্যানটাইন তাঁর নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করলেন, অর্থাৎ, ৩২৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে নবীন ধর্মবিশ্বাসের ওপরে প্রাচ্যের প্রভাব সোৎসাহে দেখা দিল, যেমন, এর আগে গান্ধার মঠগুলিতে বাইজানটিয়ামের কারিগরদের দক্ষতা দেখা দিয়েছিল।

মগধের প্রতীকের মর্যাদা গান্ধার কখনো লাভ করতে পারেনি। কিন্তু জটিল পরিকল্পনায়, স্থাপত্য-কাহিনী উপস্থাপনের শক্তিতে, আলংকারিক মিশ্রণের মর্যাদায় এ কথা মনে করা কঠিন যে, গান্ধার ও তার পরবর্তী কালের চরম কৃতিত্ব আর কখনও দেখা দিয়েছিল, এমনকি সঙ্গীতেও।

অবশ্য এ কথা মনে করা চলবে না যে, গান্ধার ইউরোপের তুল্য। গান্ধার শিল্পে পাশ্চাত্ত্য উপাদান থাকা সত্ত্বেও ঐ শিল্প প্রধানতঃ এশীয়। হ্যাভেল তাঁর 'ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রকলা'য় যে স্মরণীয় ভাষায় বলেছেন, তেমনভাবে বোধ হয় আর কখনও প্রকৃত তথ্য সম্যক কথিত হবে না :

"এই সময়ের অনেকটা অংশ জুড়ে এশিয়ার শিল্পের প্রধান সুর ছিল ভারতীয় আদর্শবাদ, তা ইউরোপে আনীত হয়েছিল; আমরা যখন ইউরোপের মধ্যযুগীয় গীর্জায় সম্পূর্ণ প্রাচ্য পরিবেশ ও প্রাচ্য প্রতীকের নতুন সুর দেখতে পাই এবং দেখি প্রাচ্য চিত্ররূপের সব মাধুর্য নিয়ে সে মূল থেকে ক্রমশঃ উন্নতি করছে, তখন একথা মনে হবেই যে, খ্রীস্টযুগের প্রথমে ইউরোপে যে হাজার হাজার এশীয় কারিগর এসেছিল, তাদের দ্বারা আনীত এশীয় শিল্প ও বিজ্ঞানের যতটা জার্মান ও অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য কারিগরগোষ্ঠী গ্রহণ করেছিল, তার কাছে গথিক স্থাপত্য ও হস্তশিল্প যথেষ্ট ঋণী; এই যুগটা ইউরোপীয়দের কাছে সাধারণতঃ শূন্য, কারণ, তখন "বৃহৎ শক্তিগুলি" ইউরোপের বদলে ছিল এশিয়ায়। বাইজানটাইন ও গথিক শিল্প একই উৎস থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিল—সে হল, রোমক সাম্রাজ্যের সভ্যতার উপরে এশীয় ভাবধারার প্রভাব। প্রথম ক্ষেত্রের প্রভাব দেখা যায় গ্রীক ও ল্যাটিন জাতিগুলির মধ্যে, আর অন্যটির প্রভাব টিউটনিক ও কেলটিক জাতিগুলির রোমক

শিল্পে। ভারতীয় আদর্শের ভাব রয়েছে ভেনিসে সেণ্ট মার্ক গীর্জায়, রয়েছে গথিক গীর্জায় রহস্যময় আড়ম্বরের দীপ্তিতে; মণিমুক্তাখচিত বাতায়নের সূক্ষ্ম কারুকার্যে, সাধু ও শহীদদের জীবন-কাহিনীতে; অত্যন্ত বেশী পরিমাণ ভাস্কর্যমণ্ডিত খিলানে, উঁচু চূড়াগুলিতে। ইটালীয় রেনেসাঁয় খ্রীস্টান শিল্প গ্রীসের পৌত্তলিক আদর্শে এবং পণ্ডিতদের শিল্পচর্চায় ফিরে যায়, ফলে আমাদের বর্তমান শিল্পবোধ এবং শিল্প-সংক্রান্ত পুরাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দেয়।"

ভারতীয় সান মার্কো

ফ্লোরেন্সের বাইরে একটি মঠ আছে, সেখানে একদা ফিসোলের সন্ন্যাসী জিওভান্নি—তিনি ফ্রা এ্যাঞ্জেলিকো নামে বেশী পরিচিত—এই মঠে থাকতেন, তার সোনালী পটভূমিকাকে সাধু ও দেবদূতদের ছবিতে ভরে দিয়েছিলেন, সেজন্য মঠটি বিখ্যাত। পরে এই মঠের একটি নিরলঙ্কৃত কক্ষ সাভোনারোলা অধিকার করেছিলেন, তখন তিনি সান মার্কোতে সন্ন্যাসী হয়ে থাকতেন। আজও ইউরোপের এই প্রাচীন মঠ ন্যায়পরায়ণতা ও সৌন্দর্যের অন্যতম স্থান। এর দেওয়ালে এখনো যে দেবদূতদের মূর্তি উজ্জ্বল হয়ে আছে, তাঁরা, অথবা যাঁরা এখানে ছিলেন একদা তাঁদের জীবন—কোন্‌টা বেশী সত্য জানি না।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষ থেকে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত অজন্তাতেও নিশ্চয় অনেকটা এই অনুভূতি ছিল। এই নামকে কেন্দ্র ক'রে এক মহৎ শিল্পরীতি গড়ে উঠেছিল। খুব সম্ভব এরকম প্রথা তখন ভারতে খুব সাধারণ ছিল, এখন সেটা আমরা বুঝতে পারি না। হয়ত বহু বাড়ী উজ্জ্বল ছবিতে ঢাকা থাকত। হয়ত সকলের চোখে সে যুগের বীরোচিত স্বপ্ন তুলে ধরতে সে সোনালী লাল ও নীল রং প্রায়ই ব্যবহৃত হত। কিন্তু অজন্তার ঐশ্বর্য কোন দেশে সাধারণ হতে পারে, এ কথা ভাবা কঠিন। পাহাড়ের গা জুড়ে ছড়ানো এই অপূর্ব খিলান ও দীর্ঘ স্তম্ভ স্লেটরঙা পাথরের নীল ছাদের নীচে আর পেছনে দেওয়ালের গা জুড়ে উজ্জ্বল সৌন্দর্যের প্রকাশ—সারা জগতে কোন বিদ্যালয় বা গীর্জায় এ দৃশ্য সাধারণ হতে পারে না। কারণ, নিঃসন্দেহে মহাবিদ্যালয়রূপে বিরাট কাজ ওখানে হয়েছিল এবং আমরা বুঝতে পারি, সে কাজে কয়েক শতাব্দী লেগেছিল। অর্থাৎ, কয়েকশো বছর ধরে অজন্তাকে ভারতে শিল্পীর অন্যতম বিরাট সুবিধা বলে অথবা শ্রমণশ্রেণীর বিরাট প্রত্যক্ষ প্রকাশ বলে মনে করা হত।

যতখানি সময় জুড়ে কাজটা হয়েছিল, সে সময়ে রীতিটা গড়ে উঠছিল, সেই সময়ের ব্যাপ্তি আমরা বিচার করতে পারি, ষোল নম্বর গুহায় চিত্রাবলী দেখে, সেগুলি সতেরো নম্বর গুহার চেয়ে প্রাচীনতর, বেশী আড়ষ্ট এবং অনেক বেশী আলঙ্কারিক। কিন্তু ষোল নম্বর গুহার ছবিগুলি অজন্তার প্রাচীনতম চিত্র নয়। প্রথম নম্বর গুহায় ঢুকলে আমরা চারিদিকে অজস্র ধ্যানমগ্ন, পূজারত মূর্তি দেখতে পাই।

তারা নিরাড়ম্বর আটকোণা থামের প্রতিটি দিকে দাঁড়িয়ে আছে গম্ভীর চেহারার স্তূপ বা দাগোবার দিকে মুখ ক'রে। প্রতিটি মূর্তির পেছনে একটি জ্যোতি আছে। ওরা হয়ত বোধিসত্ত্ব, কিন্তু উপাসনার অনুভূতি ছোট প্রার্থনাটিকে এমনিভাবে ভরে রেখেছে যে, অজ্ঞাতসারে লোকে ওদের আদিসন্ত ও বুদ্ধের সঙ্গী বলে মনে ক'রে ভীতিমিশ্রিত ভাব নিয়ে স্তূপাকৃতি বেদীর উদ্দেশে পূজায় যোগ দেয়। স্থূলতার কারণে ওরা প্রাচীন জগতের পরিবেশ। ওগুলি যেন ফ্রা এঞ্জেলিকোর শিল্পের মত, কিন্তু এর তারিখ দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে শুরু ক'রে যে কোন সময়ে হতে পারে, অর্থাৎ এঞ্জেলিকোর এক হাজার বছর আগে। স্তম্ভের পিছনের পথে দেওয়ালগুলি বুদ্ধের উপদেশের সাধারণ দৃশ্যের ছবিতে ভরা। এখানে আমরা দেখি, মা মৃত পুত্রকে নিয়ে আসছেন, আর প্রভু শিষ্যপরিবৃত হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আমরা প্রার্থনাগৃহে ফিরে যাই, আবার স্তম্ভের মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে এক মূহূর্ত স্বপ্ন দেখি, যতক্ষণ না মনে হয়, তাদের গভীর স্তবগীতিতে আমাদের চারদিকের বাতাস ভরে উঠেছে।

বৌদ্ধ উপাসকদের এই নীরব সারি মনের চোখে ফুটিয়ে তোলে, একদা উপাসনা এই ছোট প্রার্থনা-গৃহকে ভরে তুলত। দেখি, শ্রমণরা সারি বেঁধে এক দরজা দিয়ে ঢুকছেন, বেদীকে প্রদক্ষিণ ক'রে অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতেন। তাঁদের হাতে দেখছি আলো, তাঁরা ধূপ দিয়ে আরতি করছেন, সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করছেন। ঘরের পিছন থেকে সাধারণ লোক ও ছাত্রদের নীরব জনতা তাঁদের দেখছে, এখনো যেমন হিন্দু আরতিতে লোকে দূরে হাঁটু মুড়ে ব'সে দেখে। আমরা দেখি, শ্রমণরা ধূপ দোলাতে দোলাতে মন্ত্র পড়ছেন এবং আমরা বুঝতে পারি, বলির অনুষ্ঠানের আড়ম্বর ও তাৎপর্যবিহীন উপাসনাকে গাম্ভীর্য ও প্রভাবশালী করার সমস্যা বৌদ্ধধর্মকে সমাধান করতে হয়েছিল। নিশ্চয় এই চেতনাই দ্রুত এমন এক অনুষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, যার উপাদানগুলি বস্তুতঃ বৈদিক অনুষ্ঠান থেকে গৃহীত, কিন্তু সমগ্র অনুষ্ঠানটি এমন এক গণতান্ত্রিক ধর্মের অতিবিশিষ্ট ও মৌল প্রকাশ যা জগৎ কখনো দেখেনি। খ্রীস্টান উপাসনার ইতিহাস এখনো লেখা হয় নি, কিন্তু আমরা এ কথা বিশ্বাস করতে পারি যে, যখন লেখা হবে, তখন দেখা যাবে, যা ভাবা হয়েছে চৈত্যের কাছে তার ঋণ তার চেয়ে বেশী।

সাধু ও শ্রমণদের সারি আমাদের আর একটি ভাবধারা সম্মুখীন করে। আমরা বুঝতে পারি, বৌদ্ধ উপাসকের কাছে এই স্তূপাকৃতি বেদীর অর্থ কতটা গভীর। এর অর্থ যেন অনুভব করতে শুরু করি। যুগযুগব্যাপী পূজার দ্বারা পবিত্র—কারণ, প্রাক্‌বৌদ্ধ স্তূপ-উপাসনা প্রচলিত ছিল; আয়ারল্যাণ্ডের সাঁচী, নিউগ্র্যাঞ্জ বুদ্ধের ... এক হাজার বছরের প্রাচীন—ঐ গম্বুজাকৃতি স্তূপে লোকে যা দেখত, তা আমরা এখন বুঝতে পারি না। তবু আমরা সে দিকে তাকিয়ে এই বা ঐ প্রতীকের বিষয়ে কিছু অনুভব করার চেষ্টা করি। যে সব বস্তুর প্রতি প্রায়ই মানুষ পূর্ণ হৃদয়ে

ছুটে গেছে, সে সব বস্তু কি বিচিত্র! আড়াআড়ি এক জোড়া চাবুক; একখানা আধখানা চাঁদের মত কুঠার; একটি পাথরের পিরামিড। এই প্রতীকগুলির প্রত্যেকটিরই সে যুগে শক্তি ছিল মানুষকে, শান্তি ও সৌভাগ্য সামনে এগিয়ে দেওয়ার। এই প্রতীক কোন ছবি বা মূর্তি গ্রহণ করলে এটা সাধারণতঃ ধারণা করা সহজ হয়। লোকের মনে হয়, ক্রসের চেয়ে ক্রুশবিদ্ধ দেহ মানুষকে বেশী টানে। বুদ্ধের মূর্তিযুক্ত স্তূপ মানুষকে শুধু স্তূপ বা দাগোবার চেয়ে বেশী নাড়া দেয়। তবু এখানে শ্রমণদের সারির মধ্যে আমরা সম্পূর্ণ নতুন এক অনুভূতির ইঙ্গিত পাই। আমরা বুঝতে পারি মূর্তি যখন প্রতীকে যুক্ত হয়েছে, ততদিন বিশ্বাস ম্লান হয়ে এসেছে।

অজন্তার বিশ্ববিদ্যালয় আদিম সরলতা থেকে সরে এসেছে। ষোল নম্বর গুহা অত্যন্ত অলঙ্কৃত এবং সতেরো নম্বর গুহা সৌন্দর্য ও কাহিনীর যথার্থ খনি। কোন-না-কোন মূল্যবান বিষয় চোখে পড়ে এবং সর্বত্র ছবিগুলির মধ্যে সুন্দর অলঙ্কৃত মূর্তি রয়েছে। একবারও প্রেরণা বিপথগামী হয় নি, যদিও আদি কোমল উজ্জ্বলতা অনেকাংশে ম্লান হয়ে এসেছে এবং রঙ অনেকটা অনুমান করতে হয়। বিষয়বস্তু কি? সেইটাই প্রশ্ন। অন্ততঃ একটি বিষয় আপাততঃ এখানে বি... বিখ্যাত হয়েছে এক ইংরেজ শিল্পীর সাম্প্রতিক পরিশ্রমের ফলে,* তাতে জাতক থেকে মহাহংসজাতকের কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এগুলি হল বৌদ্ধধর্মের পুরাণ অর্থাৎ, এগুলি ছিল বৌদ্ধ ধর্মের জনপ্রিয় সাহিত্য। ইতিহাস অনেকাংশে শুধু পূর্বে উপস্থিত উপাদান দিয়ে ক্রমান্বয়ে নির্বাচন ও শৃঙ্খলা গঠনের কাহিনী। এই অর্থে পুরাণ জাতকের প্রতিফলন ও অনুকরণ। উভয়েরই উপাদান আগে উপস্থিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম পালিতে একটি এবং পরে সংস্কৃতে হিন্দুধর্মে আর একটি পুরাণ তোলে। কিন্তু কয়েক ক্ষেত্রে মনে হবে, সিংহলে ধর্মপ্রচারের ইতিহাস-স...

* ১৯১০ সালের জুনের বার্লিংটন পত্রিকায় ছবি এবং শ্রীমতী হেরিংহ্যামের মূল্যবান টীকা দেখুন।

† রানী ক্ষেমা স্বপ্নে স্বর্ণহাঁস দেখে রাজা সংযমকে ঐ হাঁস এনে দিতে বলেন। রাজার একটি সরোবর ছিল, ব্যাধ হংসরাজকে সেখান থেকে ধরে আনে। হংসরাজের প্রধান সেনাপতি সুমুখ ব্যতীত আর কেউ সঙ্গে এল না। সুমুখকে আনা হলে রাজা তাদের প্রভূত সম্মান দান করলেন এবং হংসরাজ তাঁকে শিক্ষা দিলে রাজার অনুমতিতে দুজন আত্মীয়স্বজনের কাছে চিত্রকূট পাহাড়ে ফিরে যান।

"প্রভু এখানে গল্প শেষ ক'রে ঐ জন্মের পরিচয় দেন: তখন ব্যাধ ছিল চন্ন, রানী ক্ষেমা ছিলেন সন্ন্যাসিনী ক্ষেমা। রাজা ছিলেন সারিপুত্ত, রাজার ... বুদ্ধের ভক্ত, সুমুখ ছিলেন আনন্দ এবং হংসরাজ আমি নিজে।"

—মহাহংসজাতক, পৃঃ ৫৩৪, ৫ম খণ্ড, কাওয়েলের জাতক

...াবংশ ছিল অজন্তা শিল্পীদের রত্নাগার। কয়েকটি গুহায়, জাহাজ ও হাতি ...দ্যায়ের ছবি রয়েছে। মনে হয়, ঐ কাহিনীর পরিচিত অংশের সঙ্গে তা যুক্ত। ...যু আবার ঐ একই গুহায় পৌরাণিক বা জাতকের কোন স্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে,—যেমন, রাজা তুলাদণ্ডে আরোহণ করছেন একটি বাজ এবং একটি ঘুঘুর ...পস্থিতিতে—বর্তমান অবস্থায় ছবিগুলির পারম্পর্য খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। এখানে সেই রাজনৈতিক ছবিটিও রয়েছে, যার থেকে এক নম্বর গুহার ছবির সময় ৬২৮ খ্রীঃ কাছাকাছি অথচ পরে বোঝা যায়। এটা খুব স্বাভাবিক যে, বৌদ্ধ জগতের ...র্ব সম্পর্কে জাতকের সঙ্গে সিংহলের মতভেদ ঘটবে। এতে বিশ্বাসের মহৎ কাহিনী গড়ে তুলেছিল। বড় বড় কাজের জন্য অনেক ক্ষেত্রে যে প্রচেষ্টা হয়েছিল, এখানেও তা হয়েছিল, কিন্তু এখানে দেশ অত্যন্ত ছোট বলে সে প্রচেষ্টা প্রভাব-বস্তার করেছিল। সে আবেগের স্রোত তার শাসকদের স্বদেশ থেকেও এসেছিল ...গ্র সভ্যতা সোৎসাহে তা গ্রহণ করেছিল। পবিত্র বৃক্ষ, রাজপুত্র মহেন্দ্র এবং রাজকন্যা সংঘমিত্রা দেশের এমন প্রতিনিধিত্ব করেছেন, যাতে যে কোন দেশ গর্ব বোধ করতে পারে। এইভাবে গড়ে-তোলা সম্বন্ধকে বজায় রাখা হয়েছে। ইচ্ছা হলে ...মরা কল্পনা করতে পারি যে, এখানে অজন্তার সঙ্ঘারামে সিংহল থেকে ছাত্র এসেছিল। রাজারা এবং অভিজাতরা নিশ্চয় শিক্ষার জন্য ছেলেদের মঠে পাঠাতেন, এখনও ব্রহ্মদেশে ও জাপানের গ্রামে এরকম হয়। প্রাচ্য তার সাংস্কৃতির মান ...হয়ায়ী দ্রুত শিক্ষিত হয়েছিল; নর্মান জমিদারের কাছে মঠের শিক্ষা লাভজনক ...ল না বলে আমাদের এ কথা মনে করার কারণ নেই যে, খ্রীস্টযুগের প্রথম দিকে ভারতে মন্ত্রী ও রাজারাও সেইভাবে নিরক্ষরতার জন্য ঔদ্ধত্যপূর্ণ গর্ব প্রকাশ করতেন। ...ধান গুরুর মূর্তিযুক্ত মন্দির-সমন্বিত বিহারের সমগ্র দৃশ্য আমাদের এমন এক ...তির সাক্ষ্য দেয়, যে উন্নতি তাদের কাজকে প্রভাবিত করেছিল, সাধারণ ভিক্ষুগৃহ ...ক সংগঠিত মহাবিদ্যালয় পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল অজন্তার মঠের একাধিপত্যে। যে ...ত্র বিদেশী অতিথি এ মঠে জ্ঞান দান করতে বা সংগ্রহ করতে আসতেন, হিউয়েন ...ঙ ছিলেন তাঁদেরই একজন। আমরা যদি যথার্থভাবে দেখি, তাহ'লে দেখব, ...থিবীর বহু সুদূর প্রান্ত থেকে আগত বহু জাতির স্বর ও মূর্তিতে এখানকার অন্ধকার ...ও ছায়াময় কোণ পরিপূর্ণ। ৬২৬ খ্রীঃ নাগাদ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে দ্বিতীয় ... যে পারসিক দূত পাঠিয়েছিলেন, তার একটি ঐতিহাসিক চিত্র এক নম্বর ...হায় আছে।

যে গুহাটা আমার কম পছন্দ, সেটা হ'ল দু নম্বর গুহা। এখানে দুপাশে প্রার্থনা-কক্ষগুলিতে রাজা, রাণীদের বা তার চেয়ে একটু কমসম্মানসম্পন্ন ধর্মিক পৃষ্ঠপোষক-... মূর্তি আছে, একটি মূর্তির সঙ্গে শিশুও আছে। এ গুহার চিত্রবলীও গুণগত-... অবনত, যদিও এখানে কিছু শ্রেষ্ঠ চিত্র দেখা যায়। কয়েকটি অংশ দেখলে ...ন হয়, চিত্রগুরু প্রধান মূর্তিটি এঁকে পটভূমি বা বাকী অংশ ছাত্রদের বা অধীন

কর্মীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন ; কয়েক জায়গায় কিছু ভুলের আভাস পাই, পরে কৃষকশিল্পীদের হাতে তা বহুদূর ছড়িয়েছে। প্রভুর সঙ্গে সমরেখায় পৃথিবীর অধিকাংশ ঘটনাকে তুলে ধরার মধ্যে একটা পার্থিবতার ভাব আছে, যদিও দেওয়ালে ছবিগুলি আঁকার অনেক আগে নিশ্চয় এটা হয়েছিল এবং এর কয়েকটিতে গাম্ভীর্য বা শৈলীর অভাব আকস্মিক ঘটনামাত্র। এই সারির অপর প্রান্তে আর একটি গুহা আছে, সেখানেও এই ধরনের চিত্রাবলী দেখতে পাই। আমার মনে হয়, ওটা একুশ নম্বর গুহা। বস্তুতঃ উনিশ থেকে ছাব্বিশ পর্যন্ত সব কটি গুহার যে কোন ছবি এক থেকে সতেরো পর্যন্ত গুহার তুলনায় নিকৃষ্ট। বিষয়গুলি প্রাণ ও শক্তিতে ভরপুর। একমাত্র ত্রুটি হল যে, অজন্তার শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবির মত সেই মনীষা ও ঐশ্বর্য নেই। সতেরো নম্বর গুহায় স্বর্ণহংসের কথা শ্রবণরত রাজা অথবা বসন্তের দৃশ্য—আমার মনে হয় এর অর্থ, রাণী মায়া লুম্বিনী কাননে প্রবেশ করছেন—এর চেয়ে সুন্দর ছবি পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যাবে না—ছবিগুলি গুহার একটি স্তম্ভের উপরে অঙ্কিত। যে বিশিষ্ট সমালোচক এ বিষয়ে গবেষণা করছেন, তাঁর মতে, এক হাজার বছর পরে মহৎ ইতালীয় শিল্পীদের শ্রেষ্ঠ ছবিতে যে সব বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার অনেকগুলি এইসব ছবিতে রয়েছে। শুধু সাধারণভাবে নয়, পদ্ধতির অনেক খুঁটিনাটিতেও এটা দেখা যায়। যেমন, শিল্পীরা জানতেন ছবির ভাবের গভীরতার বৈচিত্র্য আনতে হলে কিভাবে ছবির রেখায় পরিমিতি আনতে হয়। সেই সমালোচকই বলেছেন যে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও মাংসপেশীর গঠনে যে শারীরতাত্ত্বিক জ্ঞান দেখা যায়, তা প্রায় দুর্লভ। এসব থেকে শুধু সে যুগের চিত্রের উন্নত অবস্থাই নয়, শিল্পীর মনে চিত্রের প্রতি চরম পরিমাণ মনোযোগ ও শ্রদ্ধার অস্তিত্বও বোঝা যায়। এই গুণটা মনে হয়, দু নম্বর গুহায় তার কিছুটা গভীরতা হারিয়ে ফেলেছে।

গুহাগুলির মধ্যে আমার প্রিয় হল, চার নম্বর গুহা। কিন্তু এটি অসম্পূর্ণ এবং দেখে মনে হয়, এর ভেতরে কখনও ছবি আঁকা হয় নি। এর পরিমিতি অপূর্ব—উদার, উন্নত, বিশাল। প্রথম আমাদের এখানে প্রবেশের সময়ে সঙ্গী একজন ভারতীয় সখেদে বলেছিলেন, "এটা আমাদের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে হতে পারত!" কথাগুলি একেবারে সঠিক ধারণা প্রকাশ করেছে। এটি ভারতের ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে হতে পারত।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এক নম্বর গুহাতে শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি রয়েছে। এখানে কেন্দ্রীয় মন্দিরের বাঁদিকে একটি বিরাট ছবি রয়েছে, তার রেখা ও রং এখন ম্লান হয়ে এসেছে, তবু এখনও সুকুমার। এক বিশালদেহী তরুণ দাঁড়িয়ে আছেন, হাতে পদ্ম, তাঁর সামনে জগতের দিকে চেয়ে আছেন। তিনি বিহারের দিকে চেয়ে রয়েছেন। তাঁর চারদিকে ও পিছনে সাধারণ আকারের মূর্তিরা দাঁড়িয়ে আছে। শূন্যে কিন্নর ও অন্যান্য পৌরাণিক প্রাণীরা ভীড় ক'রে দেখছেন। এই সত্যটি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধকে চিনিয়ে দেয়। কিন্তু তাঁর দেহের অলঙ্কার ও মাথার দীর্ঘ কিরীট

বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, ইনি যুবরাজ বুদ্ধ, সন্ন্যাসী বুদ্ধ নন। তাঁর মুখে, ভঙ্গীতে এক বিস্ময়মিশ্রিত সমবেদনা ব্যাপ্ত, বাঁদিকে—অর্থাৎ, দর্শকের ডানদিকে—দাঁড়িয়ে আছে এক নারী, সামান্য বিপরীত দিকে ক্ষোদিত এই মূর্তি যেন প্রতিটি রেখায় বুদ্ধের মনোভাবকে শান্তভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। এই ছবিটি সম্ভবতঃ জগতে বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ কাল্পনিক বিকাশ, এরকম কল্পনা ক্বচিৎ দুবার ঘটে। তাঁর পিছনের দ্বার এবং চারদিকে রাজ-উদ্যানের কল্পিত তালগাছ দেখে একথাও মনে হয় অনায়াসে যে, এটি সেই সময়ের ছবি যখন বুদ্ধের মনে প্রথম মহৎ ত্যাগের চিন্তা আসে, যখন তিনি ত্যাগের দ্বারপ্রান্তে এসে হঠাৎ মানবজীবনের ভয়ঙ্কর নবরত্নের কথা চিন্তা ও উপলব্ধি করেছেন। তাঁর স্ত্রী স্নিগ্ধ প্রেমে তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করছেন, তাঁর সহানুভূতি, বীরত্ব সব মাধুর্যের চেয়ে এখনো গম্ভীর। মনে হয়, অজন্তার শ্রমণ শিল্পীদের স্বপ্নে যশোধারার স্থান ছিল এবং যে কোমলতার মুহূর্তে কাছে আসে, আবার নিঃসঙ্গ অবস্থায় মহত্তর আহ্বানের অনুপ্রেরণা জোগায়, এ তার স্থান। যে শুধু তার স্বামীর দৈনন্দিন প্রয়োজন নয়, তাঁর মহত্ত্বের প্রতি সত্য ও অনুগত হয়েছিল, এ স্থান তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এ স্থান তিনি স্ত্রীরূপে পেয়েছেন, কারণ, নারীরূপে তিনি আগেই মহতী ছিলেন। এইসব রূপ দেখা দিয়েছিল চালুক্য রাজাদের শ্রেষ্ঠ সময়ে ঐ রাজ্যের অভিজাত মারাঠা ও রাজপুতদের যুবকদের ক্ষেত্রে। এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্ররা কাঞ্জীভরমের পল্লবদের বিরুদ্ধে নিজেদের রাজাদের অবিরাম যুদ্ধ দেখাশোনা করতেন এবং সপ্তম শতাব্দীর শেষ থেকে পশ্চিম উপকূলে ভারতে যে সব আক্রমণ শুরু হয়েছিল, তা প্রতিহত করত। উর্বর ভারতীয় ভূমিতে বা পরবর্তী কালে যুদ্ধক্ষেত্রে আগুনের চারধারে, দেশের বাড়ীতে ওরা মানব-ইতিহাসে নিঃসঙ্গ, অভিজাত ও করুণাময় মুখগুলির কথা ভাবত। স্বপ্ন মানুষকে গড়ে তোলে। যে যুগে ভারতে স্বপ্ন এমন ছিল, সে যুগ মহান্ হলে কি আমাদের বিস্মিত হওয়া উচিত ?*

ফা-হিয়েন

ভারতীয় ঐতিহাসিক রচনার মধ্যে প্রাচীন চীনা পরিব্রাজকদের লিখিত ভ্রমণ-কাহিনীর মত আকর্ষণীয় আর কিছু নেই। এর মধ্যে এখন আমাদের সবচেয়ে পরিচিত দুটি হল, ৪০০ শতাব্দীতে ভারতে আগত ফা হিয়েন এবং ৬৪০ শতাব্দী নাগাদ হিউয়েন সাঙের রচনা। হিউয়েন সাঙের জীবনী পরে তাঁর শিষ্যরা লিখেছিলেন বলে তিনি আমাদের কাছে ব্যক্তিরূপে দেখা দেন। তাঁকে দেখি এক বিরাট ধর্মীয় গোষ্ঠীর নেতা ও শিক্ষক, সন্ন্যাসী ও পণ্ডিত, শ্রমণ ও ভ্রমণকারী-রূপে। কিন্তু ফা হিয়েন এঁর তুলনায় নিঃসঙ্গ, ব্যক্তিরূপহীন চরিত্র। তিনি

---

* হিউয়েন সাং বলেছেন, মারাঠারা অজন্তা দেশের লোক। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শতাব্দীতে এখানে চালুক্য রাজপুতরা রাজত্ব করতেন।

সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রী হলেও তাঁর ভৌগোলিক রূপটি আমাদের বেশী প্রভাবিত করে। গম্ভীর, স্বল্পবাক মানুষটি নিজের বিষয়ে আমাদের প্রায় কিছুই বলেননি। আমরা যতদূর জানি, বৌদ্ধধর্মীয় গবেষণার কাজে যে সব প্রথম যুগের ভ্রমণকারীরা ভারতে এসেছিলেন, তাঁদের একজন সম্ভবতঃ ছিলেন ফা-হিয়েন। সর্বত্র তাঁকে যেমন বিস্ময়ের সঙ্গে অভ্যর্থনা করা হয়েছে এবং যে শুভেচ্ছা ও প্রশংসার কথা তিনি লিখে গেছেন, তাতে এ কথাই সত্যি বলে মনে হয়। অন্য দিকে, যেমন নিঃশব্দে তিনি এসেছেন এবং গেছেন, রাজার অনুগ্রহ বিষয়ে তিনি যেমন নীরব, তাঁর আত্মসচেতনতার যেমন অভাব, তাতে মনে হয়, সে যুগে ভারতে চীনা ভ্রমণকারীকে দেখার ঘটনা বিরল ছিল না। যদিও ফা হিয়েন ও তাঁর দল যে কাজে এসেছিলেন, তাতে হয়ত তাঁরা বিশেষ পরিমাণ শ্রদ্ধা ও কৌতূহল লাভ করেছিলেন। পাঞ্জাবের লোকেরা বলত, "এরা যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে ধর্মনীতি শিখতে এভাবে এসেছে, এদের আগ্রহ কি বিরাট!" অথচ কোশলে ও দক্ষিণে "তর্কবিদ্যার পুরোহিত"দের কথা প্রায়ই শোনা গেছে। এঁরা মনে হয়, তীর্থযাত্রী তাওপন্থী শ্রমণ ছিলেন, এটা এ বিষয়ে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য সৃষ্টি করে। হিউয়েন সাঙের রচনা যথার্থই আত্মজীবনী, কিন্তু এঁর রচনা কোন বিদ্বৎসমাজ, সম্ভবতঃ দক্ষিণ চীনের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে প্রদত্ত ও তাদের দ্বারা অনুমোদিত বিবৃতির নৈর্ব্যক্তিক রূপ।

নির্দিষ্ট একটি বছরে নির্দিষ্ট কিছু সঙ্গী নিয়ে ফা-হিয়েন ধর্মের নীতি ও শিক্ষা বিষয়ে ভারতে অনুসন্ধানের জন্য বহির্গত হন, "কারণ, চাংগানে (শোন্-সি-র সিয়ান ছিল তাঁর জন্মস্থান) ধর্মশিক্ষা ও ধর্মগ্রন্থের অবলুপ্তি ও ক্ষয় দেখে তিনি দুঃখিত হন।" এই সাধারণ কথাগুলি দিয়ে তিনি বিবৃতি শুরু করেছেন। সারা জীবনের আবেগ যেখানে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে ভাষা এত সহজ। যেদিন "ফা-হিয়েন বহির্গত হলেন" থেকে যেদিন "গ্রীষ্মের বিশ্রামের শেষে সবাই ভ্রমণকারী ফা-হিয়েনের সঙ্গে দেখা করতে এল", তার মধ্যে দীর্ঘ পনেরো বছর চলে গেছে, সেই সময়ে তিনি অবিশ্রান্ত সব বাধা অতিক্রম করেছেন, অসংখ্য সমস্যা বহন করেছেন!

তাঁর বইতে চল্লিশটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায় রয়েছে, এক একটি অধ্যায়ে এক এক প্রদেশের কথা। এ বিষয়ে তিনি নিজে বলেছেন:

"বর্তমান রচনা সারসঙ্কলন মাত্র। এ পর্যন্ত পণ্ডিতরা শোনেননি বলে তিনি (ফা-হিয়েন) খুঁটিনাটি বর্ণনা করেননি। তিনি সব রকম শ্রম পেরিয়ে, বহু পদস্থ ও ও অভিজাত ব্যক্তির অনুকূলতালাভের সুখ ভোগ ক'রে ফিরে এসেছেন সমুদ্র পেরিয়ে। বিপদে পড়ে রক্ষা পেয়েছেন। তাই এখন যা ঘটেছে, সব লিখে রাখছেন, যাতে যা শুনেছেন ও দেখেছেন, পণ্ডিতরা তা জানতে পারেন।"

নিঃসন্দেহে বলতে পারি, এটা মুখবন্ধ-জাতীয়, ভ্রমণ-সংক্রান্ত রচনা কোন পণ্ডিত-মণ্ডলীর মতামতের জন্য পেশ করা হয়েছিল।

ঐ ভ্রমণে লেগেছিল পনেরো বছর। জন্মস্থান ছাংগান প্রদেশ ত্যাগ করার পর সিন্ধু নদ ("পশ্চিমের নদ")। পেরোনো পর্যন্ত ছ-বছর লেগেছিল। ছ-বছর উড়িষ্যায় থাকার সময় ধরে তিনি ভারতে ছিলেন ছ'বছর। শেষে সিংহলে ছ'বছর কাটিয়ে বাড়ী ফিরেছেন তিন বছরে। ছাংগান ত্যাগ করা থেকে ভ্রমণের প্রতিটি স্তর বর্ণিত হয়েছে। বই-এর শেষে ফা-হিয়েন বলেছেন, তিনি অন্ততঃ ত্রিশটি রাজত্ব ঘুরেছেন। কিন্তু খোটানের দক্ষিণ ও পশ্চিম অঞ্চলগুলিকে "উত্তর-ভারত" বলা হলেও মথুরায় না আসা পর্যন্ত প্রকৃত ভারতে এসেছেন বলে ফা-হিয়েনের মনে হয় নি। মথুরাকে উনি প্রায় রাজধানীর মর্যাদা দিয়েছেন। সমগ্র দেশ ও সভ্যতার অপূর্ব একটি ছবি দেওয়ার জন্য তিনি এখানে পৌঁছবার মুহূর্তটিকে ধরে রেখেছেন। প্রশাসন, বিধি নিয়মবিহীন স্বাধীনতায় মানুষের আসা-যাওয়া, ন্যায়-বিচারের ও অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার সংযম বর্ণনা করেছেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ওটা ছিল তথাকথিত "উজ্জয়িনী"র বিক্রমাদিত্যের যুগ। উজ্জয়িনী কি তাহলে সারা পশ্চিম ভারতের নাম ছিল, আর মথুরা কি ছিল তার প্রধান শহর? মথুরার তুলনায় পাটলী-পুত্রকে অপেক্ষাকৃত গুরুত্বহীন মনে হয়। পাটালীপুত্র ছিল আরও প্রাচীন, বিবর্ণ এবং বেশী গাম্ভীর্যপূর্ণ। এটা ছিল "অশোকের রাজধানী"। ওখানকার প্রাসাদগুলি তখনও অপূর্ব ছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও ওটি প্রধান ও উল্লেখযোগ্য ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের রাজদূতরা ওখানে থাকত। কিন্তু বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে, হয়ত রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও আমরা বুঝতে পারি, মথুরায় ফা-হিয়েনের ভ্রমণের সময়ে ভারতে শক্তির কেন্দ্র ছিল মথুরা। এখান থেকে তিনি সংকাশ্য ও কনৌজ দিয়ে বুদ্ধের নিজের জায়গার কেন্দ্রে যান—শ্রাবস্তী, কপিলবস্তু, কুশীনগর ইত্যাদি, সেখান থেকে গঙ্গা পর্যন্ত যান, এই জায়গাগুলি এত পুরাতত্ত্ববিদের প্রচণ্ড পরিশ্রমে এখন অনেক পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে। গঙ্গা থেকে তিনি পাটলীপুত্রে ফিরে সেখান থেকে বারাণসী ও কৌশাম্বী যান। আবার পাটলীপুত্রকে প্রধান কর্মস্থল ক'রে বোধ হয় বৌদ্ধ অঞ্চলে তিন বছর ধরে সংস্কৃত শেখেন, পাণ্ডুলিপি নকল করেন। শেষে গঙ্গা বেয়ে চম্পা-রাজ্যের মধ্য দিয়ে তমলুক বা তাম্রলিপ্তিতে আসেন, সেখানে দু'বছর থাকেন। তাম্রলিপ্তি থেকে বড় জাহাজে তিনি যখন দক্ষিণ-পশ্চিমের উদ্দেশে রওনা হন, তখন মনে হয়, পথে দু'বছর সিংহলে কাটালেও উনি ফিরবার জন্যই বেরিয়েছিলেন।

তিনি ঐ ভ্রমণ সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত সব দর্শনের বর্ণনা দিয়েছেন এবং দেশের আর সব তুচ্ছ করেছেন। বৌদ্ধধর্মের পূর্বেকার যুগের হিন্দুধর্মের সব শ্রেণী সম্বন্ধে ফা-হিয়েনের ভাষা হল, "ব্রাহ্মণ ও বিধর্মী।" তবু তাঁর লেখা থেকে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছু আমরা জানতে পারি। প্রথমতঃ জানতে পারি যে, একজন শিক্ষিত চৈনিক, যিনি গান্ধারে বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণা করেছেন, করেছেন প্রকৃত ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের রাজ্যগুলিতে, তাঁর ভাষায় "মধ্যভারত" বা প্রকৃত ভারত ছিল এমন জায়গা, সেখানে তিনি মূল ও প্রমাণসাপেক্ষ মূর্তি খুঁজেছেন; এ

কথা পরে আরও বিশদভাবে হিউয়েন সাঙ বলেছেন। গান্ধার, সোয়াৎ, দারাদ, উদ্যান, তক্ষশীলা, পুরুষপুর এবং নাগর (সম্ভবতঃ কাবুল) পেরিয়ে তিনি আমাদের তাম্রলিপিতে দু'বছর ধরে বই নকল করলেন, ছবি আঁকলেন। আবার ফা-হিয়েন বলেছেন, তাঁর ভ্রমণের সময়ে রাজগীরের প্রাচীন শহর "সম্পূর্ণ মরুভূমি ও পরিত্যক্ত"। বোঝা যায়, আজও এই জায়গায় যে প্রচুর পরিমাণ মূর্তি পাওয়া যায়, তা অনেকটা এক বিশেষ ভাস্কর্যরীতিতে নির্মিত, সে রীতি ৪০০ শতাব্দী আগে উদ্ভূত ও উন্নত হয়ে ধ্বংস হয়। এই তথ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা ভ্রমণের সময়ে অনবরত দেখি যে, পবিত্র জায়গাগুলিতে "প্রার্থনা-কক্ষ, মঠ ও স্তূপ" রয়েছে। বুদ্ধের প্রার্থনাকক্ষ নিঃসন্দেহে মন্দির। ফা-হিয়েনের গবেষণায় অন্যতম বিষয়বস্তু যে বৌদ্ধ ভাস্কর্য, তার ঐতিহাসিক দিক্ সম্পর্কে তিনিও অনুভব করেছিলেন। সর্বদা এমনভাবে কথা বলেছেন, যেন বৌদ্ধধর্মে মূর্তি খুব প্রচলিত ছিল, অথচ বলেছেন, "বুদ্ধের সর্বপ্রথম যে মূর্তি পরে সকলে নকল করে" সেটি ছিল চন্দনকাঠে ক্ষোদিত এক বৃষের মস্তক, বুদ্ধ যখন তুসিত স্বর্গে থেকে মাকে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ এ মূর্তি তৈরি করিয়েছিলেন। এখানে মনে হয়, মূর্তি ও প্রতীকের পার্থক্য খুব স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয় নি। কিন্তু বিবরণে দেখা যায় যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর লোকে বৌদ্ধ মূর্তির ঐতিহাসিক উৎস বলে মনে করত পূর্বপ্রদেশ ও বুদ্ধের নিজের কার্যাবলীর জায়গাগুলিকে। আবার উনি যখন সিন্ধু-নদের উত্তর-পূর্ব দিকে, আফগানিস্তানের পূর্বে ও হিন্দুকুশের দক্ষিণে থো-লি রাজত্বে বা দার্দদের দারদ রাজ্যে যান—তখন তিনি আমাদের বলেন যে, এই রাজ্যে একদা এক অর্হৎ ছিলেন, তিনি তুসিত স্বর্গে এক ভাস্করকে পাঠান মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের আয়তন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখে আসতে। তিনবার সে গিয়েছিল, ফিরে এসে বিশাল আকারের এক মূর্তি তৈরি করে, উচ্চতায় তা আট ফিট। উৎসবের দিনে তা আলো দিয়ে সাজানো হত এবং আশেপাশের রাজারা মাঝে মাঝে পুজো দিতেন। লোকে জনশ্রুতি সম্পর্কে যেমন আবছাভাবে কথা বলে, তেমন ভঙ্গীতে তীর্থযাত্রী বলেছেন, "এই মূর্তি এখনও ঐ জায়গায় আছে।" তিনি আরও বলেছেন। এই মূর্তি তৈরি হওয়ার পর বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করা সিন্ধু অঞ্চলের প্রান্ত থেকে বই ও পবিত্র গ্রন্থ নিয়ে আসতে শুরু করেন; মূর্তিটি তৈরি হয় মহানির্বাণের তিনশো বছর পরে। এখানে আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। প্রথমতঃ বুদ্ধের মৃত্যুর তিনশো বছর পরে বৌদ্ধধর্ম যখন সিন্ধুনদ পার হয়, তখন তা হয়েছে বোধিসত্ত্বের ধর্ম। স্পষ্টতঃ কিছু কিছু সন্ন্যাসী ছিলেন, হয়ত মঠবাসীদের সম্প্রদায়ও ছিল—না হলে একজন অর্হৎ কি ক'রে এক ভাস্করকে তুসিত স্বর্গে পাঠান?—কিন্তু প্রভুর মৃত্যুর তিনশো বছর পরে বৌদ্ধ সংস্কৃতি হঠাৎ উন্নত হয় এবং এই সংস্কৃতি চরিত্রে ছিল মহাযানী। অতএব, মহাযান মতবাদ, তার সজ্জিত মন্দির, মূর্তি এবং গ্রন্থ সংগ্রহ কণিষ্কের অধীনে নিয়মাবদ্ধরূপ পায়, এ ধর্ম হীনযানের মত ভারত থেকে বা ফা-হিয়েনের ভাষায় মধ্যদেশ থেকে আসে। মগধ-

কোশল ও বৈশালী বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ ভাবধারায় সম্পূর্ণ ও সসম্মানে পরিচিত করার সমান দাবী করতে পারে।

উপরন্তু, এটা স্পষ্ট যে, মগধেই ভাস্কর্যের মহান যুগ তখন অতীত হয়ে গেছে। অশোকের রাজধানী পাটলীপুত্র সম্বন্ধে আমাদের ভ্রমণকারী বলেছেন, শহরের প্রাসাদগুলিতে প্রাচীর আছে, তার পাথরগুলি একত্রে গেঁথেছে দৈত্য। জানলার কারুকার্য ও ভাস্কর্যের তুল্য এখনকার যুগে পাওয়া যায় না। এখনো এগুলি রয়েছে। আমরা যারা মোগল সম্রাটদের মার্বেলের কারুকার্য এবং আধুনিক বারাণসীর বেলেপাথরের খোদাই দেখেছি, তারা এই অশোকের প্রাসাদগুলি দখলে ফা-হিয়েনের মত এর জানালা দৈত্যের তৈরি বলে ভাবতাম না। কিন্তু সত্য হল, এক সন্দেহাতীত সাক্ষী আমাদের মগধে এ জাতীয় কাজের মহত্ব ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিয়েছেন, পঞ্চম শতাব্দীর গোড়া থেকে এ কাজ প্রাচীন বলে খ্যাত ছিল।

ফা-হিয়েনের পথে বড় বাধা ছিল লিখিত পুঁথির অভাব। তিনি আমাদের বলেছেন, সর্বত্র পুঁথির খোঁজ করেছেন, কিন্তু সব জায়গায় দেখেছেন, শাস্ত্র গুরু থেকে শিষ্য পর্যন্ত স্মৃতির মাধ্যমে চলে এসেছে, প্রতি গ্রন্থের নির্দিষ্ট অধ্যাপক আছেন। শেষে বৌদ্ধ দেশে জয়ের বিরাট মন্দিরে তিনি যা চাইছিলেন পেলেন, সেখানে নকল করার জন্য তিন বছর রইলেন। এ বিবরণের বিষয়বস্তু ছাড়াও এতে বহু প্রশ্নের অতি গুরুত্বপূর্ণ সমাধান পাওয়া যায়। আর কিছুতে এ ভাবে সমাধান পাওয়া যেত না। এতে বোঝা যায়, কত শতাব্দী ধরে বৌদ্ধধর্মের পবিত্র মতবাদের জন্য কি ধৈর্য ছিল! এক বিশাল সাহিত্য মনে রাখার মত এমন একটা দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি-সহযোগ থেকে এতদিন স্থায়ী ব্রহ্মচর্যের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা কতটা বোঝা যায়। বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের উদ্দেশে ফা-হিয়েন অনেকবার বলেছেন, "শ্রমণদের শোভনতা, গাম্ভীর্য, ভক্তি অতুলনীয়। তা বর্ণনা করা যায় না।" এর থেকে বোঝা যায়, বৌদ্ধ মঠগুলির বিশ্ব-বিদ্যালয় হওয়ার প্রবণতা ছিল। এতে ঐ বিশ্বাসের সমন্বয়ী প্রবণতা বোঝা যায়, কণিষ্কের যুগে আঠারো রকম মতবাদ সহাবস্থানের সঙ্গে থাকত, বিদ্বেষ ছিল না। এর থেকে সম্পূর্ণ অন্য একটা বিষয়ও বোঝা যায়, কেন প্রাচীন পুরাণগুলির প্রথম লিখিত সংস্করণ সর্বদা প্রাচীন মূল পুঁথির সম্পাদিত সংস্করণ হত। এর থেকে আমরা পালি থেকে সংস্কৃতে পরিবর্তন দেখতে পাই এবং ভারতীয় ইতিহাসের লিখিত দলিল কম থাকার কারণ বোঝা যায়। এগুলি স্পষ্টতঃ মুখস্থ রাখা হত। বস্তুতঃ এ বিষয়ে ফা-হিয়েন অবিরাম আমাদের বলেছেন যে, বৌদ্ধ শ্রমণদের জমি দেওয়ার সময়ে রাজার লোহার পাতে দলিল খোদাই করাতেন। আমরা বুঝতে পারি, এ প্রথা যতদিন ছিল ততদিন এগুলি টিঁকে না থাকায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। নিশ্চয় অপেক্ষাকৃত পরবর্তী যুগে একই উদ্দেশে লিপিকে স্থায়ী করার জন্য পিতল ও তামার ব্যবহার শুরু হয়। খুব অদ্ভুত ব্যাপার হল, তাম্রলিপিতে পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত কোন সমস্যার উল্লেখ নেই। সিংহলেও নয়। শেষোক্ত রাজ্যে আমরা জানি, ফা-হিয়েন আসার অন্ততঃ

বা তিন শতাব্দী আগে লিখে রাখার প্রথা শুরু হয়, এর ফলে মনে হয় তাঁর প্রকার হয়েছিল। তাহ'লে আমরা বুঝতে পারছি যে, মগধ ও কোশল যেমন বৌদ্ধ মতবাদের বিভিন্ন স্তরের উৎস ছিল, বৌদ্ধ প্রতীকের তরঙ্গগুলির মূল ছিল, তেমন মতবাদগুলিতে প্রথম শাস্ত্রগুলির মৌখিক হস্তান্তরের বদলে লিখিত রূপদান শুরু হয়।

সিন্ধুর ওপারে গান্ধার রাজ্যগুলি বা "উত্তরভারত" এবং মূল ভারতের মধ্যে শিক্ষা বিশ্বাসের সব পার্থক্য ফা-হিয়েনের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, যারা গান্ধারের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ অনুকরণজাত ও নিষ্ক্রিয় না ভেবে মৌলিক ও আবেগপূর্ণ বলে ভাবে, তাদের বক্তব্য একেবারে খণ্ডিত হয়েছে।

এই বিষয়ে আমাদের প্রয়োজন বুঝতে পেরেই যেন তীর্থযাত্রী বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন যে, মূল ভারতে পৌঁছে (ছি হোনান বা কোশলের বিজয়-মন্দিরে) তাঁর শেষ সঙ্গী তাও-চিং যখন "দেখলেন যে শানিনের সব নিয়ম এবং গম্ভীর, সুন্দর সন্ন্যাসীদের ব্যবহার অত্যন্ত প্রশংসনীয়, তখন নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলেন যে, চীন রাজ্যের সীমান্তের অধিবাসীরা শাস্ত্রে অপটু ও কর্তব্য পালন করে না ; বললেন যে, এর পর যদি তিনি বুদ্ধ হন, তাহ'লে তাঁর ইচ্ছা যেন সীমান্ত দেশে জন্ম না হয় ; এ কারণে তিনি থেকে যান, ফেরেন নি। ফা-হিয়েনের প্রথম ইচ্ছা ছিল শাস্ত্রগুলি যেন চীন দেশে প্রবেশ করে, তাই তিনি একা ফিরে গেলেন।"

এই "উত্তরভারত" সম্বন্ধে আমরা আরও কিছু তথ্য পেয়েছি। নিঃসন্দেহে বুদ্ধের আগে বৌদ্ধধর্ম ছিল, বুদ্ধের আমলে তার রূপ দেখি বুদ্ধের জ্ঞাতিভাই দেবদত্তের মধ্যে। ফা-হিয়েনের ভ্রমণের সময়ে মূল ভারতের চেয়ে গান্ধার অঞ্চলে এই ধর্ম বেশী প্রচলিত ছিল। এইসব অঞ্চলে জাতক কাহিনী প্রচলিত ছিল, বোধিসত্ত্ব যে একটি ঘুঘু পাখিকে বাঁচাতে নিজের চোখ, মাথা, দেহের মাংস দিয়েছিলেন, এক উপবাসী বাঘিনীর খাদ্য ক'রে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, তার স্মরণে স্তূপ ওখানে ছিল। এই দুটি দেশের একটিতে হীনযান বৌদ্ধধর্ম এবং অন্যটিতে মহাযান বৌদ্ধধর্ম প্রাচীনকালে অল্প-বিস্তর বৌদ্ধ প্রচারের লক্ষ্য ছিল, এদের মধ্যে আমরা তুলনা না ক'রে পারি না। আমরা লক্ষ্য করি যে, উদয়ন নামক জায়গাটি, নাম থেকে মনে হয়, রাজধানী ও রাজত্ব ছিল কুষাণ বংশের, সম্পূর্ণরূপে মহাযানী ছিল, মহাভারতে উত্তরের অন্যতম তীর্থরূপে উজ্জন নামে এর উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ মনে হয়, হিমবন্ত যখন মহাভারতের অনেক জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে পরবর্তী গুপ্তদের যুগে কোন সময়ে, এই প্রত্যক্ষ ও সচেতন ঘটনার আগে জাতক বা বুদ্ধের জন্ম-কাহিনী আরও পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ে। আমাদের ভ্রমণকারী আমাদের জন্য যে হাজার খানেক সূত্র রেখে গেছেন, তা অনুসরণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে যেন তাঁর নিজের দু-একটা ছবি যা রয়েছে, তাকে ভুলে না যাই। যারা এ রচনা পড়েছে, তারা প্রাচীন রাজগীরে যেখানে বুদ্ধ ধ্যান করতেন, সেই গৃধ্রকূট পাহাড়ের গুহায় তাঁর ভ্রমণের কথা ভুলতে পারবে না :

"ফা-হিয়েন নতুন শহরে গন্ধদ্রব্য, ফুল এবং তেলের প্রদীপ কিনে খি-চে পর্বত গুহায় যাওয়ার জন্য দুজন বয়স্ক ভিক্ষুকে সংগ্রহ করলেন। গন্ধদ্রব্য ও ফুল উৎসর্গি হওয়ার পরে প্রদীপের আলো উজ্জ্বলতা বাড়িয়ে তুলল। বিষাদ ও আবেগে তাঁ চোখে জল এল। তিনি বললেন, আগে এই জায়গাতেই বুদ্ধ ছিলেন। এখানে তি শিউ-লেং-ইয়ান শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফা-হিয়েন বুদ্ধকে জীবিত অবস্থায় দেখতে নি, কিন্তু তাঁর ভ্রমণের চিহ্ন দেখেছিলেন। তবু গুহার সামনে শিউ-লেং-ইয়ান আবৃত্তি করা এবং একরাত সেখানে থাকতে পেরেছিলেন।"

কিন্তু ফা-হিয়েন উৎসাহী ছিলেন, ধর্ম ও দেশের জন্য চরম কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তু ছিলেন, এটাই তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়। সেই গম্ভীর, বিনীত প্রকৃতির একটি দিক দেশের চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ত। চীনের দক্ষিণে প্রায় পৌঁছে তিনি বলেছেন "আবার তাহ-গানকে দেখার তাঁর আকুল আগ্রহ, কিন্তু তাঁর মনে গুরুভার চে থাকায় তিনি দক্ষিণে যাত্রাবিরতি ঘটান, ওখানে পণ্ডিতরা পবিত্র গ্রন্থ ও শাস্ত্র প্রকাশ করেন।" দেশে ফেরার পথে সামান্য দেরীর তিনি এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কি চীনের মাটিতে পৌঁছে যদি তাঁর মনের ভাব এই হয়, তাহ'লে বিদেশে থাকা তাঁর কি ইচ্ছা হত? সিংহলে সম্ভবতঃ অনুরাধাপুরমে বুদ্ধের নীল পাথরের মূর্তির সাম বসে তিনি আমাদের বলেছেন:

"ফা-হিয়েন হান দেশ ত্যাগ করার পর অনেক বছর চলে গেছে। যে লোকদের সঙ্গে তিনি মিশেছেন তারা ছিল বিদেশের লোক। পর্বত, নদী, বৃক্ষ, লত যা কিছু চোখে পড়েছে সব তাঁর অচেনা। উপরন্তু, যারা তাঁর সঙ্গে যাত্রার শুরু ছিল, তারা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। অনেকে পেছনে পড়ে আছে, অনেকে মার গেছে। অতীতের কথা মনে পড়ে তাঁর মন চিন্তাপূর্ণ, উদাসীন। হঠাৎ এই মূর্তির পাশে বসে থাকতে থাকতে তিনি দেখলেন এক ব্যবসায়ী চীনদে সাদাসুতোয় তৈরী পাখা মূর্তিকে অর্ঘ্য দিচ্ছে। আর কেউ না বুঝলেও এ ঘটনা তাঁ মনে এমন প্রবল আবেগ জাগিয়ে তুলল যে, জলে তাঁর চোখ ভরে গেল।"

ফা-হিয়েনের ভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত তিনি যে পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে উপস্থি করেছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁদের প্রদত্ত সহজ, সুন্দর বাক্যটি আমরা ভুলতে পারি না কিভাবে ফা-হিয়েনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হল, কথা হল, তাঁরা তাঁকে প্রশ্ন করলে তাঁর কথায় তাঁদের বিশ্বাস জেগে উঠল, তাঁর আবৃত্তিতে ছিল সরল বিশ্বাসের প্রত্যয়,— এসব বর্ণনা করার পর চীন বিশ্ববিদ্যালয়ের লিপিকার বা রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতির সচিব (ফা-হিয়েন এঁদের 'পণ্ডিত' বলেছেন) শেষে বলছেন।

"তাঁরা এসব শুনে অভিভূত হলেন। এমন একজন লোককে দেখে তাঁরা অভিভূ হলেন: নিজেদের মধ্যে তাঁরা দেখলেন, খুব অল্প লোকই ধর্মের জন্য দেশত্যাগ করেছেন, কিন্তু ফা-হিয়েনের মত কেউ কখনো শাস্ত্রের সন্ধানে নিজের কথা ভুলে যান নি। সত্য থেকে যে বিশ্বাসের উদ্ভব হয়, তা জানা দরকার, না হলে যে উৎসা

থেকে আন্তরিকতার জন্ম, তা দেখা দেয় না। গুণ ও কর্মশীলতা না থাকলে কিছুই পাওয়া যায় না। কাজ করার ক্ষমতা, গুণ এবং তৎপরতা থাকলে কি ক'রে সে বিস্মৃত হবে? যা প্রশংসিত তাকে বিস্মৃত হবে—যা বিস্মৃত তাকে মূল্য দেবে!"

এলিফ্যাণ্টা, হিন্দুধর্মের সমন্বয়

ভারতের ইতিহাসের এক বিরাট মুহূর্তে জীবন্ত পাথর কেটে এলিফ্যাণ্টার গুহাগুলি তৈরি হয়েছে। এ হল যুগযুগব্যাপী সমন্বয়ের মুহূর্ত; এ প্রতিশ্রুতির মুহূর্ত পূর্ণ হতে লক্ষ লক্ষ বছর লাগবে। যে ভাবধারাকে আমরা হিন্দুধর্ম বলি, তা তখন সবেমাত্র তাত্ত্বিক পরিণতিতে পৌঁছেছে। তখনও পুনর্পৃথকীকরণের কাজ শুরু হয় নি। এলিফ্যাণ্টার গুহাগুলি সম্ভবতঃ তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক মুহূর্তকে চিহ্নিত করেছে। সব ধর্মীয় সম্প্রদায়ে মতবিভেদ নির্ধারিত হয় ইতিহাস ও ভূগোলের চেয়ে বেশী বিরোধী ধারণার দ্বারা। তাহ'লে এলিফ্যাণ্টার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উপাদানগুলির উৎস কোথায় ছিল?

গুহাগুলি প্রার্থনা-স্থলরূপে নির্মিত হয়েছিল। বাহ্যতঃ এটুকু বোঝা যায়। আশেপাশের অঞ্চলে প্রাসাদ, দুর্গ, রাজধানীর চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়া সম্ভব। কয়েক মাইল দূরে আর একটি দ্বীপে রয়েছে কানহেরি মঠ, তার চৈত্যকক্ষ এবং একশো-আটজন সন্ন্যাসীর ঘর, প্রতি দুটো ঘরের নিজস্ব জলসরবরাহ-ব্যবস্থা ছিল; পাহাড়ের ওপরে রয়েছে স্নানের পুষ্করিণী, রয়েছে ভোজনকক্ষ। কানহেরি ছিল বিশ্ব-বিদ্যালয়; এলিফ্যাণ্টা ছিল প্রার্থনাস্থল এবং দুটিই ছিল কোন রাজার অধীন।

বিশাল কক্ষের সমস্ত পিছনের দেওয়াল জুড়ে তিন সারিতে যে বিরাট অলঙ্করণ, স্তম্ভের মধ্য দিয়ে সে দিকে যাওয়ার পথ কি চমৎকার! এই কেন্দ্রীয় কক্ষে আমরা ঢোকার সময়ে বারান্দার ডানদিকের ও বাঁদিকের খোদাইগুলি কি অপূর্ব! বাঁদিকে প্রায়াঙ্গ গভীর ক'রে খোদাই করা শিবের ধ্যানরত মূর্তির এক ছবি রয়েছে। ভঙ্গীটি বুদ্ধের মত এবং দুয়ের পার্থক্য বুঝতে হলে কয়েক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখা দরকার। অবশ্য ব্যাঘ্রচর্ম, সাপ ও জটা বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। বস্তুতঃ ভুল বোঝার কোন কারণ নেই। আমাদের ডানদিকে রয়েছে অগভীর ক'রে খোদাই করা দুর্গার মূর্তি, নিজের পরমা মূর্তি বশে প্রকাশ করছেন। তাঁর পেছনে সমগ্র শূন্যদেশ সাধক ও দেবদূতদের স্তবসঙ্গীতে পূর্ণ। সবটা যেন চণ্ডীর একটি মন্ত্রের ছবি। এ ছবি দেখতে ও স্তব শুনতে গিয়ে বিস্ময়ে আমাদের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ, এখানে শিল্পরীতির যে উদারতা ও মধ্যযুগীয় খ্রীস্টধর্মের মত বাণী শোনা যায়। তার তুলনা শিল্পে নেই। শিল্পী এখানে নিজেকে গ্রীকশিল্পীর মত নিশ্চিত ক'রে প্রকাশ করেছেন। একমাত্র পার্থক্য রয়েছে ভাষায়। ঐ সব ইউরোপীয় পরিভাষার অনুবাদের জন্য আমাদের জিয়োত্তো ও ফ্রা-এঞ্জেলিকো এবং আদি-শিল্পীদের খুঁজে বার করা দরকার।

ছায়া ভেদ ক'রে যেতে যেতে আমাদের বিস্ময় এখনো অব্যাহত, আমরা পাথরের

ধূসর স্তম্ভগুলোর মধ্য দিয়ে পথ ক'রে চলেছি যেখান থেকে বেদীর পেছনের অলঙ্করণে বিরাট কেন্দ্রীয় ত্রিমূর্তি সবচেয়ে ভাল দেখা যায়। কি কোমল, কি কমনীয়রূপে এই মূর্তি অন্ধকার থেকে ফুটে ওঠে! ছায়ার সঙ্গে ছায়া গাঁথা, গাঢ় অন্ধকারের পটভূমিতে ধূসর রূপালী রঙের এই মূর্তি বস্তুতঃ মানবজীবনে ঈশ্বরের স্বয়ংপ্রকাশ। এর ডান-দিকে মূর্তিযুক্ত প্যানেলে শৈব ভাবধারা অনুযায়ী বিশ্বের ছবি রয়েছে। বৃষের পিঠে বসে আছেন শিব ও পার্বতী—বারান্দায় দুর্গার মূর্তির মত—এখানেও পিছনের আকাশে সমবেত সঙ্গীত। ত্রিমূর্তির বাঁ-দিকে রয়েছে বৈষ্ণব জগতের ছবি। রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর সঙ্গে রয়েছে ঐশ্বরিক রূপাস্বরূপ লক্ষ্মী এবং সারা জগৎ বিষ্ণুকে যেন ঈশ্বর বলে অভিবাদন করছে। ত্রিমূর্তিতে রয়েছে একটি বিরাট মূর্তিতে ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর একত্র মূর্তি—এই প্যানেলগুলির মাঝে কেন্দ্রীয় স্থানটিতে রয়েছে ত্রিমূর্তি।

এই ছবিগুলির নীচে পূজার অর্ঘ রাখার জন্য একটি তাক চলে গেছে। যে বেদীতে প্রকৃত পূজা হত, সেটি দেখা যায় দর্শকের ডানদিকে একটি ছোট্ট চাঁদোয়ার মত শিবমন্দিরের আকারে, এখন গুহার বাইরে যে চারমাথা মহাদেবের মূর্তি দেখা যায়, তা নিশ্চয় একসময়ে এখানেও ছিল এবং এখন ওখানে শিবের একটি সাধারণ মূর্তি দেখা যায়, সেটা পরবর্তী কোন তারিখে বসানো হয়। আমরা ভাবতে পারি যে, এখানে যে সব প্রদীপ ও অর্ঘ দেওয়া হত, তা পরে মিছিল ক'রে নিয়ে গিয়ে বিরাট অলঙ্করণের বিভিন্ন সারির সামনে রাখা হত। স্তম্ভযুক্ত কক্ষে প্রার্থনাসভা বসত, খ্রীস্টান গীর্জার প্রার্থনাগৃহ বা দক্ষিণেশ্বরের মত আধুনিক মন্দিরের প্রাঙ্গণের মত এটি ব্যবহৃত হত।

এ গেল প্রধান গুহার কথা। স্থাপত্যে স্তম্ভের পরিকল্পনা রূপায়িত হয়েছে এবং পুষ্করিণীর চারদিকে প্রাঙ্গণ ঘিরে নির্মিত কক্ষযুক্ত বিরাট কেন্দ্রীয় কক্ষের দক্ষিণ ও বাম অংশ রয়েছে। এখানে অল্প কয়েক ধাপ সিঁড়ি ও ছাদের ভারবাহী জীবজন্তুর খোদিত মূর্তি ও অন্যান্য অলঙ্করণ এক মহান শিল্পযুগের পরিচায়ক এবং এক অপূর্ব ও সূক্ষ্ম জীবনবোধের প্রমাণ দেয়।

অতএব, এলিফ্যান্টা হিন্দুধর্মের সমন্বয়কে অব্যাহত রেখেছে। যে হৃদয় ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও উপাসনা সত্ত্বেও সমগ্রকে বাদ দিয়ে জনসাধারণের আংশিক বিশ্বাসকে রূপায়িত করতে পারত না, সে হৃদয় কত অভিজাত ছিল। শুধু শৈব নয়, শৈব, বৈষ্ণব এবং এখনো প্রচলিত ব্রহ্মার উপাসক আর্য প্রার্থনায় যোগ দেয়। বোঝা যায়, সকলকে স্থান দিতে হবে। যখন প্রাচীনতর কান্‌হেরির কথা ভাবি, তখন বুঝি যে, শুধু প্রার্থনাগৃহ নয়, সব প্রার্থনাগৃহের বাইরে মঠগুলি; সমাজ, পদমর্যাদা নির্বিশেষে অতিসামাজিক প্রতিষ্ঠান, সমাজের বৈশিষ্ট্য, সকলের এখানে স্থান ছিল। বোম্বাই উপসাগরের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষের মধ্যে আমরা একটি বিশেষ যুগের ভারতীয় ভাবধারাও বিশ্বাসের নিখুঁত অনুচিত্র পাই। শুধু একটি সমস্যা দেখা দেয়, এটা কোন্ যুগ।

হিন্দুত্বের এই সমন্বয়ে প্রথম লক্ষণীয় বস্তু হ'ল, ব্রহ্মার উপস্থিতি। অনুরূপভাবে, মহাভারতে আমরা অনবরত ব্রহ্মার উল্লেখে বিস্মিত হই। সেখানে তাঁকে বলা হয়েছে পিতামহ, স্রষ্টা, কখনো নিয়ামক, সবদিকে তাঁর মুখ। এই শেষ বিশেষণটি বোধ হয় প্রাচীন কোন হেঁয়ালি থেকে উদ্ভূত, রোমকরা এর থেকে পেয়েছিল জ্যানাস বা আমাদের জানুয়ারি। এর প্রকাশ দেখা যায় হিন্দুদের চতুর্মুখ মূর্তিতে এবং রামায়ণে উল্লেখিত ব্রহ্মশির নামক চারমুখের অস্ত্রে। মহাভারতে অবশ্য অবিরাম ব্রহ্মার উল্লেখ থাকলেও কোথাও ব্রহ্মার কোন নতুন কাজের কথা উল্লেখ করা হয় নি। তাঁকে ঈশ্বরের ক্রমবর্ধমান চেতনা বলে মনে হয় না। বরং তাঁকে যেন বাস্তব থেকে দূরে মনে হয়, সর্বদা তাঁর কথা মনে করিয়ে দিতে হয়। তেমন, কৃষ্ণের পৌরাণিক কাহিনীগুলিতে দেখি শিবের কাছে সবাই যেমন প্রার্থনা বা তপস্যা নিয়ে যায়, ব্রহ্মার কাছে সেরকম কেউ যায় না। তিনি মানবজীবনের গতিশীল উপাদান নন। অথচ সন্দেহাতীতভাবে তিনি স্রষ্টা এবং কৃষ্ণের ওপরে ঈশ্বরত্বের পরীক্ষা প্রয়োগের অধিকার তাঁর কাছে। তরুণ বীর বিষ্ণুর অবতার কি না, তা তাঁর জানা দরকার।

স্রষ্টা এই অদ্ভুত গল্পে যে তিক্ত রসিকতা করেছেন তার অনেক ইতিহাস আছে। প্রথমতঃ, হিন্দুর বেদোত্তর দেবতাদের মধ্যে প্রধান ও প্রবীণতম হলেন ব্রহ্মা। তাঁর মর্যাদায় কোন প্রমাণের দরকার হয় না। সবাই তা স্বীকার ক'রে নিয়েছে। পুরাণে ব্রহ্মার নিজেরও বোঝার দরকার হয় না যে, বিষ্ণু তাঁর সমকক্ষ। বিষ্ণুর অবতাররূপে কৃষ্ণ তাঁর কাছে নতুন, কিন্তু বিষ্ণুকে তিনি স্বীকার করেছেন। সেই সঙ্গে তর্কাতীতভাবে শ্রেষ্ঠ হয়েও ব্রহ্মা কোনমতেই আধ্যাত্মিক সত্য নন। অন্যান্য কাহিনী এবং সমগ্র মহাভারত থেকে দেখা যায়, সে স্থান পূর্ণ করেছেন শিব, এখন যে সব দার্শনিক ভাবধারাকে বৈদান্তিক বলা হয় তার সঙ্গে তিনি জড়িত। কিন্তু কৃষ্ণের কাহিনী যদি বিংশ শতাব্দীতে লেখা হত, তাহ'লে তাতে ব্রহ্মার কোন স্থানই থাকত না। তখন তিনি প্রায় বিস্মৃত ছিলেন, এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছেন। তাহ'লে এই প্রমাণ থেকে বলতে পারি যে, পরমেশ্বরের ধারণারূপে প্রথমে ব্রহ্মা, পরে শিব দেখা দেন।

অতএব, হিন্দুধর্মে একটা যুগ ছিল, যখন স্রষ্টারূপে ব্রহ্মার নাম শ্রদ্ধেয় ছিল—পূর্ববর্তী যুগের ধর্মতত্ত্বে তাঁর প্রাধান্য ছিল এবং শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে এ নাম একত্রে উচ্চারিত হত—এর থেকে দেবতাসংক্রান্ত ধারণা সম্পূর্ণ হয়। তখন হিন্দুধর্ম ইচ্ছাকৃতভাবে ঈশ্বরকে তিনটি রূপের ঐক্যবদ্ধ প্রকাশ বলে প্রচার করত এই ধর্মীয় ভাবধারার পরিপূর্ণ প্রকাশ দেখি এলিফ্যান্টা গুহায় এবং সম্ভবতঃ সামান্য পরে বাল্মীকির রামায়ণে।

মনে হয়, কবি কালিদাস ও কুমারসম্ভব ও রঘুবংশ লেখার সময়ে হিন্দুধর্মের এই ত্রিরূপী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। যে শক্তি হিন্দুধর্মের দুটি জনপ্রিয় দিককে বাস্তবায়িত করে, এই ধর্মের সমন্বয়কে প্রকাশ করার ইচ্ছায় এলিফ্যান্টা খোদাই করেছিল, কালিদাসও তার অংশীদার ছিলেন।

কিন্তু এলিফ্যান্টায় বিষ্ণু যে রূপে দেখা দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণ ধর্মীয়। এ হল লক্ষ্মীনারায়ণ রূপ, এ ভাবধারা এখন বাংলাদেশের চেয়ে ভারতের পশ্চিমে ও দক্ষিণে বেশী পরিচিত। এই ধর্মীয় ধারণা বা যাকে বলা হয় ঐশ্বরিক অবতার—তা রামায়ণ লেখার আগেই সম্পূর্ণ গঠিত হয়েছিল এবং মহাভারতের চেয়ে রামায়ণে এর উল্লেখ অনেক বেশীবার আছে, অবশ্য এরও উদ্দেশ্য ছিল, বিশেষ এক বীরের সঙ্গে বিষ্ণুর ঐক্য দেখানো। প্রথম থেকে বলা হয় সীতারাম মানবদেহে লক্ষ্মীনারায়ণ। মনে হয়, পরবর্তী মহাকাব্যে কৃষ্ণ ছিলেন অবতাররূপে ঈশ্বরের করুণাপ্রচারের সচেতন দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

ভারতে যে সব ভাবধারা স্থায়ী হয়, তা সর্বদা জাতীয় অতীতের ভিত্তিতে দৃঢ়ভাবে গড়ে ওঠে। সেইজন্য আজ মাতৃভূমির যে আদর্শ বুদ্ধির ক্ষেত্রে ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে, তার মূলে ফিরতে হলে যেতে হবে পরমেশ্বরের সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ উমার কাহিনীতে। তেমন, কোন ভারতীয় পণ্ডিত যদি বৈদিক সাহিত্যে এই শিব ও বিষ্ণুর ধারণার মূল বার করেন, তা খুব আকর্ষণীয় হবে। এর থেকে এই সিদ্ধান্ত হবেই যে, প্রত্যেকে নিজের ক্ষেত্রে নিজস্বতায় মণ্ডিত। তবে এও মনে হবে যে, উভয়ে ঈশ্বরের যে দিক্‌গুলি প্রকাশ করে, তা বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের দ্বারা লোকের কল্পনায় স্থান পেয়েছিল।

এরকম তত্ত্ব কি হিন্দু মনের পক্ষে আঘাতকারী? যদি এর দ্বারা সব তথ্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে ক্ষতি কি? যদি দেখা যায় হিন্দুধর্ম কোন জীর্ণ অতীতের বদ্ধ, নিশ্চল, গোঁড়ামিতে আবদ্ধ নয়; বরং তার বদলে সে নবীন, নমনীয়, সৃজনশীল, প্রাণ ও শক্তিতে স্পন্দিত। ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন, তার ভুলগুলি অপরিণত অবস্থার প্রকাশমাত্র, তা কি নেহাত অসম্ভব?

তা যদি হয়, তাহ'লে ৫০০ খ্রীঃ পূঃ থেকে ৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত যে জাতি অত্যন্ত আধুনিক ও জীবন্ত ছিল, মূল ধর্ম ছিল তার প্রকাশ। ভারতীয় সভ্যতা প্রথম থেকে তার সন্তানদের ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার শিক্ষা দিয়েছে। ভাবধারাগুলি খ্রীষ্ট যুগের ঠিক আগে ও পরে বেড়ে উঠে পরপর বিস্ময়কর দ্রুততায় নতুন রূপ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে বুদ্ধের জীবন ও চরিত্রই যে প্রধান গঠনকারী প্রেরণা ছিল, এ ধারণা না হয়ে যায় না। একদিকে কঠোর সন্ন্যাস, অন্যদিকে মানুষের মাঝে অনন্ত করুণার প্রকাশ,—মহাপ্রভু ছিলেন এই দুয়ের মিলন। জগতে তাঁর চরিত্র প্রমাণ দেয় যে, ঈশ্বর সেই পরমের নামরূপ মাত্র হলেও একদিকে তিনি সন্তানের পালক, অন্যদিকে তাদের অজ্ঞানের ধ্বংসকর্তা। তাই দেখি, মানুষ শিবের কল্পনায় এর একটিকে রূপায়িত করার চেষ্টা করছে, আর নারায়ণ অন্যটির ব্যক্তিরূপ।

ঠিক যেমন বুদ্ধরূপী মূল উৎস থেকে জনপ্রিয় ধর্মগুলি উদ্ভূত হয়েছে, ঠিক তেমন হয়ত বারাণসী থেকে প্রথম শিবের ভাবধারা জন্ম নিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। হয়ত এর অনেক কারণ ছিল। সাত মাইল দূরে মৃগয়ায় নিশ্চয় বুদ্ধের আগে মঠ-বিশ্ববিদ্যালয়

ছিল। এ জায়গায় সন্দেহাতীত খ্যাতি বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে যে, বুদ্ধত্ব লাভের পরেই বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন, কারণ এখান থেকে তিনি তাঁর তত্ত্ব বা আবিষ্কার জগৎকে জানাতে চেয়েছিলেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে, বারাণসী থেকে এটা একটু দূরে হলেও বারাণসীতে নিশ্চয় সর্বদা সন্ন্যাসী প্রধানো ছিলেন, সেই বিশেষ যুগে বারাণসী প্রধানতঃ বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্র ছিল এবং এখানে বৈদিক যুগের বিপুল ব্রাহ্মণ্য সম্পদ ছিল।

বুদ্ধের দেহত্যাগের পরে তখনও তাঁর নাম সারা দেশে ধ্বনিত হচ্ছে, তখন নিশ্চয় তাঁর স্মৃতিতে এবং বৈদিক পূজাবিধিতে পবিত্র বারাণসী তীর্থস্থান হয়ে উঠেছিল। দেবতা বলিতে আনন্দ পান না, এই মতবাদ ছড়িয়ে পড়ায় নিশ্চয় বলি বন্ধ হয়েছিল, বারাণসীর ব্রাহ্মণরা যে ধর্মীয় মতবাদ প্রচার করতেন, তাতে ঈশ্বরকে বলা হত, সুদূর, নিঃসঙ্গ ও ধ্যানরত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছের ধর্মীয় দর্শনে আগ্রহ প্রকাশের নিশ্চিত অধিকার সব শ্রেণীর ছিল, সকলকে অবাধে বৈদান্তিক তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা শেখানো হত, তারা এ দেশ থেকে সুদূর স্বদেশে তা বহন ক'রে নিয়ে যেত।

এদিকে আমরা ধরে নিতে পারি যে, বৌদ্ধস্মৃতিজড়িত অন্যান্য স্থানের মত এই পবিত্র শহরেও ধার্মিক তীর্থযাত্রীরা স্মারকস্তূপ স্থাপন ক'রে চলেছিল। ধীরে ধীরে স্তূপগুলির আকার পরিবর্তিত হচ্ছিল। প্রথমে সাধারণ, নিরলঙ্কার স্তূপগুলির উত্তর দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে চারটি বুদ্ধ দেখা দিলেন। স্বাভাবিক নিয়মে তখন কিছু স্তূপ চারটি উপবিষ্ট মূর্তির বদলে চারটি বড় মাথা তৈরি হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের মতে আর্যাদের ঈশ্বর ছিলেন ব্রহ্মের ব্যক্তিরূপ ব্রহ্মা। আবার সে যুগের পৃথিবীর চিন্তাধারা অনুযায়ী ঈশ্বর বা ব্রহ্মা হলেন "রক্ষক, সর্বত্র তাঁর মুখ"। তাই সম্ভবতঃ প্রথমে চারমাথাযুক্ত স্তূপকে ব্রহ্মার মূর্তি বলে মনে করা হত। কিন্তু বেশিদিন তা রইল না। ঈশ্বরের নতুন ধারণা দেখা দিচ্ছিল এবং এখন মাঝে স্তম্ভযুক্ত হয়ে তাকে মহাদেব মনে করা হত, পরে শিব। এই সময় থেকে শিবকে "পঞ্চানন" বলে প্রমাণ জানানো শুরু হয়।

এ যুগে যথেষ্ট দ্বিধা ছিল। যে বিহার শরীফ ও রাজগীরের মধ্যে বড়গাঁওএর স্নানের ঘাট দেখেছে, সে বুঝতে পারবে, কত বিচিত্রভাবে শিবের প্রতীক দেখা দিয়েছে। যেমন, চারমাথাযুক্ত স্তূপ মাঝে মাঝে পার্বতীর উদ্দেশে তৈরি হয়েছে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত,—মহেশ্বর-সংক্রান্ত ধর্মীয় ভাবধারা সম্পূর্ণ হওয়ার পর পরিবর্তিত স্তূপকে শিব ব'লে মনে করা হত। রাজপুতরা যখন রাজপুতানায় বসবাস করতে শুরু করে, তখন নিশ্চয় এই বিশেষ পরিবর্তন ঘটেছিল, তাই ঐ অঞ্চলে চতুর্মুখ শিবের এত আধিক্য। শোনা যায়, উদয়পুর রাজবংশের কুলদেবতা হলেন চতুর্মুখ মহাদেব। আবার বারাণসীতে আরও এরকম থাকতে পারে, তবে কেদারনাথের মঠের পিছনে তামিল পল্লীতে একটি মন্দির আছে, সেখানে আলোচ্য যুগের এক

শিবমূর্তি আজও পূজিত হয়। প্রথম তৈরির সময়ে মন্দিরটি নিশ্চয় রাস্তার সমতলে ছিল। অবশ্য মাঝখানে ধ্বংসস্তূপ জমে ওঠায় এখন এটি আট বা দশ ধাপ নীচে রয়েছে। শুধু এই তথ্য থেকে মন্দিরটির বয়স সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়।

যে সময়ের কথা আমরা বলছি, তখন থেকে মহাদেবের মূর্তি বহু সরলীকৃত স্তরের মধ্য দিয়ে এসেছে, কিন্তু বারাণসীর এই শিব এবং এলিফ্যান্টার শিব এক ঐতিহাসিক যুগে নির্মিত, গুহার বাইরে ছোট চারমাথাযুক্ত স্তূপ এর অন্যতম মূল্যবান স্মারক।

হিন্দুধর্ম ভারতের ভূগোল ও ইতিহাসে স্পন্দিত। ভারতকে আপন ঐক্য অনুভব করার জন্য রেল ব্যবস্থার অপেক্ষায় থাকতে হয়েছিল। এ ধারণা ভুল। শিবের প্রতি মূর্তিতে প্রাক্‌গুপ্তযুগের বারাণসীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। কৃষ্ণ-সংক্রান্ত যে জটিল কল্পনায় বৃন্দাবনের দেবশিশু, গীতার নায়ক এবং দ্বারকার নির্মাতা মিলিত হয়েছেন, তাতে পাই পাটলীপুত্রের রাজবংশের ছবি। রামায়ণে কোশলের যুগ কল্পনা উন্মোচিত হয়। এখানে পশ্চিম প্রান্তে এলিফ্যান্টায় আমরা যে মহান সমস্বরের সম্মুখীন হই, তা গড়ে উঠেছিল শিব-উদ্ভবের এবং রামায়ণ রচনার সামান্য আগে। কোন্‌খান থেকে এলিফ্যান্টা তার লক্ষ্মী-নারায়ণকে পেয়েছিল? বারাণসীতে কল্পিত দৃশ্য যদি এখানে একহাজার মাইল দূরে রূপ পেয়ে থাকে, অথবা এখানে ক্ষোদিত বিষ্ণুমূর্তির কথা দু-এক দশক পরে কোশলের অযোধ্যায় গীত হয়ে থাকে, তাহ'লে দেশের ঐক্য কত দৃঢ় ছিল!

যেদিকে যাই, প্রাক্‌-মধ্যযুগীয় ভারতের অপূর্ব, সকল ঐক্যের এক দৃশ্য দেখতে পাই। যে নারায়ণ চিরকাল মাদ্রাজে পূজিত হচ্ছেন, পঞ্চম শতাব্দীতে তাঁর মূর্তি বিহারে তৈরি হয়েছে। এ ধরনের স্থাপত্য ভুবনেশ্বর থেকে চিতোর পর্যন্ত এক যুগের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক শিশু সাতটি পবিত্র নদীর নাম জানে। ভারতের প্রত্যেক প্রদেশ থেকে শত শত শতাব্দী ধরে মানুষ হিমালয়ে, দ্বারকায়, কন্যাকুমারিকায়, পুরীতে তীর্থভ্রমণে গেছে।

ভারতীয় গবেষণার কয়েক সমস্যা

ভারতীয় জনগণের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল, নিজেদের ইতিহাস নতুন ক'রে লেখা। আধুনিক শিক্ষার অলিখিত নিয়মানুযায়ী এ কাজ একজন করলে হবে না, অনেকে মিলে করতে হবে; অর্থাৎ ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজকে করতে হবে। এ সত্য অদ্ভুত, অথচ অপরিবর্তনীয় যে, একজন কোন্‌খান থেকে এসেছে না জানলে তার নিজেকে জানা হয় না। যাকে আমরা ভারত বলি, তার ভৌগোলিক ঐক্য এবং বিশাল বিস্তারের সীমা জানাই যথেষ্ট নয়; কি ক'রে এর উদ্ভব হল, তাও বুঝতে হবে।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা এখন একটি মূল্যবান বই পেয়েছি—ভিনসেন্ট স্মিথের লেখা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস—এ বই সম্বন্ধে মোটামুটি বলা যায় যে, গত

শতাব্দীতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি যে কাজ করেছে, এতে তার প্রধান ফলগুলি রয়েছে। এ বইয়ের দোষগুলি অনেক এবং সুস্পষ্ট, তবু তুলনামূলকভাবে তার গুরুত্ব কম, কারণ, ভারতীয় ব্যতীত অন্য কারুর লেখা ভারতের নিখুঁত ইতিহাসকে আগামী দিনের জাতি ভুল ব'লে মনে করবে। ইতিমধ্যে, ইউরোপীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলকে সংক্ষিপ্ত আকারে ভারতীয় কর্মীর কাছে এমন সহজে ব্যবহারযোগ্য সারমর্মরূপে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, এ কাজ বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছাড়া সম্ভব হত না, কিন্তু ভারতীয়ের পক্ষে তা এখন সম্ভব নয়। ভিনসেন্ট স্মিথের বইয়ের পরিধি ও বিষয়বস্তু বিবেচনা করলে এ বই আমাদের অনেকের অত্যন্ত বস্তুতান্ত্রিক মনে হতে পারে। তবু, এর মাধ্যমে নতুন প্রজাতির পণ্ডিতদের কাছে আত্মার আলো এসে পৌঁছেছে। এখানে ইতিহাসের অগণ্য বিস্মৃত পাতা উন্মোচিত হয়েছে। যদিও মনে হয় না যে লেখক যে ইতিহাসের কথা লিখছেন, সে ইতিহাসের নির্মাতা জাতিকে তিনি এখনও জীবিত বলে মনে করেন না, তবু, এই যে মানুষরা প্রাচীন সেই সুপ্ত শক্তি অন্তরে নিয়ে ভারতীয় শহরগুলোর পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা কি এরকম স্বীকৃতি পাবে, ভাবতে পেরেছিল? ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই ঘোষণাকে ভারত নিজের কর্মে সত্য প্রমাণ করবে।

এখানে প্রাচীন ভারতের যত কাহিনী বলা হয়েছে, তার মধ্যে নিশ্চয় মগধের গুপ্তবংশ এবং পাটলীপুত্রের প্রাচীন রাজধানী থেকে তারা সারা ভারতে যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার কাহিনী নিঃসন্দেহে সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক। ভারতীয় পাঠকদের মনে হবে, এই বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রীয় বিষয় হল, বিক্রমাদিত্যের পরিচয় জানা, এখন ঐ বীরের নামের সঙ্গে যুক্ত উপাধির আধুনিক পরিচিত অর্থে তাঁকে "উজ্জয়িনী"র রাজা মনে হয়। তাহলে উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য পাটলীপুত্রের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ব্যতীত কেউ নন, ইনি ৩৭৫ থেকে ৪১৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন।

তাই যদি হয়, তাহ'লে আধুনিক ভারতের উন্নতির ইতিহাসে ৪০০ খ্রীস্টাব্দকে বিভাজক রেখা বলে মনে করতে পারি। তখন পৌরাণিক যুগ কতটা উন্নত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বৌদ্ধধর্ম তখনও কতটা এবং কোন্ আকারে বেঁচেছিল; সে যুগের হিন্দুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী কি ছিল, জানবার দুর্দমনীয় ইচ্ছা হয়; এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল, ভারতের ভারতীয় ভাবধারাকে গড়ে তুলেছিল কোন্ বড় শহর এর সঙ্গে আর কি কি সহযোগিতা জড়িত ছিল? শেষ প্রশ্নের উত্তর যদি জানা যায়, তাহ'লে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা যে সব রাজত্ব সম্বন্ধে আমাদের এত বেশী কৌতূহলী ক'রে তুলেছে, সেগুলির সব তথ্যের চেয়েও এর তাৎপর্য বেশী হবে।

এখনই ঐতিহাসিকদের প্রচলিত ধারণা যে, হিন্দুধর্ম, সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিত্য গুপ্তদের সময়ে এক বিরাট পুনরুজ্জীবন লাভ করেছিল। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে,

অধিকাংশ পুরাণ এই যুগে আবার সম্পাদিত হয়ে বর্তমান আকার গ্রহণ করে। বর্তমানে এ ধরনের বিবৃতি কিছুটা অস্পষ্ট, কিন্তু আমাদের যেটুকু ভিত্তি গড়ে উঠেছে, তাকে গ্রহণ করলে আমার মনে হয়, যে হিন্দু সংস্কৃতির বিবর্তনের ইতিহাস এতদিন জানা সম্ভব বলে ভাবা যায় নি, তাতে নির্দিষ্ট, সঠিক ধারণা আনা সম্ভব বলে প্রমাণিত হবে। অল্পদিনের মধ্যে আমরা হিন্দু দর্শনে পরপর ভাবধারাগুলির প্রবর্তন ও সেগুলির যুগ সম্বন্ধে ধাপে ধাপে জানতে পারব, তখন পৌরাণিক যুগের নির্মাতাদের পরিবেশ আবার গড়ে তুলতে পারব।

ভিনসেন্ট স্মিথের ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই গুপ্তযুগের শিক্ষার মহান্ প্রথার সূচনা হয় বিক্রমাদিত্যের পিতা প্রতিভাবান, গুণান্বিত সমুদ্রগুপ্ত (৩২৬ খ্রীঃ—৩৭৫ খ্রীঃ) থেকে। তিনি এমন সামরিক দক্ষতাসম্পন্ন সম্রাট ছিলেন যে, তাঁকে বলা হত "ভারতীয় নেপোলিয়ন"। তাঁর নিজের কিন্তু ইচ্ছা ছিল, যুদ্ধে সাফল্যের চেয়ে তাঁর সঙ্গীত ও কাব্যপ্রীতির জন্যই তাঁকে সবাই মনে রাখবে। এরকম রাজার রাজত্বে এবং এরকম পিতার ব্যক্তিগত প্রভাবের যে কৃতিত্ব ও ঘটনার বীজ ছিল, তার দ্বারা পরবর্তী যুগে তাঁর ছেলে বিক্রমাদিত্য ভারতীয় প্রথার নায়ক হয়ে ওঠেন। কথনও কখনও একটা বড় কাজ হতে বহু জীবন কেটে যায়, যে সব কাজের ফলে সমুদ্রগুপ্তের পুত্র বিখ্যাত হয়েছিলেন, সেগুলির সূচনা সমুদ্রগুপ্ত করেছিলেন কি না, তা অনুমান করতে পারি মাত্র।

আমার নিজের মতে, এসব কাজের মধ্যে প্রধান হল, ঐ বিখ্যাত রাজত্বের কোন সময়ে, হয়তো ৪০০ খ্রীঃ নাগাদ মহাভারতের শেষ পুনর্লিখন। কয়েকটি পুরাণ, বিশেষতঃ বিষ্ণু ও ভাগবত-পুরাণ যে সম্পাদিত হয়েছিল, এ সিদ্ধান্ত করতেই হবে। ভাগবতও দাবী করে যে, মহাভারতের পরেই এই কাজ হয়েছিল, যে পণ্ডিতরা এ কাজ করেছিলেন, তাঁরা প্রভুর জীবনের যে সব বিশদ বর্ণনা দিতে আগ্রহী ছিলেন, তা দিতে না পারায় দুঃখ পেয়েছিলেন। পুরাণের সামাজিক কাজ কোথাও কিছু লেখা দেখেছি বলেও মনে পড়ছে না। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে শিক্ষার পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মুদ্রণের যুগের আগে, সব দেশের জনগণের সাহিত্য নিশ্চয় একটি বইয়ের আকার নিতে চাইত—যেমন দেখুন, বিরলোস বা বাইবেল—এতে রয়েছে ইতিহাস, ভূগোল, কিছু পরিমাণ সাধারণ খবর, সাম্প্রতিক কাহিনী, সর্বোপরি, ধর্ম ও নীতির একত্রিত প্রামাণ্য রূপ। অবশ্য ইতিহাস বলতে শাসক বংশের উদ্ভবের ইঙ্গিত বা বই লেখার সময়ে যাকে "আধুনিক" বলে মনে করা হত, সেই যুগের বর্ণনা। ভূগোলে থাকত প্রধান তীর্থস্থান ও পবিত্র নদীগুলোর বর্ণনা। বিষ্ণুপুরাণে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের কাহিনীতে অত্যন্ত জনপ্রিয় সংস্করণগুলির সঙ্গে তুলনা করলে আমরা কাহিনী ও লোকগীতি রচনার সূত্র পাই। ধর্মীয় ব্যাখ্যা যত পড়া যায়, তত যেন চাক্ষুষ হয়, ব্রাহ্মণ মন্দিরদ্বারে শিক্ষা দিচ্ছেন, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, প্রহ্লাদের মুখে শ্রেষ্ঠ দর্শনের ব্যাখ্যা বসানোর জন্য তিনি অন্য সব বিষয়কে তুচ্ছ করেছেন, অথবা সপ্ত

ঋষি কর্তৃক প্রদর্শিত শিশু ধ্রুবের জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ছবিকে চান যাঁরা ব্যাখ্যা দিতে।

গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রত্যেক গ্রামে বিদ্বান পণ্ডিত বা মহাভারতের নকল থাকা অসম্ভব। কিন্তু বিষ্ণুপুরাণ নামে পরিচিত বই-এর সংস্কৃতি সম্পদ ততটা দুর্লভ ছিল না; বইটি যে সাধারণ সংস্কৃতির মানরূপে সম্পাদিত বা পরিকল্পিত হয়েছিল, সে সিদ্ধান্ত করতেই হয়। এই ইঙ্গিতের যদি কোন মূল্য থাকে, তাহলে একেকটি পুরাণ যে প্রদেশে বা জেলায় রচিত হয়েছিল তার বিষয়ে নতুন গুরুত্ব আরোপিত হবে। বিষ্ণুপুরাণ এতটুকু দেখলে বোঝা যাবে যে, পাটলীপুত্রের মত সাম্রাজ্যবাদী রাজধানীর আশেপাশে এটা লেখা হয়েছিল। হিরণ্যকশিপুর ছেলে কিছুদিন শিক্ষা পাওয়ার পর তাকে সে কোলে বসিয়ে প্রশ্ন করছে, এই কাহিনীতে ঐ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি প্রশ্ন বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। পিতা বলছে, "শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশী হলে কি করা উচিত।" পুত্র স্পষ্টতঃ বইয়ে পড়া উত্তর দিচ্ছে, "ওদের বিচ্ছিন্ন ক'রে একে একে আক্রমণ করতে হবে।" হিন্দু সাহিত্যে মহাভারত যে অর্থে জাতীয়, সে অর্থে আর কোন বইকে "জাতীয়" বলা চলে না। বিদেশী কোন পাঠক যদি শুধু পণ্ডিত না হয়ে সহানুভূতিসম্পন্ন মন নিয়ে এ বই পড়েন, তাহলে প্রথমেই দুটি বৈশিষ্ট্য তাঁর চোখে পড়বে; প্রথমতঃ, বৈচিত্র্যের মধ্যে এর ঐক্য; দ্বিতীয়তঃ, সে অবিরাম শ্রোতাদের মনে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে, সে ভারতের বীরধর্মের প্রেরণা হল গঠনমূলক ও ঐক্যপ্রয়াসী। এ হল এক সাম্রাজ্যবাদী জাতির সম্রাটের স্বপ্ন। পাটলীপুত্রের যে গুপ্ত সম্রাটের আদেশে এই বিরাট বই শেষবার পুনর্লিখিত হয়, তাঁর আগের সম্রাট অশোক বা পরবর্তী আকবরের মত তিনি সচেতন-ভাবে তাঁর প্রজাদের এই যাদুমন্ত্র শুনিয়েছিলেন, "ভারত এক"।

রচনাটির নিজস্ব ঐক্যের ক্ষেত্রেও ভারত অসাধারণ। যে রচনার বিষয়বস্তু এত প্রাচীন এবং যার উদ্ভব এত জটিল, সে বই যে আমাদের কাছে একটি নিশ্চিত সামগ্রিক রূপ নিয়ে এসেছে, তার থেকে ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণ হয় যে, কোন কেন্দ্রীয় শক্তি তার ক্ষমতা ও সম্মানের সাহায্যে এই আকারে বইটিকে স্বীকৃতি দেওয়ার ঘটনাকে সবচেয়ে মূল্যবান বলে ভেবেছিল। কাব্যটির উৎস অত্যন্ত প্রাচীন, এর সূত্রগুলিতে অসংখ্য বৈচিত্র্য। কিন্তু মহাভারত নিশ্চয়ই কোন সিংহাসনের দাক্ষিণ্যে বর্তমান আকার পেয়েছিল এবং সে সিংহাসন ছিল সাম্রাজ্যবাদী। যে পরিণত বয়সে বইটি প্রথম পড়বে, তার কাছে এই পর্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

স্বভাবতঃ লোকে ভাববে বইটি নানা অংশে ছড়িয়ে আছে বা বিভিন্ন কাহিনীতে প্রচলিত। বইটি পড়লে বস্তুতঃ বোঝা যায়, কোন এক সুদূর অতীতে এই অবস্থাই ছিল। এখানে সেখানে কোন অধ্যায় বা স্বর্গের শেষে লিখিত কাহিনী পরের অধ্যায়ে আবার পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ বা আংশিক, কিন্তু একেবারে আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা, একই ঘটনা প্রতিদ্বন্দ্বী কথকরা বললে যে রকম হয়। কিন্তু কাহিনীগুলিকে

তুলনা ও পরীক্ষা করা, প্রতিটি পৃথক কাহিনীর নির্দিষ্ট মূল্য নির্ধারণ এবং সবগুলিকে একটি সামগ্রিক রূপদানের কাজ করেছিল কোন বিরাট মন, প্রবল শক্তি, সে শক্তি দীর্ঘ দীর্ঘ দিন আগে এই ভিত্তি ও পথ তৈরি করেছিল, যে পথ আজও আমরা অনুসরণ করছি। ঐ বিরাট রচনার অমর রূপের এই একক ও প্রশ্নাতীত বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দেয় বোম্বাই ও বারাণসী গ্রন্থের সূক্ষ্ম পাঠভেদ। মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব বাংলা ও দ্রাবিড় দেশে মহাভারত এক। ভারতের সর্বত্র, এমন কি বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও একটি ভূমিকা—সামাজিক ও শিক্ষাগত ভাবে মানুষ এবং জাতিগঠন। শৈশবে এই বই-এর প্রভাববর্জিত হয়ে কোন মহৎ লোক ভারতে দেখা দেননি। মনুষ্যত্ব-গঠনকারী এই কাব্য দেশের প্রতিটি প্রদেশে এক।

বইটি পড়তে গিয়ে সামাজিক ক্ষেত্রের যে বৈশিষ্ট্য সকলের চোখে পড়ে, তা হল, ব্রাহ্মণের অদ্ভুত অবস্থা। খুব স্পষ্ট বোঝা যায়। এখনও এটা মোটেই স্থির হয় নি। শ্রোতারা যে সব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত, তার মধ্যে ব্রাহ্মণকে উপহার ও সম্মান দান করার মত আর কোনটির কথা একবার বলা হয় নি। আমরা এও লক্ষ্য করি যে, জাতিও তখনও নির্দিষ্ট হয় নি, কারণ, দ্রৌপদীকে দেখা যায় স্বয়ম্বর সভায় পাঁচ ভাইকে অনুসরণ করছেন, তখন তিনি ও আর সকলের ধারণা, ঐ পাঁচ ভাই ব্রাহ্মণ। পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে এক স্ত্রীলোকের বিবাহের ঘটনার মত এ ঘটনার ব্যাখ্যা বা উদাহরণের দরকার নেই। না, মহাভারতের শেষ পুনর্লিখনের সময়ে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের বিবাহ পাঠকরা বুঝত, তাকে সমর্থন করত। তবে এটা বেশ বোঝা যায় যে, রচনাটির প্রামাণিকতা জনমনে ব্রাহ্মণদের ও এই কাব্যের স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত। সম্ভবতঃ রাজাদেশে তারা এই দায়িত্ব নিয়েছিল—যেমন দময়ন্তীর কাহিনীতে আর একটা কাহিনী লেখা হয়েছিল তার বাবার রাজধানী থেকে—রাজার আদেশ হয়তো ছিল, পাঠকের দানের ওপরে নির্ভর ক'রে এ কাহিনী সর্বত্র ছড়াতে হবে। এখানে আমরা প্রশ্ন না ক'রে পারি না, "এখন পর্যন্ত জাতি হিসেবে ব্রাহ্মণদের বিশিষ্ট কাজ কি?"

কিন্তু শ্রোতাদের বিবেচনা ও দানের ওপরে ব্রাহ্মণের এই অবিরাম নির্ভরতার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আছে। ভাল ক'রে দেখলে আমরা দেখি, বেশ বড় আকারের অনেক অনুচ্ছেদে ব্রাহ্মণদের বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। এই বৈশিষ্ট্য থেকে আমাদের মনে বেশ ভালভাবে এই ধারণা হয়ে যায় যে, আরও পরবর্তী কালের সংযোজনের এটা প্রমাণ। মনে হবে, প্রাচীনতর সংস্করণগুলোতে কাব্যে জোর ক'রে এই বিশেষ জাতির উল্লেখ করা হয় নি, এবং শেষ পুনর্লিখনের সময়ে নতুন বিষয়, নতুন মন্তব্য যোগ করা সত্ত্বেও প্রাচীন সংস্করণের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে।

অবশ্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে নতুন পাঠকের পক্ষে নিজেকে ভ্রান্ত মনে করা কঠিন হবে। প্রশ্ন হল, এই শেষ পুনর্লিখিত কাব্যের নায়ক কে? আমরা

মহাভারতকে যে ভাবে পেয়েছি, তাতে নিঃসন্দেহে এটি কৃষ্ণের কাহিনী। শেষ সম্পাদনা শৈবমতানুবর্তী, এ তত্ত্ব কি ক'রে এল, বোঝা কঠিন। বরং, যেখানো হয়েছে মহাদেব কৃষ্ণের প্রশংসা করছেন, কিন্তু আমি যতদূর জানি, এর উল্টো কথনো ঘটে নি। এর একমাত্র অর্থ, এখানে তৎকালীন হিন্দুধর্ম শিবের মাধ্যমে নতুন উপাদান যোগ করছিল, যা কিছু পবিত্র প্রামাণ্য তার দ্বারা একে বিচার ও গ্রহণ করাই ছিল উদ্দেশ্য। জাতীয় কাহিনীর কৃষ্ণ যথার্থ পার্থ সারথি, অর্জুনের সারথি,—খুব সম্ভব দ্বারকার ও প্রাচীন যুদ্ধ গাথার তিনি নায়ক—কিন্তু তাঁকে কেশব, তাড়কার হত্যাকারী বলে যমুনার নায়ক কৃষ্ণের সঙ্গে এক করার সবরকম চেষ্টা করা হয়েছে, মনে হয় দ্বিতীয় কৃষ্ণকে রাখালরা পুজো করত, তখনো বোধ হয় তারা অর্ধ-যাযাবর ছিল এবং কৃষ্ণের কয়েক শতাব্দী আগেই শান্তিতে ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল।

তাহ'লে যমুনার দক্ষিণ দিকের লোকের কাছে গুপ্তবংশ (তখন অর্ধেক হিন্দু) ইচ্ছাপূর্বক পার্থ-সারথি কৃষ্ণের কথা প্রচার করেছিল? নতুনভাবে সাম্রাজ্যবাদের অধীন জনগণের জাতীয় বিশ্বাসে গণতন্ত্রের আশা কি তিনি জাগিয়েছিলেন? এই যুগেই কি ইচ্ছাকৃতভাবে দাক্ষিণাত্যের গ্রামে গ্রামে বাৎসরিক 'পাণ্ডবলীলা' অনুষ্ঠানে মহাভারতের অভিনয়ের প্রচলন হয়েছিল এবং দ্রাবিড়দেশে কৃষ্ণ পার্থ-সারথির উদ্দেশে মন্দির তৈরি হয়েছিল? সে যাই হোক, পঞ্চাশ বছর পরে বিক্রমাদিত্যের পৌত্র স্কন্দগুপ্তের রাজত্বে ভিতারিতে পাটলীপুত্রের রাজপ্রাসাদের লোকদের ওপরে যমুনার কৃষ্ণের প্রভাবের অনেক প্রমাণ আছে। বারাণসীর পশ্চিমে গাজীপুর জেলায় এখনও একটি স্তম্ভ আছে, ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে হূণ জয় থেকে ফেরার পথে তরুণ রাজা এটি তৈরি করান। শিলালিপিতে আছে, তিনি তাড়াতাড়ি মাকে গিয়ে বলেন, "কৃষ্ণ যেমন শত্রুদের হত্যা ক'রে মা দেবকীর কাছে গিয়েছিলেন।" স্তম্ভটি তাঁর পিতার স্মৃতিতে তৈরি হয়: হয়তো যুদ্ধের জন্য স্থগিত উৎসব সম্পূর্ণ করার এবং দেবতাদের সাহায্যে সদ্যোলব্ধ জয়ের চিহ্ন এটি। স্তম্ভের শীর্ষে শেষে বিষ্ণুর মূর্তি স্থাপিত হয়। এখন এ মূর্তি নেই, কিন্তু আমরা নিশ্চিন্তে অনুমান করতে পারি যে, তখনও দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত নারায়ণের মূর্তিই ছিল এটি। সম্ভবতঃ এটি বৃত্তাকার প্যানেলে সামান্য উঁচু ক'রে খোদিত হয়, হাতে পদ্মধারী এক সুদর্শন যুবকের মূর্তি এটি। পরের বছর ৪৫৬ খ্রীস্টাব্দে গীর্ণার পর্বতের পশ্চিম পর্যন্ত নির্মিত বিষ্ণুর মন্দিরের এক বিরাট প্রযুক্তিবিদ্যার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়।

সাতশো পঞ্চাশ বছর আগে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মেগাস্থিনিস ভারতীয় ধর্মীয় ভাবধারায় লক্ষ্য করেছিলেন, "হেরাক্লিস মথুরা ও ক্লিসোবোথ্রায় পূজিত হন।" শেষের নামটি কি "ক্লিগোপুরা", ক্লিসোপুরা, কৃষ্ণপুরের গ্রীক উচ্চারণ? এর সঙ্গে কি দ্বারকাকে এক বলে ধরতে হবে, যে দ্বারকাকে সমগ্র মহাভারতে

কোন সন্তোষজনক কারণ না দেখিয়ে কৃষ্ণের সঙ্গে এক ক'রে দেখা হয়েছে— না, দ্বারকা ধ্বংস হয়েছিল বলে, মথুরার নিকটবর্তী কোনও শহর এটি ?

এই হেরাক্লিসই অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যক্তি। যে যুগের কথা আমরা ভাবছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, গ্রীস মধ্য-এশীয় অঞ্চলের সুদূরতম রাজ্য এবং সে অঞ্চলের ইতিহাসের নবীনতম সন্তান। তার পুরাণ ও ধর্মমত প্রধানতঃ মধ্য এশিয়া থেকে উদ্ভূত, ভূমধ্যসাগরের বিখ্যাত হেরাক্লিস নিঃসন্দেহে মূলতঃ এই ধরনের লোক। যে কোন প্রচলিত ধর্মমতে বা বিশেষ ক'রে কোন প্রাচীন দেবতা বা বীরের সঙ্গে যুক্ত ভাবধারায় মানবাত্মার মানবিক তাৎপর্যের সাহিত্যে বোধ হয় খুব কম লোকই প্রবেশ করতে পারে। আমরা এ ধারণা করতে পারি, হেলাসের হেরাক্লিসকে যখন সাধারণ লোক পূজা করত, তখন তাঁর মধ্যে রক্ষাকর্তা খ্রীস্ট মানবপ্রেমিক কৃষ্ণের প্রভাব বেশী ছিল, আমরা যা কল্পনা করি তার চেয়ে।

এমন হতে পারে যে, এশীয় মহাদেশ বা দক্ষিণ মেরু গ্রীসের ও ভারতের নদীতীরে সদ্যোজাত গোষ্ঠীগুলোকে ঢেলে দেওয়ার আগে সব ভবিষ্যৎ জাতিগুলোর মধ্যে বিবৃত কোন অত্যন্ত প্রাচীন কাহিনীর আর একটি রূপ গড়ে তুলেছে মথুরার অত্যাচারীকে কৃষ্ণের নিধনের কাহিনী। অন্ততঃ মেগাস্থিনিস সেলিউকোস নিকাতোরের দূত হয়ে এলে তাঁর এ কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়, যে গুপ্ত-সম্রা'ট রাজধানী উজ্জয়িনীর সঙ্গে পশ্চিম ভারত অধিকার করেছিলেন, তিনি উত্তরের জাতীয় মহাকাব্য নতুন ক'রে সম্পাদনার আদেশ দেওয়ার আগে ৭০০ বছর চলে যাওয়ার পর লোকে জানল যে, যমুনার এই ক্লিসোক্রিসো—কৃষ্ণ হলেন শিষ্যদের কাছে উপনিষদের সব রহস্যের প্রচারক উত্তর ও বৈদিক ভারতে দীর্ঘকাল পরিচিত এক পার্থসারথি। আমরা কি মনে করব যে, আর্যগুরু যে সব গোষ্ঠীকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করতে চাইত, তাদের বলতেন, "তোমরা যাঁকে না জেনে পূজা করছ, আমি তাঁর কথা তোমাদের বলছি ?"

ভাগবত পুরাণের পাঠকরা লক্ষ্য করবেন যে, যমুনার জীবন, অর্থাৎ কৃষ্ণের কাহিনীর হেরাক্লীয় উপাদান সঞ্চিত হয়েছিল তাঁর প্রথম বারো বছরে, তার পর বলা হয়েছে, তিনি বেদ শিক্ষার জন্য প্রেরিত হয়েছে। অর্থাৎ, এই জায়গায় তিনি হিন্দুধর্মে বিষ্ণুর অবতার হয়েছেন। অবশ্য, এটা হওয়ার পর তাঁর শৈশবের বহু ঘটনা হয়ত হিন্দু-ব্যাখ্যায় স্থান পেয়েছিল।

সেই স্বর্গীয় শৈশবের সৌন্দর্য কি মহান্। মহাভারতের প্রতি পংক্তিতে পরিস্ফুট সেই ব্যক্তিত্বের অনুভূতি কি উষ্ণ, জীবন্ত! বিদেশী পোষাক সত্ত্বেও মহাকাব্য ও পুরাণ কৃষ্ণের কাহিনী কি অপূর্ব ক্ষমতা ও আবেগের সঙ্গে বর্ণনা করেছে! যে প্রাচীন জগতের নিশ্চিত সারল্য, বীরত্ব ও শক্তির পূজা থেকে প্রভূর দৈত্য, হাতী, মল্লবীর, অত্যাচারী হত্যার কাহিনী উদ্ভূত হয়েছে, সে জগৎ বর্বর হয়েও কত আড়ম্বর-

পূর্ণ। শত শত বছর, হয়ত লক্ষ লক্ষ বছর চলে যাওয়ার পর প্রতি ঘটনার সঙ্গে কমনীয় হিন্দু-ব্যাখ্যা যুক্ত হয় "এবং তখন কৃষ্ণের চরণে প্রণাম নিবেদন ক'রে সেই দুষ্টের আত্মা উজ্জ্বল লোকে চলে গেল, প্রভু যাকে হত্যা করেন তাঁর স্পর্শে তারও মুক্তি হয়।"

দীর্ঘকাল আগে গ্রীক দ্বীপপুঞ্জের লোকদের মত, জার্মান স্ক্যাণ্ডিনেভীয় অরণ্যের লোকদের মত বা আইসল্যাণ্ডের কাঠের বাড়ীর কৃষকদের মত চিরকাল ধরে ভারতীয় জনগণ বীরের বিস্ময়কর কাহিনী শুনে এসেছে, সে বীরের একমাত্র পদতল ছাড়া আর কোন দুর্বল স্থান ছিল না ; দৈব অস্ত্রধারী মানুষ, যে বীর জলের মত দাবাগ্নি খেয়ে ফেলতে পারে, যে স্ত্রীলোক চোখের ফাঁকে দেখতে পায়, হত্যার যোগ্য লোকদের ওপরে দেবতাদের উন্মত্ততার অভিশাপ, জগতের রহস্যময় যুগের প্রলয়, দুর্ভাগ্য, অদ্ভুত বীরত্বপূর্ণ কাহিনী তারা শুনেছে।

কিন্তু আমার মনে হয়, এ কাহিনীর ধারা শেষে কৃষ্ণের স্বর্গারোহণের মত এত প্রবল আর কোথাও নয়। এখানে কোন প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা নেই। এখানে আমরা এক মহৎ হিন্দু কবির প্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ দেখি। পাশ্চাত্যের সমস্ত ধর্ম-প্রবণতা পনেরোশো বছরে আপন মহিমায় রহস্যময় খ্রীষ্টীয় কাহিনীর মত ঘটনাকে এক অপূর্ব অতীন্দ্রিয় দিক্ থেকে দেখানোর জন্য যা করেছে, তা এখানে ভারতের গুপ্তযুগের কোন অজ্ঞাতনামা লেখক ৪০০ খ্রীস্টাব্দের বা তার আগে করেছে, তার অবতার-কাহিনীর শেষ হয়েছে প্রেম ও বিজয়ের মিলিত সুরে।

"প্রভু স্বর্গের মধ্যভাগ পেরিয়ে তাঁর নিজস্ব সেই দুর্জ্ঞেয় লোকে প্রস্থান করলেন। তখন সব দিব্যপ্রাণীরা একত্রে তাঁর স্তব গাইলেন। দেবতারা ও ঋষিরাও প্রণাম জানালেন। স্বর্গের রাজা ইন্দ্রও সানন্দে তাঁর স্তব গাইলেন।"

মহাভারতের শেষ পুনর্লিখন

তাহ'লে যুক্তির খাতিরে আমরা ধরে নিতে পারি যে, মহাভারতের শেষ পুনর্লিখন উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্য নামে পরিচিত, মগধের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের (৩৭৫ থেকে ৪১৩ খ্রীঃ) রাজত্বের প্রধান ঘটনা এবং সাহিত্যে তাঁর বিরাট খ্যাতির উৎস। শুখানে দুই প্রমাণ থেকে আমরা এও ধরে নিতে পারি যে, তিনি দ্রাবিড় দেশে বা মাদ্রাজ অঞ্চলে এই পুনর্লিখনের জন্য স্বেচ্ছায় লোক পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এ সব যদি সত্য হয়, তাহ'লে এত বড় একটা দায়িত্ব পালন করার জন্য তিনি কি উপায় নিয়েছিলেন, মনে হয়? নিশ্চয় উপাদান একত্রীকরণের কাজ বারাণসীতে কোন শীর্ষস্থানীয় পরিচালক প্রতিভার অধীনে একদল পণ্ডিত করতেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ যে অনুমান করেছেন যে, একটি বিশেষ ধরনের প্রাকৃত অক্ষরের 'দেবনাগরী' নাম বোঝায় দেবনগর বা বারাণসীকে তা যদি ঠিক হয় (আমার মনে হয় ঠিক) তাহলে

প্রশ্ন ওঠে। মহাভারত কি তার পুনর্লিখন উপলক্ষেই ব্যাপক খ্যাতি ও ব্যবহার লাভ করেছিল?

এই বিষয়ে রামায়ণের সম্ভাব্য তারিখ হল পরীক্ষা ও সিদ্ধান্ত সাপেক্ষ। আমার দিক্ থেকে ভাষা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন আলোচনা ক'রে আমি বলব যে, মহাভারত সম্পূর্ণ সম্পাদিত হওয়ার আগে এই কাব্যের প্রথম অংশ রচিত হয়েছিল এবং এতে যে দীর্ঘ সময়ের কথা রয়েছে, তার মধ্যে অযোধ্যা প্রধান ভারতীয় রাজধানী হয়ে উঠেছিল। অতএব অনুমান করা হয় যে, পাটলীপুত্রে অশোকের রাজধানীর পরবর্তী হল অযোধ্যা, এর পর আবার আসে গুপ্তদের অধীনে পাটলীপুত্র। বালি এবং জাভার পূর্বে লম্বকের দ্বীপবাসীদের প্রথা ব'লে যা বলা হয়েছে, সে অনুযায়ী আমি মনে করি, রামায়ণের উত্তরাকাণ্ড অংশ পরে রচিত। রামায়ণের একটা সংক্ষিপ্তসার মহাভারতে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' রামায়ণে সংক্ষিপ্ত রূপে রয়েছে, এ তথ্য থেকে সম্ভবতঃ একটা যুগের সাহিত্যপ্রথার কথা বোঝা যায়, যে যুগে বই স্বভাবতঃ কম ছিল। এ কথা মনে হবেই যে, অযোধ্যা ও পাটলীপুত্রের নিজস্ব সময়ের রাজনৈতিক গুরুত্বের ফলেই তারা বিষ্ণুর নির্দিষ্ট অবতারের মাধ্যমে নতুন ধর্মপ্রচার করেছে—এক ক্ষেত্রে রাম, অন্য ক্ষেত্রে কৃষ্ণ। যদি এটা সত্য হয়, তাহ'লে এখন দ্রাবিড় দেশে সীতারামের পূজার ব্যাপকতার বিষয়টি বেশী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সম্ভবতঃ এটাকে আমরা আইন ব'লে ধরে নিতে পারি যে, ধর্ম শুধু তার জন্মভূমিতে নয়, যেখানে প্রেরিত বা প্রচারিত হয়, সেখানেও দীর্ঘদিন অত্যন্ত শক্তির সঙ্গে বাঁচতে পারে। শুধু শিবের পূজার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম দেখা যায়, এ পূজা বারাণসীতে এখনও প্রধান।

মহাভারতের শেষ সঙ্কলনের যে তারিখ আমি অনুমান করেছি, তা যদি ঠিক হয়, তাহ'লে দেখা যাবে, সঙ্কলিত হওয়ার সময়ে নিশ্চয় ঐ বিরাট রচনা বিশালসংখ্যক পণ্ডিত ও সমালোচককে শিক্ষিত করেছিল। নিশ্চয় এর ফলে এক জায়গায় (নিঃসন্দেহে বারাণসীতে) বিপুল পরিমাণ প্রচলিত প্রথা, লোক-কাহিনী, পুরনো তথ্য, প্রাচীন জ্ঞানের নানা শাখার পণ্ডিতদের জড়ো করা হয়েছিল। এ সব থেকে বোঝা যায়, ঐ শহর ছিল অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকারান্তর এবং এখন যে জ্ঞান ও গবেষণার ওটি কেন্দ্র, তা খুব সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের অধীনে সৃষ্ট পুনর্জাগরণের ফল।

আমরা দেখি সামগ্রিকভাবে গুপ্তযুগ সম্বন্ধে (৩২৬ থেকে ৫০০ খ্রীঃ) ভিনসেন্ট স্মিথ বলেছেন:

"সম্ভবতঃ ঐ যুগেই প্রধান পুরাণগুলি বর্তমান রূপ লাভ করে; ছন্দোবদ্ধ অনুশাসনগ্রন্থ যার সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ হ'ল তথাকথিত 'মনুসংহিতা' এবং সংক্ষেপে 'চিরন্তন' সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যেও তাই ঘটেছিল। অধ্যাপক ভাণ্ডারকর বলেছেন, বড় গুপ্ত সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে একটা সাধারণ 'সাহিত্য-প্রেরণা'"

দেখা দিয়েছিল, এ প্রেরণা প্রতি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে প'ড়ে ক্রমশঃ সংস্কৃতকে এমন জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল যার ফলে সংস্কৃত দীর্ঘদিন উত্তর ভারতের সাহিত্যের প্রধান ভাষা হয়েছিল।......সাহিত্যে ও রাজনৈতিক ইতিহাসে গৌরবময় গুপ্তদের স্বর্ণযুগ ছিল এক শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীর এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে (৩৩০ থেকে ৪৫৫ খ্রীঃ), এ সময়ে অতিদীর্ঘ তিনটি রাজত্ব ছিল। ৪৫৫-র প্রথমে কুমারগুপ্তের মৃত্যুতে সাম্রাজ্যের ক্ষয় ও পতনের সূচনা ঘটে।"

আবার :

"মনে হয়, প্রধান পুরাণগুলির বর্তমান রূপের সম্পাদনা হয়েছিল গুপ্ত যুগে, যখন সংস্কৃত ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের বিপুল বিস্তার ও পুনর্জাগরণ ঘটে।"

এইভাবে বর্ণিত বই-এর পুনর্লিখন ও সম্পাদনা মহাভারতের রাজকীয় পুনর্লিখনের অনিবার্য ফল, মনে হয় এটা ঘটবার জন্য, আমার মতে, আলোচ্য রচনাগুলি "প্রধান পুরাণ" রূপে একত্রীভূত করার দরকার হয় না, কারণ হিন্দু ভাবধারার ক্রমোন্নতি অনুসরণ করা সম্ভব, তার ফলে পৌরাণিক সাহিত্যে কালানুক্রমিক যুগ এবং নির্দিষ্ট রূপ ভালভাবে বোঝা বেশ সহজ।

মহাভারতের শেষ পুনর্লিখনের তারিখ সম্বন্ধে অনুমোদিত তত্ত্ব যদি শেষ পর্যন্ত গৃহীত হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস, মহাভারতের কোন অংশ গুপ্তযুগে গুপ্তকবির দ্বারা সংযোজিত, সেই বিভিন্ন স্তর নির্ধারণ করা তত কঠিন হবে না। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ভারতীয় ছাত্ররা যত সহজে ভাষার ও ধর্মীয় বিবর্তনের পরীক্ষা প্রয়োগ করার দক্ষতা লাভ করবে ততটা বিদেশীরা পারবে না। এই রচনা এবং এই জাতীয় রচনার কাজ অনায়াসে সাহিত্য-সমিতিগুলি গ্রহণ করতে পারে। বাইবেল সমালোচনার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত পদ্ধতি অনুযায়ী আমি বলব যে, বইগুলির ছাত্র-সংস্করণে পাতা ও অনুচ্ছেদগুলি বিভিন্ন রঙে ছাপা হবে অনুমিত যুগবিভাগ অনুযায়ী। অনির্দিষ্ট অনুচ্ছেদগুলির কাগজ সাদা থাকতে পারে, প্রাচীন যুগ হলদে, শৈবযুগ সবুজ বা গোলাপী আর গুপ্তযুগের সংযোজনগুলি নীলচে আভাযুক্ত। অথবা, ছাত্ররা নিজেরাই জলরঙের সাহায্যে এই কিছুটা পরিশ্রমসাধ্য দায়িত্ব পালন করতে পারে। মোট কথা, এক নজরে অনেক সময় ও পরিশ্রমের ফল চোখের সামনে তুলে ধরার পক্ষে এরকম পদ্ধতি মূল্যবান প্রমাণিত হবে।

সংশ্লিষ্ট কালানুক্রমের কতকগুলি বিষয় নির্ধারণ করা বেশ সহজ। যেমন, নলদময়ন্তীর গল্পে নলের অপূর্ব প্রার্থনা—"হে পবিত্রা, আদিত্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীদ্বয় ও মরুৎগণ তোমায় রক্ষা করুন, তোমার আপন সম্মান তোমার শ্রেষ্ঠ রক্ষক হোক!"-এর থেকে বোঝা যায়, বৈদিক বা ঔপনিষদিক প্রাক্-পৌরাণিক যুগে উদ্ভূত। নল-দময়ন্তীর কাহিনী আর্যকাহিনীর প্রাচীনতমগুলির একটি, পুরুষের নামের প্রথমে উল্লেখ হয়ত এরই চিহ্ন। যে যুগে ভারতে বৌদ্ধধর্ম দেখা দিয়েছিল, এ কাহিনীর পরিবেশ সেই যুগের। রাজা মাংস রান্না করছেন, তাঁর স্ত্রী তা খাচ্ছেন। যে

দেবতারা নলের সঙ্গে স্বয়ংবর সভায় এসেছেন, তাঁরা সবাই বৈদিক দেবতা। সমস্ত গল্পে মহাদেব বা কৃষ্ণের কোন উল্লেখ নেই। বরং রহস্যময় স্থানে সম্বদ্ধ একটি সাপের কথা আছে। ব্রাহ্মণদের দেখানোও হয়েছে রাজাদের ভৃত্যরূপে, শাসকরূপে নয়। যে বনপর্বে নল-দময়ন্তীর কাহিনী রয়েছে তার পরের একটি কাহিনী হল সীতা ও রামের গল্প। আর এই পর্যায়ের তৃতীয় ও শেষ কাহিনী হল সাবিত্রীর। গল্পগুলি বিবর্তনের ক্রম-অনুযায়ী নিঃসন্দেহে সাজানো হয়েছে। সীতা দুঃখময়ী রমণী, স্নিগ্ধ মাতৃমূর্তি। পরবর্তী বৈদিক যুগে রামায়ণে উল্লিখিত সাবিত্রীর মধ্যে শৈব বা বৈষ্ণব প্রভাবের চিহ্নমাত্র নেই, বোধ হয় একমাত্র নারদের উল্লেখ ছাড়া—সাবিত্রী অনুগতা স্ত্রীর সম্পূর্ণ হিন্দুরূপ। জাতীয় প্রার্থনায় মূর্তিরূপে তাঁর জন্ম হল শ্রেষ্ঠ কাব্যের নিদর্শন। আমার ধারণা, দময়ন্তী, সীতা, সাবিত্রী—এই তিন নায়িকা একত্রে যে নারী আদর্শ গঠন করেছেন, অন্য কোন জাতিতে তার তুলনা নেই।

আবার, কিরাত-আর্জুনীয়ের মত কাহিনী যে শৈব পুনর্লিখনের যুগের, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত যে, কয়েকটি ঘটনা, যেমন, আত্মরক্ষার জন্য কৃষ্ণের কাছে দ্রৌপদীর প্রার্থনা এবং মৃত্যুশয্যায় ভীষ্মকে কৃষ্ণের গ্রহণ ইত্যাদি নিশ্চয় গুপ্তযুগের কাহিনী। অবশ্য, পাশাখেলার দৃশ্যের কঠিন বর্বরতা, শরশয্যায় বৃদ্ধ যোদ্ধার মৃত্যু আর এক রাণীর সঙ্গে পাঁচপাণ্ডবের বিবাহ মনে হয় সরাসরি বীরত্বের যুগ থেকে উদ্ভূত।

যে অজানা কবি পুনর্লিখন সম্মেলনের পরিকল্পনায় সভাপতিত্ব করেছিলেন, তাঁর প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা গড়ে তুলতে অনেক সাহায্য পেতাম যদি নিশ্চিতভাবে বলতে পারতাম, মহাকাব্যের কোন্ অংশগুলি তাঁর রচনা। যেমন, যে অতি সুন্দর ঘটনায় একটি নির্দিষ্ট মুহূর্ত পর্যন্ত যুধিষ্ঠিরের রথের চাকা কখনো মাটি ছোঁয়নি, সে কি তাঁর রচনা? তা যদি হয়, তা হলে জগৎ কল্পনার শক্তি ও পবিত্রতায় এর তুল্য কম দেখেছে। কিন্তু শুধু সাহিত্য-সমালোচনার জন্য লোকে এই মহৎ কাব্যকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করতে চায় না। এ মন্তব্যের সঙ্গে আমরা পরিচিত যে, কল্পনার শক্তির দ্বারা উদ্ভূত বস্তু যেমন সাধারণতঃ মিথ্যা হয়, তেমন তারা যা বলে তা সত্য হওয়া খুব সম্ভব। মহাভারতে উল্লিখিত এই ঘটনাগুলির অত্যন্ত সতর্ক বিশ্লেষণের দরকার। এর মধ্যে সে যুগের শহরগুলির বিভিন্ন উল্লেখ রয়েছে।

যদিও সুদূর অতীতে ঘটনার কেন্দ্র হস্তিনাপুর বা ইন্দ্রপ্রস্থে হওয়ার কথা তবু আমরা বারবার বুঝতে পারি যে, কবি নিজে মগধরাজ্যকে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির কেন্দ্র বলে মনে করেন। জরাসন্ধ কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের যুগে বাঁচতে ও রাজত্ব করতে বা না করতে পারেন। এটা স্পষ্ট যে, মহাভারতের শেষ সঙ্কলকরা রাজগৃহের রাজ-পরিবারবিহীন ভারতের কথা ভাবতে পারেননি। একই বিষয় সমানভাবে ভাগবত পুরাণ এবং সম্ভবতঃ অন্যত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এটা গুপ্তযুগের রাজনৈতিক চেতনার আভাস। এতে বোঝা যায়, এখনকার মত তখনও উত্তর ভারতে দুটি শাসক গোষ্ঠীর

প্রাধান্য ছিল—একটা ছিল দিল্লীর কাছে, অন্যটা এখন বাংলা নামে পরিচিত অঞ্চলে; এতে দেখা যাচ্ছে, ঐক্য বলতে প্রধানতঃ এই দুটি শক্তির মিলন বোঝাত। বিক্রমাদিত্যের আড়াইশো বছর পরে ভারতবর্ষকে আবার সবল হাতে শাসন করেন হরিশচন্দ্র। কিন্তু তাঁর রাজধানী স্থানেশ্বরে, কুরুক্ষেত্রের কাছে। এইভাবে চলেছে অদলবদল, আধুনিক যুগের যেটি বিরাট সমস্যা,—একটি সাধারণ জাতীয়তাবোধে হিন্দু-মুসলমানকে সমানভাবে বেঁধে ফেলা, তা দেখা যাচ্ছে বহুপ্রাচীন কেন্দ্র পরিবর্তনের নতুন রূপ মাত্র, এর মূল কারণ হয়ত ভারতবর্ষের উদ্ভবের উৎসস্বরূপ ভৌগোলিক ও জাতিগত পরিবেশে নিহিত আছে।

তাহ'লে মহাভারত রচনার দৃশ্য তাত্ত্বিকভাবে কেন তক্ষশীলায় স্থাপিত হয়েছিল? রাওয়ালপিণ্ডির উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই জায়গাটি মনে হয়, বৌদ্ধ যুগ থেকে এক-হাজার বছরেরও বেশী পরে হুণরা আসা পর্যন্ত মধ্যযুগীয় ইউরোপের কর্ডোভা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মত স্থান অধিকার করেছিল, অনেকটা একই কারণে। বুদ্ধের যুগে এ শহর ছিল বিশ্ববিদ্যালয়, যে যুবকরা রাজগীর থেকে ওখানে চিকিৎসাবিদ্যা শিখতে গিয়েছিল, তারা তাই দেখেছে। শহরটা ছিল জাতিগুলির চলাচলের পথে। এক দ্বারপথ দিয়ে যেত খ্রীস্ট যুগের আগে ও পরে আক্রমণকারী সিদীয় ও তাতার জাতির যাযাবর দলগুলি। তার অনেক আগে এ শহর আলেকজাণ্ডারের গ্রীক অভিযানের আনুগত্য স্বীকার করেছিল। অনুরূপভাবে, মধ্যযুগীয় ইউরোপে কর্ডোভাতে চিকিৎসা-বিদ্যা শেখা যেত, কারণ, সেটা ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনস্থল। মুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আফ্রিকান, আরব, ইহুদী, ইউরোপীয় সবাই সংস্কৃতির বিরাট বিনিময় ক্ষেত্রে মিলিত হত, কেউ দিতে, কেউ নিতে। ওখানে একেবারে ভিন্ন ভিন্ন মানব-জাতির প্রত্যেকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর সংক্ষিপ্ত রূপ যেন অনুভব করা সম্ভব হত। একইভাবে, তক্ষশীলা তার যুগে ছিল এশীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র, অন্যতম মহৎ প্রচারক। এখানে ৬০০ খ্রীস্টপূর্ব থেকে ৫০০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ব্যাবিলনীয়, সিরীয়, মিশরী, আরব, ফিনিশীয়, এফেসীয়, চীনা ও ভারতীয় মিলিত হয়েছিল। ভারতের বাইরে পাঠানোর যোগ্য ভারতীয় বিদ্যাকে আগে নিয়ে যেতে হত তক্ষশীলায়, সেখান থেকে তা সব দিকে ছড়িয়ে পড়ত। গুপ্তযুগে হিন্দুচেতনায় শহরটির প্রকৃত স্থান নিশ্চয় এরকমই ছিল। মহাভারত প্রথম রচনার বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে একে নির্বাচনের সঙ্গে কি এই ধারণার কোন যোগ ছিল। বিক্রমাদিত্য কি মনে করতেন এ কাব্য ভারতের একজাতীয় পুরাণ, বিশ্বসাহিত্যে জাতীয় অবদান? নাকি, এর ব্যাখ্যা আমরা খুঁজব, শুধু তক্ষকশীলা নামে (তক্ষকশীলা?) এবং প্রথম খণ্ডে তক্ষক নামক বিরাট সাপের ভূমিকায়?

ধরা যাক, ৪০০ খ্রীস্টাব্দকে মহাভারতের শেষ সঙ্কলনের সময় বলে বেছে নেওয়া এবং পাটলীপুত্র শহরকে তার পৃষ্ঠপোষক শহর ব'লে ধরা ঠিক হয়েছে, তাহ'লে দেখা যাবে, এই কাব্যকে সে যুগের বাঙালী সভ্যতার চরম বলে মনে করা যায়।

আমরা প্রায়ই বুঝতে পারি না, বাংলার সম্পূর্ণ, ধারাবাহিক বিবরণের কত প্রচুর উপাদান এখন রয়েছে। অনেকদিন আগে শরৎচন্দ্র দাস দেখিয়ে দিয়েছিলেন, লাসা শহর মধ্যযুগীয় বাংলায় থেকে নেওয়া একটি পৃষ্ঠা। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সওয়াই জয় সিংএর রাজত্বে জয়পুর শহরের পরিকল্পনায় বাঙালী স্থপতি বিদ্যাধরের প্রভাবের মধ্যে আমরা বাংলার ইতিহাসে বাঙালী মনের মহত্ব ও সভ্যতার পরবর্তী তথ্যের প্রমাণ পাই। জয়পুরের সেই চল্লিশ গজ চওড়া সব পথ, বাতাস ও পয়ঃপ্রণালীর সুব্যবস্থা, নাগরিক চেতনার অপূর্ব উন্নতি আধুনিক ও বিদেশী নয়, এ সব প্রাক্-ইংরেজ ও বাঙালী উৎস থেকে উদ্ভূত। কিন্তু আমার কাছে এ বিষয়ে মহাভারত শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। বিক্রমাদিত্যকে শাসক সম্রাট বলে ধরে নিয়ে আমরা এখানে দেখি জনগণ নাগরিক ও রাজকীয় আড়ম্বরে খুব অভ্যস্ত। শহরের আনন্দের এই বর্ণনা কি সুন্দর এবং প্রাণবন্ত।

"নাগরিকরা পতাকা, নিশান ও ফুলের মালা দিয়ে শহর সাজাত। রাস্তা জল দিয়ে ধোয়া হত, ফুলের মালা ও অলঙ্করণে সাজানো হত। তোরণগুলিতে নাগরিকরা ফুল ধূপ করত। ওদের মন্দির ইত্যাদি সব ফুল দিয়ে সাজানো হত।"

বলা উচিত, ভারতের বইয়ের ইতিহাস এখানে থাকা দরকার। মহাভারত কোন্ পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রথম রচিত হয়েছিল? যখন এত স্পষ্ট, স্বচ্ছভাবে "তিন বেদের" উল্লেখ করা হয়, তখন সেগুলি সম্বন্ধে লেখক বা বক্তা কি ধারণা করেন? তাঁর মনে কি কোন বই বা পাণ্ডুলিপির ছবি থাকে? আর যদি, তাই হয়, তাহ'লে সে ছবি কেমন? না কি ব্রাহ্মণদের গাথা, বেদের মত তার বহু অংশ ও বিভাগ?

উপরন্তু, এই কাব্যে সব ঐশ্বর্য ও যুগের উচ্ছ্বাসের আড়ালে রয়েছে শ্রদ্ধা ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাময় জীবন; সব শ্রেণীর লোকের মধ্যে ব্যাপ্ত বিশ্বাস, পবিত্রতা ও সাহসের আদর্শ, সে আদর্শ আজকের মত পাটলীপুত্র রাজত্বেও ছিল। শিক্ষার আদর্শের ক্ষেত্রে আজকের তরুণ বাঙালী পণ্ডিত এখনো গুপ্তযুগের সংস্কৃতির অধীন। প্রাচীন বেদ থেকে আজকের শৌখীন সাহিত্য-ভাষা পর্যন্ত সংস্কৃতের জ্ঞান; কিছু বইয়ের সঙ্গে পরিচয়; এবং দর্শন, তর্কবিদ্যা ও অধ্যাত্মবিদ্যার নির্দিষ্ট ছকের পরিচয়কে পাণ্ডিত্য বলে মনে করা যায়। যে নতুন ধরনের চিন্তাধারা ও জ্ঞানের সমন্বয় ও প্রকাশের ফলে বলা সম্ভব হবে যে, এসব ধারণা বিক্রমাদিত্য যুগের চেয়ে পৃথক, সে জায়গায় খুব অল্প বাঙালী মন এখনো পৌঁছতে পেরেছে। সে নতুন যুগের কেন্দ্র ও ভিত্তি হবে বিজ্ঞান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, বিজ্ঞানের যুগ এবং তার সঙ্গে ভূগোল ও ইতিহাসের উন্নতি আসবে গুপ্তদের যুগের ঠিক পরেই, তার সঙ্গে বাংলাদেশে সংস্কৃত সাহিত্য ও তর্কবিদ্যা। যে ধরনের যুগ এত বেশী উন্নত, সেখান থেকে মানবতার ক্ষেত্রে মানুষকে সমান জায়গায় স্থাপন করার মত যুগে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাতির নৈতিক মান শক্তি ও স্থায়িত্বে শিথিল হওয়ার বদলে

বরং উন্নত হওয়া দরকার। জাতির ইতিহাসে ঝাড়াই-বাছাই-এর সময় হল যুগগুলির মিলনস্থল এবং বহু লোক এ সময়ে বাদ পড়ে যায়।

মহাভারত ও পুরাণ, উভয় গ্রন্থেই বর্ণিত কৃষ্ণের জীবনের বহু ঘটনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি বৈদিক দেবতাদের ছড়িয়ে গেছেন। তাঁর সিংহাসনে আরোহণের সময়ে ইন্দ্র তাঁ'র স্তব করেছেন। বৃন্দাবনেও তিনি বৈদিক যজ্ঞের বিরুদ্ধে কর্মযোগ সাফল্যের সঙ্গে বৃন্দাবনে প্রচার করেছেন, এবং পরবর্তী যুদ্ধে ইন্দ্রকে নীচে নামিয়ে আনতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ শিবের মত বিষ্ণুর এই নতুন ধর্ম প্রাচীন প্রকৃতি দেবতাদের চেয়ে পৃথক শ্রেণীর। আরও আধুনিক ধর্ম বিষয়গত। তার কেন্দ্র আত্মার, শক্তি শ্রেষ্ঠ আদর্শের। ইন্দ্র, অগ্নি, যম ও বরুণ ছিলেন বাহ্যিক শক্তির প্রতীক, কয়েকজন সর্বশক্তিমান, ক্ষুদ্র মানুষের কাছে তাঁদের শক্তি অপ্রতিরোধ, গৌরবময়, প্রেমময়, কিন্তু আত্মিক নন। তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত বস্তুবাদী, আজও যেমন খ্রীস্টান ধর্মে পিতার ঈশ্বর।

নল ও দময়ন্তীর কাহিনী প্রাচীন বৈদিক যুগ থেকে উদ্ভূত হলেও শেষ অংশটা গুপ্ত কবিদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছিল। এক মহৎ ও দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত সভ্যতার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য রুচি ও আচরণ এবং নিঃসন্দেহে ধর্মীয় আদর্শের উচ্চ উন্নতি অনুযায়ী, এরকম ঘটনা সমৃদ্ধি ও শক্তির যুগে ভারতে বরাবর ঘটবে। শিল্পের ক্ষেত্রে কলির চলে যাওয়া আর পুষ্করকে ক্ষমা করা আমাদের ভুল ব'লে মনে হয়। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদের প্রজারা যুগ যুগ ধরে শান্তি ও সম্পদে অভ্যস্ত ছিল। ঐ যুগের সাধারণ স্বস্থ রুচিতে আপোষকাম্য ছিল নাটকীয় চরম পরিণতিরূপে, প্রতিশোধরূপে নয়। সাবিত্রীর গল্প কিছুটা অন্য ধরনে জনপ্রিয় রুচির একই ধারা। সে মৃত্যুকে জয় করেছে—প্রাচীন মেয়েদের সেই বীরোচিত পদ্ধতিতে নয়, যারা দেবতার মর্যাদার উদ্দেশে প্রার্থনা জানিয়ে পরিবর্তে প্রসন্ন, অতি উদার ব্যবহার পেত, এ হল শুধু আধ্যাত্মিক আদর্শের শক্তি। প্রার্থনা থেকে জাত, সংযম ও উপবাসের দ্বারা চরম মুহূর্তের জন্য সাবিত্রী বৈদিক রাজকন্যা নন, কোমল, আধুনিক হিন্দুরমণী। তিনি অজ্ঞাতসারে আত্মগত আত্মিক বিশ্বাসের ভাবী যুগের মানুষ হয়ে উঠেছেন। ঝড়, আগুন আর আরণ্য উপাসনার উন্মত্ত দিন এখন সুদূর অতীত।

অবশ্য এই দুটি যুগের মাঝে, একদিকে বৈদিক দেবতা, অন্যদিকে বিষ্ণু ও শিবের ধর্মীয় তত্ত্বের মাঝে মহাভারতে এবং পুরাণে এক বিসদৃশ মূর্তি দেখা যায়। সে হল ব্রহ্মা, স্রষ্টা, কৃপাময়, চতুর্মুখ পিতামহের মূর্তি। কে এই ব্রহ্মা? তাঁর সঠিক তাৎপর্য কি? বলা যায়, এটা ভারতে প্রায় একটা নিয়মের মত যে, পেছনে কোন সামাজিক সংগঠন না থাকলে কখনো কোন দেবতা বা ধর্মীয় ভাবধারা গড়ে ওঠে নি। তাহলে ব্রহ্ম-উপাসক গোষ্ঠীর কি চিহ্ন আমরা পাচ্ছি? কোন্ যুগে, কোথায় আমরা এ চিহ্ন খুঁজব? তাঁর সঙ্গে দত্তাত্রেয়ের কাহিনীর কি কোন যোগ আছে? আজমীরে পুষ্করের কাছে তাঁর একটা মন্দির আর একটি মূর্তির ইতিহাস

কি? মহাভারতেই মনে হয় তিনি অর্ধ-বিস্মৃত; অথচ ঐ কাব্য যদি বর্তমান যুগে রচিত হত, তাহলে তাঁর নাম আরও কম উল্লিখিত হত। খ্রীস্টানরা দেবতার কাজের সংগঠনে অভ্যস্ত, সে সংগঠন যে কোন বিচার বা শাসন বিভাগীয় কাজের মতই নির্দিষ্ট, তাঁরা দেবতাকে আপন স্রষ্টার সঙ্গে যুক্ত ব'লে কল্পনা করে। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে যে, এই ধারণা সবচেয়ে শিথিলভাবে হিন্দুধর্মে প্রযুক্ত কি না। প্রতিটি উপাসকের আপন হৃদয়ে যে ঐশ্বরিক প্রকাশ শ্রেষ্ঠ, সে তাকেই শ্রদ্ধা করে একমাত্র উৎস প্রাণের মূলরূপে। আরও উন্নততর ভাবনাযুক্ত লোকেরা আমাদের বলবে যে, বাস্তব পৃথিবীর সৃষ্টি ঈশ্বরের কাজের অংশই নয়।

স্থির করবার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ তারিখ হল কালিদাসের যুগ। যদি পাটলীপুত্রের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সত্যি (৩৭৫ থেকে ৪১৩ খ্রীস্টাব্দ) উজ্জয়িনীর বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য হন, তাহ'লে বোঝা কঠিন কালিদাস কি ক'রে তাঁর রাজসভার অন্যতম রত্ন হতে পারেন। মনে হয়, হিন্দুধর্ম প্রথম শিবের, তারপর বিষ্ণুর (লক্ষ্মী-নারায়ণ), তারপর রামের, শেষে কৃষ্ণের ভাবধারা গড়ে তোলে। মনে হয়, লক্ষ্মী-নারায়ণের ধর্মীয় ধারণা এবং রামের ঘনীভূত ধারণার মাঝে কালিদাস ছিলেন। ত্রিমূর্তির ধারণা তাঁর কল্পনাকে খুব বিচলিত করেছিল, সে ধারণা নিশ্চয় তাঁর সময়ে সম্পূর্ণ হয়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে তিনি শিবের ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, রামের দেবত্ব সম্পর্কে তাঁর ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ছিল। এইসব ধারণা থেকে হিন্দু পণ্ডিতরা তাঁর সময় ঠিক করতে পারবেন।

সূর্য-উপাসনা সম্বন্ধে মাঝে মাঝে মহাভারতে যে আভাস আমরা পাই, তাতে বোঝা যায়, এটা জনপ্রিয় পূজা যতটা ছিল, তার চেয়ে বেশী রাজকীয় পূজা। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় সূর্য-পূজার যে সব চিহ্ন রয়েছে, তার থেকে এ অনুমান অল্পবিস্তর সমর্থিত হয়। কাশ্মীরে, উড়িষ্যায়, অপ্রত্যাশিত জায়গায় এখানে-সেখানে আমরা এর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অবশেষ দেখতে পাই। কিন্তু মনে হয়, জনগণের মধ্যে এর প্রায় কোন চিহ্ন নেই। হিন্দুধর্ম অনুযায়ী পরমাত্মার পাঁচটি রূপের মধ্যে শাস্ত্রের মতে সূর্য একটি, কিন্তু পূজার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান কোথায়?

এ সব প্রশ্নের আলোচনা ও জবাবের দরকার। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, ভারত সম্বন্ধে আমাদের ধারণার যত উন্নতি হবে, তত সাধারণ কিছু ভাব-ধারায় যে সব পার্থক্য আছে, তার বিশ্লেষণে আমরা স্থান ও ইতিহাসের গুরুত্বকে স্বীকার ক'রে নেব। এটা মত-বিরোধিতা নয়, শুধু পরিস্থিতির বিভিন্নতামাত্র। এর ফলে বর্তমানের বহু গোষ্ঠী ও দলের সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে আমাদের অনুসন্ধান যত গভীর হবে, তত সার্থকভাবে আমরা এই বিবৃতির চরম সত্য উপলব্ধি করব যে, সব আপাতজটিলতার মধ্যে ভারত এক এবং ভারতীয় জনগণ এক ঐক্যবদ্ধ জাতি।

বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ

"ভারতে নিজস্ব মন্দির ও পুরোহিতযুক্ত বৌদ্ধধর্ম নামে পরিচিত কোন ধর্ম ছিল না।" এই রচনার শিরোনামরূপে লিখিত বিষয়ের যে কোন স্পষ্ট আলোচনায় স্বামী বিবেকানন্দের এই কথাগুলি আমার কাছে শ্রেষ্ঠ মন্তব্য বলে মনে হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে বৌদ্ধ ধর্মের ভারতে কখনো গোষ্ঠী ছিল না, ছিল ধর্মীয় মঠ। মতবাদরূপে এর অর্থ হল, এতদিন গণতন্ত্রের যে জ্ঞান ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের নিজস্ব ছিল, তা ছড়িয়ে দেওয়া। জাতীয় ক্ষেত্রে এর অর্থ হল, ভারতীয় জনগণের প্রথম সামাজিক ঐক্য। ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই ধর্ম হিন্দুধর্মের জন্ম দিয়েছে। এইসব ক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্ম এমন এক উত্তরাধিকার সৃষ্টি করেছে, যা আজও বেঁচে আছে। ভারতকে যে সব শক্তি গড়ে তুলেছে, তার মধ্যে বুদ্ধের রূপের মাধ্যমে মানবতার তীরে সাধারণ মানুষের প্রতি যে প্রবল ভালবাসার বিরাট ঢেউ ছড়িয়ে পড়েছে সেটি সবচেয়ে জোরালো। জন্ম নির্বিশেষে সব মানুষের সমান আধ্যাত্মিক অধিকারের কথা প্রচার ক'রে তিনি ভারতে যে জাতীয়তা সৃষ্টি করেন, জনগণের রাজা অশোকের হৃদয়ে সে বাণী পৌঁছনোমাত্র তা স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে রূপ নেয়। যারা রাজনীতির বাইরে থাকে, তাদের দ্বারা ইতিহাসের প্রচণ্ডতম রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে রূপদান করার পদ্ধতির এ হল চরম উদাহরণ। ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সাম্রাজ্য গঠন ক'রে মহান চন্দ্রগুপ্ত ভারতে জাতি সৃষ্টি করতে পারেন নি। তিনি শুধু এমন এক রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা কেন্দ্রীয়করণ করেছিলেন যার ভিত্তিতে ভারতীয় জাতীয়তা গড়ে উঠে নিজেকে চিনতে পারে। তিনি ভাবেননি যে, যে ভারতীয় ঐক্যের বীজ তাঁর সিংহাসন দৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করবে, তার মূল তাঁর মধ্যে ছিল না, ছিল তাঁর রাজত্বে বিচরণকারী ঐ গেরুয়াবস্ত্রধারী ভিক্ষুকদের মধ্যে, যারা পাটলীপুত্রের তোরণে, পথে ঘুরে বেড়ায়। তবু সময় ছিল তাঁর অনুকূল। তিনি যা বুঝেছেন, তার চেয়ে ভাল গড়ে তুলেছেন। এই চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনে আরোহণের সময় থেকে ভারত গোপনে পরিণত হয়ে ওঠে। অশোকের রূপান্তরের পর সে নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়। মহান অশোকের মনে নিজের রাজ্যের ভৌগোলিক সীমা ও ঐক্য এবং জনসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলির মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে চেতনা সবচেয়ে স্পষ্ট ছিল। এসব বস্তু আমরা দেখতে পাই তাঁর আদেশের যথার্থ রাজকীয় বিন্যাসে রাস্তা, কূপ, হাসপাতাল ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক কাজের গভীর সামাজিক গুরুত্বে এবং সর্বোপরি আদেশপ্রচারে। ইনি ক্ষমতাগর্বিত স্বেচ্ছাচারী হয়ে গোপন আদেশে রাজ্যশাসন করছেন না, ইনি সম্রাট হয়ে জনগণের কাছে সকলকে বেঁধে রেখেছে যে চরম আইন তা প্রচার করেছেন। কোন রাজা এভাবে তাঁর প্রজাদের পরিষদে আহ্বান জানাননি। কোন পিতা এত গভীরভাবে সন্তানদের আত্মবিশ্বাসী ক'রে তোলেননি। অথচ পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের কাজ এবং অশোকের নবীন বয়সে দীর্ঘ-অনুশোচিত কলিঙ্গ বা উড়িষ্যা বিজয়ে সমাপ্ত কাজ, এই যে, প্রকৃত জাতীয়তার

বিকাশ, যাতে ভারতীয় মানুষের সব জাতি ও শ্রেণী এক প্রেমময়, প্রিয় রাজার দ্বারা একত্র হয়েছে, সম্ভব হত না। অশোক যতটা ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যের কাছে ঋণী, ততটা ঋণী বুদ্ধের কাছে পাওয়া সেই অপূর্ব উপলব্ধির কাছে যার দ্বারা উচ্চ অথবা নীচ, আর্য বা অনার্য নির্বিশেষে মানুষকে বোঝায়।

কিন্তু কোন্ আধ্যাত্মিক ধারণার অন্তর্ভুক্ত ব'লে অশোক নিজেকে মনে করতেন, —এ প্রশ্ন এখানে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। নতুন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলে মানুষ প্রায়ই এভাবে আশেপাশের সব কিছুর প্রতি হৃদয়কে উন্মুক্ত করে না। গোষ্ঠীগুলি সাধারণতঃ অল্প মানুষের সঙ্গে আমাদের মিলিত করে, কিন্তু বহুজনের থেকে পৃথক করে। বৌদ্ধধর্ম যে ভারতে কোন গোষ্ঠী নয়, এ কথার এটিই হল অর্থ। এ ধর্ম ছিল এক বিরাট ব্যক্তিত্বের উপাসনা; এ হল মঠভিত্তিক ধর্ম। কিন্তু এটি গোষ্ঠী নয়। অশোক মনে করতেন তিনি সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীর সন্তান, সিংহাসনে বসলেও জনগণ তাঁর মন্দির।

তেমন আজকের দিনেও যে কোন সময়ে হিন্দুধর্মে কোন বড় সন্ন্যাসী দেখা দিতে পারেন, যাঁর পূর্ণাঙ্গ শিষ্যরা হবেন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী, আর তিনি অসংখ্য গৃহস্থের দ্বারা শিক্ষক বা গুরুরূপে সম্মানিত ও স্বীকৃত হবেন। খ্রীষ্টের জন্মের ...শো বছর আগে হিন্দুশিক্ষকরূপে বুদ্ধের স্মৃতি এ দিক দিয়ে আজকের শ্রীরাম-কৃষ্ণ বা সপ্তদশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রের রামদাসের থেকে পৃথক নয়। অবশ্য উল্লিখিত ...দুটি ক্ষেত্রে নাগরিক শিষ্য বা গৃহস্থ ভক্তদের উত্তরাধিকারের পটভূমিকা ছিল ...নির্দিষ্ট। হিন্দুধর্ম দীর্ঘকাল ধরে বাস্তব ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ, যদিও সে সত্য হয়ত ...অনুভূত ও নির্ধারিত, তবু এ ধর্মে নানা চরিত্রের প্রয়োজন মেটানোর মত বিভিন্ন ...ধর্মীয় মত রয়েছে এবং মহান সন্ন্যাসী গুরু সব কিছুর বাইরে রূপান্তরপরায়ণশীল ...আধ্যাত্মিক শক্তিরূপে বিরাজ করেন, তাঁর প্রভাব সকলের মধ্যে সমান অনুভূত হয়। রামদাস বা রামকৃষ্ণের গৃহী-ভক্ত হিন্দুই থাকে।

অবশ্য অশোকের যুগে হিন্দুধর্ম তখনও ঐক্যবদ্ধ রূপ পায় নি। এখন যাকে আমরা এই নামের দ্বারা জানি, তখন তাকে সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণদের ধর্ম ব'লে জানি। তার তত্ত্ব ছিল ঔপনিষদিক। তাঁর কুসংস্কার বৈদিক যুগ থেকে চলে এসেছে। একে যে সর্বব্যাপী বিশ্বাসে পরিণত করা যায়, তখনও সে ধারণা দেখা ... নি। এর সঙ্গে শিথিলভাবে জড়িয়ে ছিল সাপ, বসন্ত ও পৃথিবী পূজার বিশ্বাস, নিঃসন্দেহে জাতির নির্দিষ্ট মূল পার্থক্যের ক্ষেত্রে তা সত্য ছিল।

বৌদ্ধ যুগের সঙ্গে এ সব বদলে গেল। এখন এমন সময় এল যখন মানুষ ... পণ্ডিতদের কথায় বিশ্বাসকে মেনে নিতে পারল না। সকলের জন্য ধর্মকে সমানভাবে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হয়ে উঠতে হবে, জৈনরা যে দাবী করেছিল, বুদ্ধ ও মহাবীর একই গুরুর শিষ্য, তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। আমরা জানি, ...বেদান্তীয় যুগের বিপরীতে থাকে তার ধর্মমতগুলি, বেদের প্রামাণিকতা অস্বীকার

করতে গিয়ে জৈনধর্ম ভারতে প্রাচীনতম বিদ্রোহী ধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠিক এই ভাবে বৈদিক চিন্তায় সংশ্লিষ্ট প্রত্যাবর্তনের দ্বারা আমরা বৌদ্ধধর্মে জৈনধর্মের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার উপাদান দেখতে পাই। উপরন্তু বুদ্ধের ওপরে জৈনগুরুদের প্রভাব সম্পর্কে জৈন ধারণা গ্রহণ ক'রেই শুধু আমরা বুদ্ধের কপিলাবস্তু রাজগীর হয়ে বুদ্ধগয়া পর্যন্ত পথের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাই। তিনি প্রথম যান বিখ্যাত জৈনগুরুদের অঞ্চলে। আবার স্যার এডুইন আর্নল্ডের কাহিনীতে (সম্ভবতঃ 'ললিতবিস্তর' থেকে গৃহীত) যদি এতটুকুও সত্য থাকে যে, রাজগীরে তিনি ছাগবলিতে বাধা দিয়েছিলেন, তাহলে এ পরিস্থিতি ও ঘটনা স্বাভাবিক মনে হয়। তিনি নির্জনস্থানে যাওয়ার পথে শহর পেরিয়ে যান, পশুদের প্রতি করুণায় পূর্ণ এবং বলির চিন্তায় সঙ্কুচিত মন নিয়ে তিনি উপলব্ধি চেয়েছিলেন, সে যুগের চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য ছিল বলি, এটা ছিল যে জৈন সম্প্রদায়কে তিনি সবে ছেড়ে এসেছেন, তাদের অন্যতম প্রধান চিন্তা। এরকম পূর্ণ হৃদয় নিয়ে তিনি বলির পশুদের সম্মুখীন হলেন, তাদের সঙ্গে বিম্বিসারের প্রাসাদ-চত্বরে গিয়ে ওদের প্রাণের জন্য রাজাকে প্রার্থনা জানালেন, নিজের প্রাণ তার পরিবর্তে দিতে চাইলেন। এটা সত্য ঘটনা হোক বা না হোক, একথা ঠিক যে, সে যুগের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল, বৈদিক বলিপ্রথার প্রয়োজনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ; ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার যে উন্নতিতে এর ভিত্তিতে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা স্বাভাবিক মনে হয়, তা ছিল ঐ যুগের সবচেয়ে সূক্ষ্ম আবেগ। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস যে তার সত্য সম্বন্ধে ব্যক্তিগত উপলব্ধির ফল হতে পারে, এ ভাবধারা ভারতে এত প্রাচীন যে উপনিষদেই রয়েছে। কিন্তু এরকম উপলব্ধি যে সামাজিক হতে পারে, একে যে ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভিত্তি করা যায়, এ নীতি বোধ হয় জৈনরা প্রথম অনুধাবন করেছিল। নির্দিষ্টভাবে অনুভূত ও স্পষ্ট উপলব্ধ এই সিদ্ধান্ত এখন ভারতীয় চিন্তাধারার শক্তি ও নিশ্চয়তার কারণ। প্রত্যক্ষ উপলব্ধি যে প্রমাণের একমাত্র নিশ্চিত পদ্ধতি এবং সেই কারণে, সব বিশ্বাস যে যোগ্য ব্যক্তিদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির ওপরে নির্ভর করে, এ মত এখানে অপ্রতিরোধ্য, এবং একটা সমগ্র জাতির এরকম মনোভাব যে কিভাবে স্বতন্ত্র চিন্তাবিদ ও প্রতিভাবানের মনকে উন্নত করে, তা বোঝা সহজ।

একজন ধর্মীয় নেতা সঙ্গীদের ছেড়ে বেরিয়ে গিয়ে যারা তাঁর মতানুবর্তী তাদের নিয়ে নতুন গোষ্ঠী গড়ে তুললেন, পরে তা হল মানবাত্মার নতুন বাসস্থান, এরকম ঘটনার সঙ্গে জগৎ এত পরিচিত যে, এ রকম ঘটনা যখন অজানা ছিল, তখনকার কথা মানুষ ভাবতে পারে না। অবশ্য বেদ-উপনিষদের যুগে ভারতে এরকম দৃষ্ট দেখা যায় নি। সে যুগের ধর্মীয় গুরুরা অরণ্যের ফাঁকা জায়গায় নিভৃত জীবন যাপন করতেন এবং তাঁর চারদিকে কয়েকটি শিষ্য একত্র হয়ে গোষ্ঠী নয়, একটি মণ্ডলী গড়ে উঠত। বলির ভাবধারার বিরুদ্ধে আকস্মিক তীব্র বিদ্রোহ এবং মূক পশুদের রক্ষার জন্য করুণাকে কার্যকরী করার দৃঢ়তা নিয়ে জৈনধর্মই প্রথম ধর্মীয় মতবাদ, যে

ভারতের সামাজিক গোষ্ঠীগুলিকে সাহায্যের আহ্বান জানাল ; অন্যভাবে বলতে গেলে, এটিই প্রথম সংগঠিত গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়, এটির গঠনের মাধ্যমে গোষ্ঠীর ভাবধারা আবিষ্কৃত হল এবং অজৈনরা আর্য পুরোহিতদের চারদিকে কোনরকম ঐক্য নিজেদের সম্বন্ধ করতে লাগল। বুদ্ধ জৈনধর্ম থেকে তার নির্ভীক করুণা গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু মূক পশুদের রক্ষা করায় সন্তুষ্ট না হয়ে মানুষকেও বাঁচাবার কাজ করলেন, যে মানুষ অন্ধের মত জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘুরছে এবং প্রতি পদক্ষেপে নিজের চঞ্চল বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করছে। জৈনধর্ম ধর্মীয় গুরুর যে জীবন গড়ে তুলেছিল, তা তিনি সম্পূর্ণ বুঝেছিলেন, তবু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ যে মতবাদ তিনি প্রচার করেন, তা সব দিক দিয়ে উপনিষদের অরণ্য-আশ্রমে "ব্রাহ্মণদের ধর্ম" নামে পূর্বে ব্যাখ্যাত ধর্মের সদৃশ। বস্তুতঃ সেই যুগের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির বাস্তব রূপায়ণ এবং ঐ আশ্রমগুলির শান্তিপূর্ণ ও উন্নত ভাবধারায় ধীরে ধীরে পরিণতিই এবার প্রচারক বুদ্ধের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়াল। তিনি যা বললেন, তা লোকে অল্পস্বল্প জানত। এইভাবে উভয়ের কাছে গৃহীত ঋণের দ্বারা এই মহান সন্ন্যাসী সব মানুষকে আহ্বান জানালেন শ্রেষ্ঠ পথে প্রবেশের জন্য, আর্যদের ধর্মের মূল বের্দে আবিষ্কার ক'রে ঐ ধর্ম এবং বেদবিরোধী জৈনদের ধর্মের মাঝে সেতু গড়ে তুললেন।

নিকট অতীতের সঙ্গে এই ছিল বুদ্ধের সম্পর্ক, তিনি অবশ্য আপন বিশাল ব্যক্তিত্বে তা পেরিয়ে গিয়েছিলেন, ঢেকে ফেলেছিলেন। এরপর আমাদের দেখতে হবে, পরবর্তী প্রজন্মের ধর্মীয় ভাবধারায় তাঁর দ্বারা আনীত পরিবর্তন। বুদ্ধকে কোন গোষ্ঠীর প্রবর্তক না ভেবে একটি মঠসম্প্রদায়ের স্রষ্টা ভাবলে একথা বোঝা সহজ যে, তাঁর সামাজিক সংগঠন কখনও বহু বস্তুর যোগফল হতে পারে না। এমন সময় আসবেই, যখন এর শেষ হবে। তাঁর দলে আর নতুন সদস্য দেখা দেবে না। যাদের জীবনে তাঁর ভাবধারা বিকশিত হয়েছিল তারাই তাঁর সন্তান—যারা ব্যক্তিগতভাবে, স্বেচ্ছায় তাঁর ভাবধারা গ্রহণ করেছিল। তবু নিশ্চয় ওঁর এমন অনেক অনুরাগী ও শ্রাবক ছিল যারা সন্ন্যাসী হতে পারত না। বুদ্ধের গৃহীভক্তদের স্থান কোথায় ছিল? তাঁর নিজের জীবনে এরকম বহু লোকের আভাস আমরা পাই। তারা তাঁকে ভালবাসত। পরবর্তী জীবনযাত্রায় ও ভাবধারায় তারা অবশ্যই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত ও চালিত হয়েছিল। তবু তারা নিজেদের কর্তব্য ত্যাগ ক'রে ভিক্ষুকের জীবন গ্রহণ করতে পারে নি। তিনি ছিলেন যেন তাদের হৃদয়ের সম্রাট, রাজা। কিন্তু তিনি ওদের অধিনায়ক ছিলেন না, কারণ, ওরা তাঁর গোষ্ঠীর সদস্য ছিল না। সে স্থান ছিল সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের, এরা তা ছিল না।

গৃহীভক্তদের স্থান যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে, তারা ছিল বুদ্ধের ব্যক্তিগত ভাব-ধারার সম্পূর্ণ প্রভাবের প্রকাশ। যে আত্মা একবার গৌতমকে ভালবেসেছে বলিতে সন্তুষ্ট সহস্রচক্ষু ইন্দ্র আর তার স্বপ্ন হতে পারেন না। এখন ধ্যানের প্রশান্তি, জ্যোতি, শুভ্রতা, ঔদাসীন্য ও জ্ঞানকে মানুষের শ্রেষ্ঠ শক্তি বলে দেখা হল। অবিরাম নতুন

ভক্তদের দ্বারা সমর্থিত এই নব উপলব্ধি তার বিরাট কাজ ক'রে যাবে, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে নয়, তার বাইরে অন্য কোন মতকে পরিবর্তনের মাধ্যমে। সন্ন্যাসের সচেতন লক্ষ্য হবে তার পবিত্রতা, সত্য ও উৎসাহের মূল অবস্থা বজায় রাখা। বাহ্যিক জগতের অচেতন লক্ষ্য হবে তার মধ্যে ,যত আদর্শের স্রোত আসবে, যে একের মধ্যে সব মানুষের উচ্চাশা পূর্ণ হয়, তাঁর স্ব-প্রকাশের অধিকতর অভিব্যক্তিকে গ্রহণ করা। এই যুক্তি থেকে আমরা দেখতে পাই যে, সন্ন্যাস একদিন না একদিন ভারতে লুপ্ত হয়ে যাবেই, শুধু দার্শনিক শূন্যতা ও নতুন বুদ্ধের অভাবের কারণে। কিন্তু এর বাইরের বিশ্বাসের ওপরে এর প্রভাব ক্রমশঃ গভীর ও তীব্র হয়ে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হয়।

আমরা দেখেছি, সে বিশ্বাস সংখ্যায় তিনটি—(১) জৈন ; (২) আর্য—বৈদিক এবং (৩) জনপ্রিয় অসংগঠিত বিশ্বাস। অতএব দেখা যাবে যে, গৃহী ভক্ত স্বভাবতই কোন না কোন গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখেছি, এর আগে জৈনধর্ম একটা শক্তিরূপে কাজ করছিল আর্যবৈদিক এবং জনপ্রিয় অসংগঠিত বিশ্বাসকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য, এইভাবে বস্তুতঃ সে, পরে যা হিন্দুধর্ম হয়ে উঠবে তার বিবর্তনে প্রথম প্রেরণা দিয়েছে এবং মানুষকে উন্নত করার জন্য বৌদ্ধধর্মের প্রবল আগ্রহ এই পদ্ধতিকে অনেক তীব্র করেছিল। তবু বৌদ্ধ ভাবধারার এই প্রভাব হিন্দুধর্মে যথেষ্ট স্পষ্ট হয়ে ওঠার আগে সে যুগে অনেক সময় ছিল এবং সে যুগ যখন সম্পূর্ণ হল, তখন এর উদ্ভবকে আকস্মিক বলে মনে করা যায়।

আমার নিজস্ব মত হল যে, জাতীয় জীবনে হঠাৎ শিব বা মহাদেবের প্রাধান্য-লাভের মধ্যে এই প্রভাব নিজেকে স্পষ্ট ক'রে তোলে। শিব-মূর্তির বিবর্তন অনুসরণ করতে গিয়ে আমার মনে হয়, আমরা স্তূপে এর উদ্ভব অনুমান ক'রে নিতে বাধ্য হই। অনুরূপভাবে, বৈদিক রুদ্রের আধুনিক মহাদেবে ক্রমান্বয়ে বাস্তব রূপগ্রহণে জাতীয় কল্পনায় বুদ্ধের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মানুষ আত্মা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ যা ভাবতে পারে এখন, তা হল নিশ্চল ধ্যান, নির্মল জ্ঞান, অতল করুণা। কেন ? আর কোন কারণে নয়, শুধু এইজন্য যে, বুদ্ধ নির্বাণলাভের পর চল্লিশ বছর ধরে ঘুরেছেন এবং তাঁর পদচিহ্ন ভারতে কোনমতে মরতে পারে না। বোম্বাই উপসাগরে এলিফ্যান্ট গুহা শিব-পূজার মন্দির। উপরন্তু সেখানে শুধু অল্পবিস্তর আধুনিক শিবের প্রতীকই নেই, বহু মূর্তিও ছিল। এই সবগুলির চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ হ'ল প্রবেশ-পথের বাঁদিকে শিবের অন্নক্ষোদিত মূর্তি, পরণে রুদ্রাক্ষ ও বাঘছাল, ধ্যানে উপবিষ্ট। ইনি শিব ; ইনি বুদ্ধ নন। কিন্তু রূপান্তরকালের শিব, তাই অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

তাহ'লে হিন্দুর ঈশ্বরসংক্রান্ত প্রধান ধারণারূপে শিবের উদ্ভবের আগে শত শত বছর ধরে অনুরাগী ভক্তরা বুদ্ধকে ভালবেসেছে, বিশেষ ভক্তি নিয়ে সাধুকে ভিক্ষা দিতে ছুটে গেছে, একমুহূর্তের জন্যও তাদের সন্দেহ হয় নি যে, তাদের বিশ্বাস স্বীকৃত আর্য-বৈদিক গার্হস্থ্য বিশ্বাস। পার্বত্য ঝর্ণার নীচের বিরাট শক্তির ওপরে কম নির্ভরতা ; সাপ ও অরণ্যের রহস্য সম্বন্ধে কম চেতনা ; মুক্ত-আত্মা, সাধু, ত্যাগের

ভাবধারা সম্বন্ধে চিরগভীর শ্রদ্ধা, এ সব সম্বন্ধে লোকে সচেতন হয়েছিল। তবু কেন্দ্রের এই সূক্ষ্ম পরিবর্তনে ইতিহাস রচিত হচ্ছিল; নতুন যুগ জন্ম নিতে চলেছিল। সত্যই ৫০০ খ্রীঃ পূঃ এবং ২০০ খ্রীঃ বা ঐ সময়ের মধ্যে সে ছিল ভারতে মহৎ যুগ। কারণ, জাতীয় প্রতিভা নিজের পথে চলেছিল এবং দেশের প্রতি গৃহে যা স্বপ্ন, তা স্বপ্নতর হচ্ছিল, বাস্তব এবং আন্তর্জাতিক যা, তা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সম্ভবতঃ সেই যুগে বৌদ্ধ সূত্রের অনুকরণে গীত রচিত হচ্ছিল। যদি সত্য হয়, তাহ'লে শুধু এই তথ্য আমাদের সেই যুগের মহৎ চিন্তা সংক্রান্ত ব্যস্ততার কিছু ইঙ্গিত দেবে।

"যে তুমি স্বয়ং জ্ঞান,
পবিত্র, মুক্ত, চিরদ্রষ্টা,
সব চিন্ত', সব গুণের অতীত,
হে সত্য গুরু সেই তোমাকে
শুধু জানাই আমার প্রণাম।
শিব গুরু! শিব গুরু! শিব গুরু।"

উপনিষদ থেকে হুবহু উদ্ধৃত এই কথাগুলিকে হিন্দুধর্ম গঠনের প্রথম যুগের মূল সুর ব'লে ধরা যায়। এখন থেকে জাতীয় বিশ্বাস বৈদিক স্তম্ভের গায়ে বিরাট সাদা শঙ্খের মত জড়িয়ে থাকবে। এই সময়ে ব্রাহ্মণদের বিশ্বাসের ধর্মীয় ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁরা এবং অন্যরা অস্পষ্ট অথচ সুবিধাজনকভাবে ব্রহ্মা বলে উল্লেখ করতেন। এই ঈশ্বরের কাছে বলি দেওয়া হত। কিন্তু বুদ্ধের উপস্থিতিতে এবং তাঁর স্মৃতিতে এক নতুন, মহত্তর চেতনা দেখা দিতে শুরু করল; যত সময় যেতে লাগল তত এই মহত্তর চেতনা শিব বা মহাদেবের নাম-রূপ গ্রহণ করল। এইভাবে হিন্দুধর্মের জন্ম হল মতবাদরূপে নয়, ভাবধারারূপে, সে ভাবধারা তার প্রগতিশীল উন্নতির পথে যে-যে যুগ পেরিয়ে গেছে, সে যুগের বৈশিষ্ট্যকে গ্রহণ করতে পেরেছে।

তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে, বলতে গেলে ভারতে বুদ্ধভক্তির উত্তরাধিকারী একদিকে জৈনরা, অন্যদিকে শৈব হিন্দুরা। এই দুটি সম্প্রদায়ের সন্তানরা যেন বুদ্ধের ছায়ায় জন্মেছে। এরই সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমরা দেখি, পরে শৈব ও জৈনধর্ম বৌদ্ধ ইতিহাসের বারাণসী ও রাজগীরের মত জায়গা নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিয়েছে।

ভারতে জৈনধর্মের কাজ বা ভারতীয় ইতিহাসে জৈনধর্মের স্থান সম্পর্কে বিশদ বিবেচনা করার মত জৈনধর্ম সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। এখন বাইরের পৃথিবীর কাছে এ ধর্ম মূক প্রাণীদের প্রতি দয়া ও সন্ন্যাসীদের অনুরাগের ধর্ম বলে মনে হয়। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, "এ ধর্ম ভারতকে তীর্থস্থানের মন্দিরে ছেয়ে ফেলেছে" এবং সত্যিই ভ্রমণের সময়ে অতীত ইতিহাসে এ ধর্মের অবিরাম পুনরাবর্তনশীল স্থান দেখলে লোকে বারবার অবাক হয়। যেমন শোনা যায়, ১৫শ শতাব্দীর প্রথমদিকে চিতোরের রাণা কুম্ভ জৈন ছিলেন। অন্ততঃ তিনি বা ঐ যুগের আর কোন রাজা নিশ্চয় একটি জৈন মন্দির করিয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে মনে হয়, বীরদের কাছে

বিশ্বাসের আবেদন ছিল। কিন্তু এই আবেদনের উপাদান থেকে অথবা সমগ্র বিশ্বাসের ক্রমোন্নতির ইতিহাস থেকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করার মত কিছু শেখা কঠিন। আমার প্রায়ই সন্দেহ হয়েছে, এক সময়ে জৈনধর্মে বুদ্ধপূজার নির্দিষ্ট স্থান ছিল, ফলে লোকের মনে হবে, হঠাৎ বুদ্ধের প্রতি আবিষ্কৃত ভালবাসা। উদ্দেশ্য হল, তার ও তার পরিবারকে জৈন গোষ্ঠিতে গ্রহণ করা। রাজগীরের সোন ভাণ্ডার গুহায় সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একটা পুরনো চতুষ্কোণ স্তূপ আছে, তাতে চারটি প্যানেলে বুদ্ধকে জৈন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখানো হয়েছে। খ্রীস্ট যুগের পক্ষে স্বাভাবিক, স্তূপের চূড় ক্ষতি সত্বেও মনে হয়—শিশু যে ভাবে পা ফাঁক করা মানুষের ছবি আঁকে, সেইভাবে দণ্ডায়মান মূর্তির অদ্ভুতত্ব কিছুটা প্রাচীন। মূর্তিটি নগ্ন। এর থেকে বোঝা যায়, এটি জৈন বা জৈন-ধাঁচের। বস্তুতঃ, এ তথ্য থেকে প্রমাণ হয় যে, ও মূর্তি বুদ্ধের নয়, জৈন গুরুদের একজনের। কিন্তু উপস্থাপনের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিক্ হল মূর্তিতে মহান শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের প্রতিধ্বনিময় রূপ; প্রত্যেক প্যানেলের শীর্ষ ও পার্শ্বদেশ থেকে গাছের ডালপালায় অর্ধেক ঢাকা হাত বেরিয়ে আছে, যেন বলতে চায়, "মানুষকে দেখ!" লোকে যা ভাবে, তাই যদি হয়, অর্থাৎ যদি মূর্তিটি বুদ্ধের হয়, তাহ'লে স্পষ্টতঃ এমন এক সম্প্রদায়ের সদস্যের করা, যে সম্প্রদায়ে তাঁর স্মৃতি তখনও স্পষ্ট। এ মূর্তি যদি বুদ্ধের না হয়, তাহলে এর থেকে এমন এক ভালবাসা ও বিশ্বাস প্রকাশ পাচ্ছে, যা একটি সমগ্র ধর্মের ভিত্তি।

গুপ্তসাম্রাজ্যে বৈষ্ণবধর্মের উত্থান

বহুরকম বৈষ্ণবধর্ম রয়েছে, এ বিষয়ে যেকোন যথাযথ ইতিহাসে সবগুলির বিবরণ সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। শেষ থেকে শুরু করা যাক, পঞ্চদশ শতাব্দীতে চৈতন্যের আন্দোলন থেকে। মনে হয়, এ আন্দোলন যেন উন্মত্ততার মত বাংলাদেশকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানে তা গিয়েছে, উঁচু নীচু সকলকে সমানভাবে আচ্ছন্ন করেছে। এ আন্দোলন প্রবলতম বিদ্যাকে অধিকার করেছে, অথচ সেই সঙ্গে অতি মূর্খ ও অস্পৃশ্যদের হৃদয়েও প্রবেশ করেছে। বৌদ্ধধর্মের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাকে আলিঙ্গন ক'রে পরিবর্তিত করেছে। এ আন্দোলন বৃন্দাবনকে ভক্তির মহান পীঠ, পবিত্রতম তীর্থ এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আশ্রমরূপে প্রতিষ্ঠা করেছে। পরিশেষে এ বাংলার বাইরে নতুন ধরনের স্থাপত্য সৃষ্টি করেছে, বাংলার সীমানার মধ্যে তার চাপে গড়ে উঠেছে মহৎ মাতৃভাষা। তবু চৈতন্য ও নিত্যানন্দ একে যে রূপ দিয়েছিলেন, তা যতটা সর্বভারতীয় আন্দোলন, তার চেয়ে বেশী বঙ্গদেশীয়। এর কেন্দ্র ছিল রাধা-কৃষ্ণ এবং গোপীদের কাহিনী। ভারতের বাকী অংশে সমসাময়িক আন্দোলন প্রধানরূপে বেছে নিয়েছে কখনও এই উপাদান, কখনও প্রাচীনতর বৈষ্ণব ধর্মের উপাদানকে। কখনও আঁকড়ে ধরেছে সীতারামকে, কখনও জড়িয়ে ধরেছে অন্য কোন ভিত্তিকে। শেষে পূজার বেদীতে বসিয়েছে লক্ষ্মী-নারায়ণকে।

সমগ্র মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা হয়। বদ্রীনারায়ণের মন্দিরময় উপত্যকায় আমরা লক্ষ্মী-নারায়ণকে দেখি। হরিদ্বার থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত পথে প্রাচীনতর সত্যনারায়ণের সঙ্গে শিখরের দ্বন্দ্ব হয়েছে দখল নিয়ে। কিন্তু মধ্যযুগীয় পুনর্জাগরণের সাম্প্রতিক ঢেউ শ্রীনগর থেকে বদ্রীর তীর্থস্থানগুলিকে অধিকার করেছে।

প্রাচীনতর বৈষ্ণবধর্মে কি লক্ষ্মী ছিলেন? যদি না থাকেন, তাহলে এই মধ্যযুগীয় পুনর্জাগরণে তিনি অন্তর্ভুক্ত হলেন কি ক'রে? এই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে রয়েছে হাজার বছরের সামাজিক ইতিহাস। আধুনিক বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের বিশদ আলোচনা এবং তাদের বিশ্বাস, প্রথা, রীতিনীতির তুলনার দ্বারা এ উত্তর একমাত্র নির্ধারিত হতে পারে। এই ধর্মীয় সংরক্ষণের দেশে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এর উন্নতির সমগ্র কাহিনী বিশ্বাসের ললাটে লেখা আছে, প্রথম শিক্ষিত দৃষ্টি তার পাঠোদ্ধার করবে। এটাও আমরা ধরে নিতে পারি যে, মূল ভাবধারার প্রতিটি স্তর ও রূপের নিজস্ব ইতিহাস ছিল, তা খুব সম্ভবতঃ ঐ রূপের মধ্যে প্রয়োজনীয় প্রথারূপে সংরক্ষিত হত। যা বেঁচে আছে, তার কোনটাই আকস্মিক নয়; শূন্যতা থেকে বা অন্যদের চেয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকার ইচ্ছা থেকে শুধু কিছু সৃষ্ট হয় না। ওভাবে জাত ভাবধারা তখনই নষ্ট হয়ে যায়। আজকে বৈষ্ণবধর্মের সমগ্র রূপ হল, তার ইতিহাসের দ্বারা সৃষ্ট রূপ।

একটা ব্যাপার কিছুটা রহস্যময়। রাজপুতানী মীরাবাঈ-এর ভক্তি এত বাঙালী ধরনের কেন? তিনি কৃষ্ণের প্রেমে মগ্ন। তাঁর সব পথের পরিণতি বৃন্দাবনে। মধ্যযুগে এক বিশেষ দৃঢ় বন্ধনে রাজপুতানা ও বাংলা আবদ্ধ ছিল। এটা দেখা যায়, মুসলমানদের হাত থেকে গয়া উদ্ধার করার জন্য রাজপুত রাজপুত্রদের উদ্বেগ। বৈষ্ণব-ধর্মের ইতিহাসে যদি একদিকে বাংলাও অন্যান্য প্রদেশে তার পার্থক্যের কারণ না থাকে এবং অন্যদিকে মীরাবাঈ-এর চৈতন্য দেবসুলভ ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যা না থাকে, তাহ'লে কোন ইতিহাস সম্পূর্ণ হতে পারে না।

ভারতীয় চেতনায় এই মধ্যযুগীয় পুর্নজাগরণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জনগণ ও স্ত্রীলোকের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বলিষ্ঠ আন্দোলন। মানুষের ধর্মীয় যোগ্যতা যে যতটা স্ত্রীলোকের, ততটা পুরুষের; আত্মিক জীবনের জন্য গার্হস্থ্য জীবন ত্যাগ করার অধিকার যে পুরুষের মত স্ত্রীরও আছে—এই সব বিশ্বাস এই যুগে বৈষ্ণব উপাসনার কেন্দ্ররূপে নারায়ণের পাশে লক্ষ্মীকে বসিয়েছে। আরও হতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম থেকে বৈষ্ণবধর্ম কর্তৃক গৃহীত উত্তরাধিকারের এটা অংশ। খড়দহতে সম্মেলনে নিত্যানন্দ যে তেরোশো স্ত্রীলোক ও বারোশো পুরুষকে অভ্যর্থনা করেছিলেন, তার আদৌ কোন পূর্বসূরী বা তুলনীয় ঘটনা ছিল না, এ হতে পারে না। ওরা সব দুর্দশা সত্ত্বেও ধর্মীয় জীবনে পুরুষের সঙ্গে মেয়েদের সমান অংশগ্রহণের অধিকার সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় পোষণ করত। যদি এ কথা সত্য হয় যে, ওরা প্রাচীন বৌদ্ধ

সন্ন্যাসীর প্রতিনিধি, নিজের ইতিহাস ভুলে ওরা নিজেরাই ধাঁধায় পড়েছিল, চারদিকের হিন্দুধর্মীয় সমন্বয়ে এর প্রচলিত রূপ না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়েছিল, তাহলে দেখা যাচ্ছে, মেয়েদের ধর্মীয় অধিকার-সংক্রান্ত এই ভাবধারা ভারতীয় মনে প্রাচীন ও গভীরভাবে প্রোথিত।

মনে হয়, মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ঘটেছিল দক্ষিণে রামানুজ ও মধ্বাচার্যের মত মহান শিক্ষকের মাধ্যমে। হিমালয় অঞ্চলে এ ধর্ম উত্তর ও দক্ষিণের সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য নবীকরণ ঘটায়। কেদারনাথ ও বদ্রীনারায়ণ, উভয়ক্ষেত্রেই মহান্ত বা রাউল আনতে হয় মাদ্রাজ থেকে, এ নিয়ম শঙ্করাচার্যের সময় থেকে শুরু হলেও নিশ্চয় পরে তা জোরালো হয়েছে। দ্রাবিড়দেশের বৈষ্ণব-বেদীতে এবং গয়ায় নারায়ণ প্রধানতঃ একাই রাজত্ব করেন। তার অর্থ হল, তিনি বদ্রীনারায়ণ বা বৈষ্ণব মতবাদের মহারাষ্ট্রীয় শ্রেণীর চেয়েও প্রাচীন। এ কথা সত্য। প্রচারধর্মী দেশে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রচার সম্পূর্ণ ব্যাপ্তি লাভ করে। এইভাবে হিন্দুধর্মের একটি স্তর ব্রহ্ম ও সিংহলে জাতীয় ধর্ম হয়ে উঠেছে। ঐ ধর্মের জন্মভূমিতে এক বিশাল বৈচিত্র্যের মধ্যে তা একটি উপাদানমাত্র হয়ে রয়েছে। তাহলে প্রাচীনতর বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের দক্ষিণে যেতে হবে। কোন্ পটভূমিকা থেকে রামানুজের উদ্ভব হয়েছিল, শঙ্করাচার্যের মায়ের মৃত্যুশয্যার অপূর্ব কাহিনীটি যদি পরবর্তী বৈষ্ণব ধর্মীয় প্রক্ষেপ না হয়, তাহলে কোন্ স্বর্গ তিনি কামনা করেছিলেন জানতে হলে দক্ষিণের ধর্মীয় সংগঠন ও মন্দিরের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করতে হবে।

দক্ষিণের বৈষ্ণবধর্ম হল গুপ্তসাম্রাজ্যের বৈষ্ণবধর্ম। মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে সর্বত্র এই বৈষ্ণব ধর্ম ছড়িয়ে পড়েছিল। দক্ষিণের গ্রামে পাণ্ডবলীলা আর উত্তরের তীর্থে পাণ্ডব কিংবদন্তী একই সময়ের উৎস থেকে উদ্ভূত। দুটিই যে সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত তার প্রসার ঘটেছিল চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে পরবর্তী পাটলীপুত্র সাম্রাজ্যের অধীনে।* শুধু দক্ষিণে এমন সব মন্দির পাই সেখানে কৃষ্ণের পার্থসারথি, অর্জুনের সারথি মূর্তিতে পূজা হয়, কারণ আজ পর্যন্ত একমাত্র দক্ষিণে খাঁটি গুপ্ত প্রভাব প্রবলভাবে রয়েছে। দক্ষিণে নারায়ণের মূর্তি হল প্রাচীন মগধের নারায়ণ— যাকে বলা হত সত্যনারায়ণ। এই নারায়ণকেই স্কন্দগুপ্ত ৪৬০ খ্রীস্টাব্দে ভিতারি লাতে চূড়ায় স্থাপন করেছিলেন পিতার শ্রাদ্ধ-স্মরণ এবং হূণদের পরাজয় উদ্‌যাপনের দ্বৈত উদ্দেশ্য নিয়ে। মনে হয়, বাংলায় পাল বংশের অধীনে যখন গৌড় রাজধানী হয়, তখন এই নারায়ণই সর্বত্র ক্ষোদিত হত।

ভিতারি লাতের অমূল্য শিলালিপিতে রয়েছে, "কৃষ্ণ যেমন শশব্যস্তে দেবকীর

---

*পাঠকদের মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, ইংরাজীতে চতুর্থ শতাব্দী হল ৩০০ থেকে ৪০০ খ্রীঃ, পঞ্চম ৪০০ থেকে ৫০০ খ্রীঃ ইত্যাদি।

কাছে গিয়েছিলেন," শত্রুদের পরাজয়ের সংবাদ নিয়ে স্কন্দগুপ্ত সেইভাবে মায়ের কাছে গিয়েছিলেন।

জাতীয় মহাকাব্যে বহুবার কৃষ্ণকে "পুতনাঘাতক" বলে সম্বোধন করা হয়েছে, এতে বোঝা যায়, এই শিলালিপির অনুরূপভাবে যে, মহাভারতীয় বৈষ্ণবধর্ম কেন্দ্রীয় চরিত্ররূপে ভগবদ্ গীতার কৃষ্ণের ওপরে প্রধানতঃ নির্ভর করলেও তার উদ্দেশ্য ছিল গোকুল ও মথুরার কাহিনীকে গ্রহণ ও সমর্থন করা। এই বিরাট কাহিনীর মূল কেন্দ্রে কতটা বৃন্দাবনের ঘটনা থাকতে পারে, তা নির্ধারণ করবেন ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচকরা। হরিবংশ, বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণের সংশ্লিষ্ট যুগের মধ্যে এই রহস্য বিধৃত রয়েছে। শিশু কৃষ্ণ যে সর্বদা দৈত্য হত্যা করতেন, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হতে পারি। তাঁর এই দিকটি সবচেয়ে বড়। দৈত্য হত্যার মাধ্যমেই কি সর্বদা স্বর্গীয় সত্তাদের চেনা যায় না? তাঁদের ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে ধারণা আমাদের মনে দৃঢ় হলে তবে তাঁদের বাণী ও গানের প্রতি আমরা দৃষ্টি দিতে পারি।

মহান্ শিক্ষা ও বিশ্বাসের ভিত্তিগুলি সম্পর্কে সাধারণ ধারণার যুগে পাটলীপুত্রকে দেখাতে হয়েছিল যে, উপনিষদের মহৎ সত্যকে প্রকাশ ও জনপ্রিয় করার মত ধর্ম শুধু শৈব মতবাদই নয়। যে শিশু যমুনাতীরে রাখালদের মধ্যে থাকত, সে রাজকীয় হিন্দু বংশ থেকে উদ্ভূত এবং তাঁর সম্বন্ধে বলা হত যে, অবর-দখলকারী নিহত হওয়া মাত্র দেবকী ও বসুদেব ঐ শিশুকে বেদশিক্ষার জন্য পাঠিয়েছিলেন।* যে বিশাল ব্যক্তিত্ব কুরুক্ষেত্রের শীর্ষে বিরাজমান, যাঁর ব্যাখ্যাত তত্ত্বগুলি ৪০০ খ্রীস্টাব্দে সারা ভারত ধর্মের ভিত্তি বলে জানত, তিনি এইভাবে নিজের মধ্যে ভারতীয় শিবের ঈশ্বরত্ব, গ্রীক হেরাক্লিসের শক্তি, ইহুদী খ্রীস্টের সরলতা, বুদ্ধের করুণা এবং উপনিষদের যে-কোন শিক্ষকের শান্ত গাম্ভীর্য ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। যে সব মহান সত্য তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, পাটলীপুত্রের গুপ্তদের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাভারত বর্তমান রূপপ্রাপ্ত করার যুগে তা ছড়িয়ে ছিল আকাশে-বাতাসে। স্বর্গীয় অবতার যে ব্যক্তিগত সংযম ও মুক্তির সমগ্র ধারণাটির বাণী-রূপ দেবেন, এটার খুব দরকার ছিল, বর্তমান ক্ষেত্রে ঐ রূপদান থেকে ভগবদ্গীতার উদ্ভব হয়েছে। নতুন বিশ্বাসের পটভূমিকা-স্বরূপ যে নিশ্চল শক্তি দেখা দিয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় এতে যে, তখন থেকে হিন্দু-বিবাহ সিদ্ধ হওয়ার জন্য বিষ্ণুর প্রতীকরূপে শালগ্রামের প্রয়োজন হল।

এই গুপ্তযুগীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্রোত জীবনের বহু পূর্বপরিচিত উপাদানকে তুলে ধরে পুনর্বার ব্যাখ্যা করল। যে নারায়ণ মূর্তিকে সে গ্রহণ করল, তখন ভাস্কররা স্তূপের গায়ে যে মূর্তি তৈরিতে অভ্যস্ত হল, এ তারই স্বাভাবিক বিকাশ। এখনকার মত তখনও সাধারণ লোক পূজার জন্য যে রকম মাটির স্তূপ তৈরিতে দক্ষ ছিল, সেরকম তিনটি ছোট মাটির স্তূপকে নতুন আন্দোলনে ব্যাখ্যা করা হল জগন্নাথ, বিশ্বের প্রভু বলে। তখন প্রচলিত পবিত্র পদচিহ্নের উপাসনারও এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া হল।

*বিষ্ণু, হরিবংশ ও ভাগবত পুরাণ দেখুন।

এতে আপন সমন্বয়ের ক্ষেত্রে বুদ্ধদেবকে নিঃসন্দেহে বিষ্ণুর দশম অবতার বলে গ্রহণ করা হল। বুদ্ধগয়া থেকে ব্রহ্মগয়াকে পৃথক ক'রে তার পবিত্রতাকে গ্রহণ করা ও বজায় রাখা হল। ওখানে এবং ঐ যুগের অন্যান্য সুপরিচিত তীর্থে মৃতের জন্য প্রার্থনা করার মত জটিল প্রথা দেখা দিল—সম্ভবতঃ চীনা ও তিব্বতী তীর্থযাত্রী ও ব্যবসায়ীদের প্রভাবে।

এ ধারণা আমাদের করার দরকার নেই যে, মহাভারত যখন প্রথম সম্পাদিত হয়, কৃষ্ণ আজকে আমাদের কাছে যতটা উজ্জ্বল তখনও তাই ছিলেন। আমাদের কাছে মহাভারত-নামধারী সমগ্র সংস্কৃতি-সমাহার প্রধানতঃ ভগবৎ-গীতার পটভূমিকা বলে মনে হয়। কিন্তু ওটি প্রথম প্রকাশের সময়ে এর সব অংশ প্রায় সমান আকর্ষণীয় ছিল। জাতীয় কল্পনায় ভীষ্ম, কর্ণ এবং পাণ্ডবদের সকলের নিজস্ব স্থান ও গরিমা ছিল। না, গাড়োয়ালের মন্দির ও বেদীর সম্পূর্ণ মানচিত্র থেকে বোঝা যাবে যে, যে কবিরা সামান্য অংশমাত্রও রচনা করেছিলেন—এবং ব্যাস, যিনি ঐ বিশাল রচনাকে একটি সমগ্র রূপ দান করেছিলেন—সকলকেই বিশেষ সম্মান ও উৎসাহের যোগ্য মনে করা হত।

ভাবীকালের ভারতীয় ধর্মের বস্ত্রবয়নের টানাপোড়েনে এইভাবে বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। আমরা ভাবি, এই যুগে যারা এত আগ্রহের সঙ্গে বিষ্ণুর অবতারের সামনে প্রণত হত, তাদের মনে শিবের স্থান কি ছিল? তিনি কি শুধু নাগেশ্বর বা নীলকণ্ঠ ছিলেন? তখন কি তিনি অর্ধনারী হয়েছিলেন? সম্ভবতঃ নয়; কারণ, তা যদি হত, তাহলে তখন যেমন লক্ষ্মী-বিহীন সত্যনারায়ণ তাঁর ওপরে স্থান পেয়েছিলেন, তা হতে পারত না। অথচ মাতৃ-আরাধনা যে কৃষ্ণপূজার চেয়ে প্রাচীনও তা বোঝা যায় দেবীপুরাণের এই যুক্তিতে যে, কৃষ্ণই দেবী। তখনও শিবের মহৎ চেতনাকে প্রভাবিত ক'রে তাঁকে মহাদেবে পরিণত করার জন্য শঙ্করাচার্যের বিরাট প্রতিভাও দেখা দেয় নি।

যে ধর্মীয় ভাবধারার গর্ভ থেকে কৃষ্ণের উদ্ভব হয়েছিল, তার এই প্রশ্নের বিষয়ে আমরা আশাপ্রদ আলোচনার ক্ষেত্র পাই। ঐশ্বরিক গোপবালকের নামকে কেন্দ্র ক'রে যে সব কাহিনী জড়ো হয়েছে, তার থেকে অনেক কিছু বুঝতে পারা যায়। তিনি সত্যই বিষ্ণুর অবতার কি না, দেখার জন্য ব্রহ্মা তাঁকে পরীক্ষা করেছেন। এখন স্পষ্ট বোঝা যায়, তখনও আর্য শ্রেণীদের মধ্যে স্রষ্টারূপী ব্রহ্মার ভাবধারা বেঁচেছিল, তখনও ত্রিমূর্তির মতবাদ প্রচলিত ছিল, কারণ ব্রহ্মা এই অনুমান করতে দেন যে, তিনি বিষ্ণুর সমান। কৃষ্ণ কালীয় নাগকে জয় ক'রে তার মাথায় আপন পদচিহ্ন রেখে যান। নাগেশ্বররূপী শিবের ব্যক্তিত্বে নতুন ভক্তিযুক্ত বিশ্বাস এবং সাপের প্রাচীন প্রচলিত উপাসনার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব, এখানে আমরা সেই একই দ্বন্দ্বের চিহ্ন পাই। তিনি রাখালদের ইন্দ্রপূজা ত্যাগে বাধ্য করান। এখানে সরাসরি তিনি প্রাচীনতর বৈদিক দেবতাদের অতিক্রম করেন, আজকে যেমন হিমালয়ের কয়েক জায়গায় দেখা

যায়, তখনও তেমন তাঁরা বোধ হয় ব্রহ্মার অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে কিছু জানতেন না। সমগ্র মহাভারতে শিব কৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের প্রমাণ দিয়েছেন, কিন্তু কৃষ্ণ এ জাতীয় একটি কথা শিবের সম্বন্ধে বলেন নি। তার অর্থ হল, শিবের ঈশ্বরত্ব সুপরিচিত ছিল, স্বীকৃত হয়েছিল, কবি ও শ্রোতাদের দ্বারা, কিন্তু কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব তখনও স্বীকৃতির আপেক্ষায় ছিল। আমরা দেখব, দক্ষিণের অনুষ্ঠানে ধর্মীয় মিছিল বৌদ্ধ চৈত্যের মত প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। এখানে আমরা এমন এক যুগের প্রামাণিক সংগঠনের কথা পড়ি, যখন ধর্মীয় কল্পনায় এরকম দৃশ্য যথেষ্ট ছাপ ফেলেছিল।

অতএব দেখা যাবে যে, ভারত যখন গোপনে গুপ্তদের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল এবং যখন বৌদ্ধধর্ম এত বেশী উন্নত ও পরিণত হয়েছিল যে, তার উদ্ভবের কাহিনী জনমানসে নির্দিষ্ট রূপ হারিয়ে ফেলছিল, তখন বৈষ্ণব ধর্মের ইতিহাসে এক বিরাট গঠনমূলক আন্দোলন চলছিল। এই যুগে সন্দেহাতীত সার্বভৌম প্রামাণিকতার অধীনে তত্ত্বের কৃষ্ণ, গীতার প্রবক্তা পার্থসারথি, গোকুলের গোপাল, জনপ্রিয় কৃষ্ণ এবং মথুরার বীরের মিলন ঘটেছিল। এই যুগেই এই মহান, দৃঢ় বিশ্বাস প্রচারের জন্য দক্ষিণে প্রচারক পাঠানো হয়েছিল এবং হিমালয় অঞ্চলে গাড়োয়াল ও কুমায়ুন প্রধানতঃ পাণ্ডব তীর্থের ভূমি হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণের কাহিনী ও ভাবধারার এই প্রতিষ্ঠা সব দিক্ থেকে মহাভারতের শেষ পুনর্লিখনের সঙ্গে জড়িত, মহাভারতের পুনর্লিখন আবার ৩৩০ থেকে ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত ও ২য় চন্দ্রগুপ্তের অধীনে একদল সরকারী কবির দ্বারা কৃত। আমরা এ তথ্য জানি যে, পরবর্তী গুপ্তরাজারা কৃষ্ণের অবতার মূর্তিতে নারায়ণের একান্ত ভক্ত ছিলেন, এই উপাসনায় দেবকীর-পুত্র কৃষ্ণ ও কংসের ঘাতক কৃষ্ণ এক হয়ে যান।

এখানেও ভারতীয় বৈষ্ণব ধর্মের কাহিনী ফুরোয় নি। মহাভারতের আগে রামায়ণ রচিত হয়। রাম যে প্রাচীন যুগের সৃষ্টি, সে যুগ মুখ্যতঃ শৈবধর্মী এবং কৃষ্ণের বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলি সম্পর্কে বেশী সচেতন। রামায়ণ রচনার আগে, এমন কি শৈবধর্মের উদ্ভবেরও আগে বিষ্ণুর প্রাচীনতর উপাসনা প্রচলিত ছিল। শিবের উন্নত ভাবধারার সঙ্গে যখন ত্রিমূর্তির ভাবধারা দেখা দিল, তখনই তার দ্বিতীয় মূর্তি করা হল বিষ্ণুকে। দেবতাদের সব তালিকায়—গণেশ, সূর্য, ইন্দ্র, ব্রহ্মা বা অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা—তাঁর নাম শিবের আগে রয়েছে। এই তথ্যের নিশ্চয় ইতিহাস আছে। সে ইতিহাস থেকে এসেছে বহু শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্ম, শঙ্করাচার্যের পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত হিন্দুধর্মের যুগে এই বৈষ্ণবধর্ম ছিল, জাতীয় বিশ্বাসের রজ্জুর দুটি সূত্রের একটি। প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের যুগ থেকে আমরা এক সংহত ভারতীয় বিশ্বাসের উন্নতি দেখতে পাই, যার বিকল্প দুটি স্তর হল শৈবধর্ম ও বৈষ্ণব ধর্ম। এক শতাব্দীর নীরবতার অর্থ হল কিছু ঘটনার পুনরুদ্ধার হয়ে তা নথিভুক্ত হয়েছে। শঙ্করাচার্য ও চৈতন্যের মধ্যে নিশ্চয় যোগসূত্র আছে; কারণ বস্তুর স্বভাবধর্মের এটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে, হিন্দু-উন্নতি নিয়মিতভাবে শৈব থেকে বৈষ্ণব-

ধর্মে এবং বৈষ্ণব থেকে শৈবধর্মে পরিবর্তিত হয়ে এগিয়ে যাবে এবং যুগস্রষ্টা অবতার বারবার জন্ম নেবেন।

প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য-বিদ্যা

ভারতীয় ভাষাগুলির সাহিত্যের ইতিহাস অনুসরণ করতে গেলে কেউ প্রথমে এই তথ্য দেখে বিস্মিত হবেন যে, সেগুলির বিষয়বস্তু তারা গ্রহণ করেছে প্রধানতঃ অন্য জায়গা থেকে, বাইরের কোন জায়গা থেকে। ঐ বইগুলি প্রতিধ্বনির মাধ্যম মাত্র, সৃষ্টির উৎস নয় মোটেই, তারা এমন কিছু প্রকাশ করেছে যা তারা আগে গ্রহণ করেছে। অবশ্য ভারতীয় সাহিত্যের একটা স্তর আছে—সামাজিক ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত গ্রাম্য এবং সাধারণ—সেটি জনগণের রুচির সঞ্চয়। এখানে জনগণের কল্পনার সাধারণ উদ্দেশ্য—প্রেম, ঘৃণা, ত্যাগ, সম্পদ, পুনর্মিলন, আধ্যাত্মিক শক্তির কৃপা, দুষ্টের সাময়িক জয়, সৎব্যক্তির অকারণ কষ্ট এবং "তারপর সকলের চিরসুখ"—এসব যথেচ্ছ রয়েছে, সব দেশে, সব যুগে যেমন থাকে। অবশ্য এই স্তরেরও প্রধান ভাগগুলি থেকে সেই যুগের নিজস্ব সাহিত্যের উচ্চতর ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্যের ছাপ পাওয়া যায়। সীতা যখন সাধারণ আদর্শরূপে দেখা দেন, তখন অত্যাচারিত সৌন্দর্যকে তার সততা সংক্রান্ত কমবেশি সন্দেহের অগ্নিপরীক্ষা পার হতে হয়; পুরুষের শক্তিকে যে পরীক্ষায় ফেলা হয়, তা সে-যুগের প্রচলিত নায়কদের সমধর্মী। প্রত্যেক পরবর্তী যুগে প্রভাবের তরঙ্গ গণতান্ত্রিক কাব্যের সমুদ্র দিয়ে যেন বয়ে যায়, তাতে বাহ্যিক শিক্ষাস্তরের অবনতি ঘটার সঙ্গে তার উপবিভাগের বৈশিষ্ট্য ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু নিশ্চিতরূপে তার প্রধান উন্নতি অবনতি নির্দিষ্ট হয়ে ওঠে।

এই সব প্রভাবের বৈশিষ্ট্য কি? তাদের প্রেরণার উৎস কি? কোথায় সেই কেন্দ্র, যার শাখাপ্রশাখারূপে বিভিন্ন প্রদেশের সাহিত্য দেখা দেয়? এমন কি কোন উৎস আছে সেখান থেকে সবাই একত্রে প্রেরণা সংগ্রহ করে? তাই যদি হয়, তাহ'লে সেটা কি এবং তাকে আমরা কোথায় খুঁজব?

এমন একটি শক্তি ও গতির উৎস নিশ্চয় আছে, যা যুগ যুগ ধরে ভারতীয় জনগণের সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনকে পথ দেখিয়েছে এবং রক্ষিত করেছে। সে উৎস পাওয়া যায় ব্রাহ্মণ জাতির প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে। এই হল সেই চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় সাহিত্যপরিষদ, যার থেকে নানা ভারতীয় ভাষা যেন পৃথক পৃথক গোষ্ঠীর মত জন্ম নিয়েছে। এখানে আমরা দেখি, একটি একক অবিরাম বিবর্তনের ধারা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নির্দিষ্ট বৈচিত্র্য ও রূপের পরিবর্তনসহ প্রত্যেক প্রদেশের জনগণের কাব্য ও সাহিত্য প্রতিফলিত হয়েছে।

বিশাল জাতীয় মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ সংস্কৃতে লেখা, আজ পর্যন্ত ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যতীত সকলের কাছে এই বই দুটি কাল্পনিক সাহিত্যের প্রতীক ও মান। কাহিনী সকলে জানে, গ্রাম্য নাটকে ও ঠাকুমাদের গল্পে চরিত্রগুলি

পরিচিত এবং ছোট থেকে বরাবর এদের উল্লেখ অবিরাম পাওয়া যায়। কিন্তু উদ্ধৃতি দেওয়া যায় শুধু সংস্কৃত ভাষায় এবং মধ্যযুগীয় শিক্ষার অপূর্ব রীতিসমেত তা সযত্নে আধুনিক ভাষায় আক্ষরিক অনুবাদ করতে হয়। বক্তার যে জাতিই হোক, এটাই নিয়ম, অবশ্য আমরা অন্য জাতির চেয়ে ব্রাহ্মণদের মুখ থেকেই এসব উদ্ধৃতি অনেক শুনতে পাই।

যে কোন একটি মহাকাব্য অন্য আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করা সাধারণতঃ সাহিত্যযুগের পরিচায়ক। এটা কখনও কাছাকাছি বা হুবহু অনুবাদ হয় না। শেক্সপিয়র ইংলণ্ডের ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেমন স্বাধীনতা গ্রহণ করেছিলেন, অনুবাদকও তাই করেন; এইসব বিভিন্ন অনুবাদকের মধ্যে থেকে ছয়-সাতটি বিখ্যাত নাম বেছে নিয়ে তার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের আদর্শের একটা ভারী আকর্ষণীয় তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর হিন্দী রামায়ণের লেখক তুলসীদাস উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলির লোকদের জীবনের অন্যতম উৎস। তিনি নিশ্চয় নিজেকে বাল্মীকির মহৎ কাব্যের আবৃত্তিকার বা ব্যাখ্যাকার মাত্র মনে করতেন, কিন্তু তিনি নিজের কাজ এমনভাবে ক'রে গেছেন যাতে তিনি এক মহৎ মৌলিক কবির পদ লাভ করেছেন।

কিন্তু যে কঠোর ব্রাহ্মণ্য বিদ্যা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিস্বরূপ ছিল, মহাভারত ও রামায়ণ এবং তার পরবর্তী সংস্কৃত কাব্যের ধারা তার অনুবর্তী হয় নি। ঐ প্রথার শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সবচেয়ে ভাল প্রকাশ পেয়েছে এই তথ্যে যে, কাব্য এবং কল্পনার ফসল স্বাধীনতা লাভ করেছে। ব্যাকরণ ও বৈদিক উচ্চারণ প্রসঙ্গে ছন্দ অলঙ্কারের নিয়ম পড়ানো হয়, কিন্তু জাতীয় গাথাগুলিকে অল্পবিস্তর জনপ্রিয় ও সহজ বলে মনে করা হয়, এগুলির চর্চার ভার থাকে ছাত্রের ব্যক্তিগত পাঠ বা পেশাদার গায়ক, কবি ও যাযাবর কথকদের গভীর পরিশ্রমের উপরে। পেশাদার ও অপেশাদার লেখকদের শ্রেণী থেকে সাহিত্যগুণসমন্বিত লেখার সৃষ্টি সংক্রান্ত সংখ্যা সম্বন্ধে ভারতে কি আকর্ষণীয় অনুসন্ধান চালানো যায়। অন্ততঃ এ সব লেখার জন্ম মহাকাব্য দুটি থেকে হয় নি, হয়েছে চিন্তা ও দর্শনের জগৎ থেকে, যে পরিবেশ এখনও বক্তা ও শ্রোতার মনকে প্রভাবিত ক'রে প্রকাশ পায় তার থেকে—এর দীপ্তিকে অত্যন্ত উজ্জ্বলরূপে জ্বালিয়ে রেখেছিলেন, পাণ্ডিত্যের ব্রাহ্মণ্য সংগঠন।

আমরা এ সত্য যথেষ্ট উপলব্ধি করিনা যে, মধ্যযুগীয় হিন্দু ভারত গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক কেন্দ্রের বদলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির চারদিকে। গৌড় ও রংপুরের রাজধানী রূপের পতন হওয়ার পর বাঙালী জীবন ও চিন্তার ক্ষেত্রে বরাবর প্রধান নামগুলি ছিল বিক্রমপুর, নদীয়া ও মিথিলা। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ ছিল প্রশাসন ও অর্থের কেন্দ্র। কিন্তু বুদ্ধিগত ও আত্মিক শক্তির উৎসের জন্য মানুষ নির্ভর করত নবাবদের সিংহাসনের উপরে নয়, সংস্কৃত বিদ্যার পীঠস্থানের উপরে। এমন কি, ইসলাম ধর্মকেও নিজেদের বিদ্যার কেন্দ্র গড়ে তুলতে হয়েছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিপুল

কৃতিত্ব অধিকার করার ইচ্ছায় সে জৌনপুর দখল করেছিল, আজও ঐ শহর ঐস্লামিক ভারতের ধর্মীয় বিদ্যার উৎস। দীর্ঘদিনের বৌদ্ধ ইতিহাসযুক্ত বিক্রমপুর মাঝখানে সেনবংশের রাজধানীরূপে গুরুত্ব লাভ করেছিল, না হলে সেও বৈদেশিক সংস্কৃতির সম্মান লাভ করতে চাইত। আমাদের তাড়াতাড়ি ভাবা উচিত নয় যে, তাতে ক্ষতি হত। যে পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে পারসিকের জ্ঞান যুক্ত হয়েছিল তাদের মত নাগরিক বৈদগ্ধ্য ও সূক্ষ্মতা জগতে কচিৎ দেখা গেছে। এই চর্চার মূল উদ্দেশ্য ছিল বাস্তব মানুষ সৃষ্টি করা, অতএব ব্রাহ্মণ্য আদর্শের অতল গভীরতা ও কঠোরতার সঙ্গে তার কত পার্থক্য! কিন্তু নিজস্ব পথে এটি অত্যন্ত সুন্দর ও আনন্দদায়ক। জৌনপুরের বৃদ্ধ মৌলবীদের ফার্সি শিক্ষার ফলে মহৎ সাহিত্যের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন ঘটেছিল। ঐস্লামিক পণ্ডিত ও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের এইখানে মিল যে, দুজনেই মধ্যযুগীয়, দুজনেই মহৎ কাব্যের অনুরাগী শিক্ষার্থী। দারিদ্র্য যদি জ্ঞানলাভের সহায়ক হয়, তাহ'লে দুজনেই দরিদ্র হয়ে খুশী, দুজনেই একটা বই নিয়ে বহু বছর কাটিয়ে দিতে পারেন। কাব্যের অস্থিমজ্জায় তাঁদের হৃদয় ডুবে গেছে, প্রায়শঃ ওঁরা যে ছাত্রদল গড়ে তোলেন, তাদের রুচি অভ্রান্ত। যে হিন্দু সন্ন্যাসী জৌনপুরের বৃদ্ধ পণ্ডিতের কাছে শৈশবে ফার্সি শিখেছেন, তার মত পরিণত সাহিত্যবোধ আমি কোথাও দেখিনি। যে অল্প কয়েকজন পলিতকেশ মানুষ বারাণসী, পাটনা ও লক্ষ্মৌ-এর আশেপাশে থাকেন, তাঁরা যখন চলে যাবেন এবং তাঁদের শূন্য স্থানকে তাঁদের নতুন ধরনের সন্তানরা পূর্ণ করবে, তখন মানবজাতি অবশ্যই দরিদ্রতর হবে।

অতীতে প্রত্যেক হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু-না-কিছু নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ছিল। তাই বেদ আবৃত্তিতে দাক্ষিণাত্য ছিল বিখ্যাত। এখনও কুম্ভকোণমের বিরাট মন্দিরে ভোরবেলা দূরে তরুণ, সজীব কণ্ঠে গায়কদলের প্রাচীন স্তোত্রপাঠ শুনলে মনে হয় প্রাচীন মিশরে রয়েছি। এই কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মনঃসংযোগে সমগ্র দক্ষিণী সমাজ সাহায্য করে। কারণ, ঋগ্বেদের আবৃত্তির সময়ে একটি অক্ষর বা উচ্চারণের ভ্রান্তি ঘটামাত্র সাধারণ লোককেও প্রবল বিরক্তি ও দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। এটা হয়ত ভদ্র আচরণ ব'লে মনে না হ'তে পারে, কিন্তু এতে পুনরাবৃত্তির ফলে ত্রুটিহীন উচ্চারণ দেখা দেয়। তেমন, বাংলাদেশে নদীয়া বিখ্যাত ছিল তার ন্যায়শাস্ত্রের জন্য। সাহিত্যের মত এখানেও স্বাধীনতার ফলে শ্রেষ্ঠ ফল পাওয়া যায়। খুব কম লোক সিদ্ধান্তের জন্য দীর্ঘদিন প্রথাগত পদ্ধতিতে বই পড়ে, তবু 'ঈশ্বর আছেন, প্রমাণ কর!' এ কথাটা সারা জগতের কাছে বিশ্বাসের শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হয়ে রয়েছে। মহারাষ্ট্রের নাসিক ও পাণ্ডারপুর—প্রত্যেকের নিজস্ব ক্ষেত্র ছিল। আর ব্যাকরণ, দর্শন এবং শাস্ত্র—সব মিলিয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল বারাণসী। এই স্বর্গীয় শহরের খ্যাতি এখনও চলে গেছে, বলা যায় না। এখনও পণ্ডিতদের বড় বড় গ্রন্থাগার রয়েছে। তাঁরা নিজেদের সঞ্চয় খুজে দিনের পর দিন শাস্ত্রের তুলনা করেন। পণ্ডিতদের

পরিশ্রমী বিদ্যালয় রয়েছে, প্রচণ্ড গরমে গানের মাধ্যমে ছাত্ররা কবিতা মুখস্থ করে। প্রাচীন জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ ভাবধারাগুলির জন্য গম্ভীর, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকরা রয়েছেন, যারা সত্যকে পাওয়ার জন্য সব ত্যাগ করতে চায়, তাদের তাঁরা খুশীমনে সব সন্দেহ দান করেন। এখনও ভারতের সব জায়গা থেকে সারা পথ হেঁটে দরিদ্র ছাত্ররা এখানে আসে। এখনও শীতের ভোরবেলা দেখা যায়, ছাত্ররা রাত থাকতে উঠে কোন অন্ধকার কোণে বসে নিজের মনে চেঁচিয়ে পড়ছে। অন্ততঃ বারো বছর সে এরকম পড়বে, তারপর বলা হবে, ঐ বই-এর জ্ঞান সে লাভ করেছে এবং বাইরের জগতে ঐ জ্ঞান ব্যবহারের সে যোগ্য। কিন্তু ততদিনে ঐ বিষয়বস্তু তার মনের গভীরে প্রবেশ করেছে, বিলাসিতা ও আলস্যের প্রলোভন আর তাকে আকৃষ্ট করবে না।

কিন্তু প্রধানতঃ শতগ্রামসমন্বিত বিক্রমপুরের মত দূর জায়গার ছোট গ্রাম্য টোলেই ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা গড়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত অপরিণত ও অশিক্ষিতদের মহত্তর সন্ধানের পথে নিয়ে যাওয়া ও শিক্ষাদানের সমস্যার সমাধান এখানেই হয়। যখন কোন ছাত্র টোলে আসে, তখন তার একটা নির্দিষ্ট বয়স থাকে, পনেরো থেকে কুড়ির মধ্যে যে কোন বয়স। শিশুরা হল গুরু বা শিক্ষকের পুত্র-কন্যা, ভাইপো-ভাইঝি। যে সব বৃদ্ধরা এইসব সংস্কৃত বিদ্যালয়ের সঙ্গে জড়িত পরিবারের সন্তান, তাদের কাছে আমরা সেই জীবন সম্বন্ধে যা জানতে চাই, তা এখনো জানতে পারি। কারণ, বাণিজ্যিক যুগ প্রাচীন শিক্ষা এবং তার মাধ্যমস্বরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছে। আগেকার দিনের যা বৈশিষ্ট্য ছিল সেই বিপুল, মধুর অবসর অথবা উদ্বেগবিহীন জীবন এখন আর মানুষের নেই। এখন সব কিছু অর্থের অঙ্কে মাপা ও নির্দিষ্ট করা হয়, ক্ষুধার্ত মুখ ভরাবার যথেষ্ট খাদ্য নেই। যে রোজগার করতে পারে, তার পরিশ্রমকে পরিবার ত্যাগ করতে পারে না। প্রাচীন যুগে শিক্ষা মানুষকে দরিদ্র করত না, কারণ এর মাধ্যমে সে বিরাট গৌরব ও সম্পদ লাভ করত। কিন্তু এর ফলে তাকে এত দাবী মেটাতে হত যে, আরম্ভে যাই হোক, শেষে সে দরিদ্র হয়ে পড়ত। টোলে যে ছাত্ররা আসত, তারা যে শিক্ষা পেত তার জন্য কোন অর্থ দিত না। তারা যে জীবন ও পরিশ্রম দান করতে রাজী হত, এটাই যথেষ্ট ছিল। তাদের গুরু ছিলেন জ্ঞানের অধিপতি এবং তার ব্যাখ্যাতা। তিনি অর্থ জোগাতেন। কখনও কখনও একটা টোলে একশো পর্যন্ত ছাত্র থাকত, ন্যায়শাস্ত্রে বাংলার এত খ্যাতি ছিল যে, বিশেষ কোন শিক্ষকের কাছে শিক্ষালাভের জন্য দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে লোক আসত। টোলে আলোচনা সর্বদা চলত সংস্কৃত ভাষায়। সুদূর বিক্রমপুরের এরকম একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে আমি দুজন মারাঠা ছাত্রের কথা শুনেছি। ঐ দুজন নবাগতকে প্রয়োজনীয় সুবিধা দেওয়ার জন্য নিয়ম একটু শিথিল করা হয়েছিল, কিন্তু ওরা দীর্ঘদিন ওদের বাঙালী গুরু ও সতীর্থদের সঙ্গে ছিল, শেষে তাঁদের খ্যাতি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিদায় নিল।

যে এসে গুরুর কাছে ছাত্র হওয়ার জন্য অনুরোধ জানাত, ধরে নেওয়া হত যে,

সে কোন বিশেষ বিষয় শিখতে চায়। তখন তাকে একটা নির্দিষ্ট বই শিখতে দেওয়া হত। এই বই মুখস্থ করতে হত, ভাল ক'রে প'ড়ে বুঝতেও হত। প্রত্যহ সকালে আবৃত্তি শোনার সঙ্গে বিষয়বস্তু ও সমালোচনাও খুঁটিয়ে দেখা হত। ফল সন্তোষজনক না হলে আবার পড়তে বলে ইঙ্গিতে অসন্তোষ বোঝানো হত, তারপর অন্যান্য আবৃত্তি শোনা হ'লে পড়ার সময়ে শিক্ষক নিজে এসে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা ও সহায়তা করতেন।

দিনের কাজের পরবর্তী ধাপ ছিল, বক্তৃতা, যে তত্ত্ব পড়ানো চলছিল, তার একটা নতুন অংশ নিয়ে পণ্ডিত তখন ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে দিতেন। এ সব কাজ নিয়ে কেটে যেত সকালবেলা এবং অপরাহ্নের প্রথমভাগ। ছাত্রজীবনের গৌরব ও আনন্দ দেখা দিত সন্ধ্যাবেলায়, যখন ছায়া প'ড়ে আসত, দিনের প্রথাগত কাজ সারা হয়ে যেত। তখন শিক্ষক ও ছাত্ররা একত্রে অপরাহ্নিক ভ্রমণে বেরোতেন। মাঠ পেরিয়ে তাঁরা দুজন বা তিনজন ক'রে দল বেঁধে চলতেন আর পড়বার সময়ে যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল, সেগুলো খোলামনে আলোচনা করতেন। হয়ত শেষে তাঁরা পাশের কোন গ্রামের টোলে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতেন। অথবা হয়ত বাড়ীতে ফিরে দেখতেন যে, ওঁদের সঙ্গে আলোচনার জন্য অতিথিরা এসেছেন। প্রবল তর্কবিতর্কে সন্ধ্যা কেটে যেত; খাবার কথা মনেই থাকত না। বেশী রাতে কোন সময়ে ওখানেই শুয়ে রাত কাটিয়ে পরের দিন সকালে উঠে অতিথিরা নতুন ক'রে আলোচনা শুরু করেছেন, এমন ঘটনা বিরল ছিল না।

এইসব আলোচনার মাধ্যমে ছাত্রদের মৌলিকতা ও ক্ষমতা যথার্থ বৃদ্ধি পেত। এর থেকে এটাও বোঝা যায় যে, যে অঞ্চলে আরও টোল আছে, সেখানে টোল খোলা কেন দরকার ছিল। মাঝে মাঝে তর্কবিতর্কে উত্তেজনা দেখা দিয়ে প্রায় একটা বড় লড়াই-এর চেহারা নিত। চৈতন্যের অপূর্ব কাহিনী পড়লে এটা আমরা অনুভব করতে পারি; তিনি প্রথমে নদীয়ার পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষকতার সময়ে তাঁকে অপদস্থ করার জন্য তর্কে বিখ্যাত এক পণ্ডিত বারাণসী থেকে এলেন। তর্কযুদ্ধটা নদীয়ার সঙ্গে বারাণসীর যুদ্ধের মত হয়ে উঠল এবং স্বভাবতঃ বেশী সমর্থন ছিল শ্রোতাদের বাসস্থানের প্রতি। অন্য দিকে, ঐ অচেনা পণ্ডিতের বয়স ও খ্যাতি এমন ছিল যে, তরুণ নদীয়াবাসীর পক্ষে তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নামাটাই ছিল ধৃষ্টতার ব্যাপার। অতএব, সমর্থকরা সমানভাগে বিভক্ত হয়ে গেল—বৃদ্ধরা বারাণসীর আর তরুণরা নদীয়ার পক্ষে—তর্ক যে ভাবে এগোবে সেভাবে তারা যে কোন পক্ষে ঝুঁকে পড়ার জন্য প্রস্তুত। আমরা যারা গল্পটা পড়েছি তার আগে থেকেই জানি যে, দুজনের মধ্যে চৈতন্যই বড় তার্কিক ছিলেন। কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না যে, বয়সে তিনি নবীনও ছিলেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন আপন দেশে। এই পরিস্থিতিতে আমরা হয়ত ভাবতাম যে, কিছুটা করুণার বশে তিনি প্রবীণতর পণ্ডিতের মনোভাবকে আঘাত করবেন না। কিন্তু তা ঘটে নি। তর্কযুদ্ধের একটা নিজস্ব

গরিমা আছে, তবে সেটা সত্যের জন্য, ব্যক্তির খাতিরে নয়। প্রকৃত সত্যের প্রকাশে কোন বাধা থাকা চলবে না এবং যে কোন এক পক্ষের জয়ের তর্কে এই নিশ্চয়তা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে। অতএব তর্কযুদ্ধ অব্যাহতগতিতে ভয় বা অনুকম্পা ব্যতিরেকে এগিয়ে চলল যৌবনের ও নদীয়ার জয়ের অনির্বার্য পরিণতিতে। আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি যে, আঘাত লাগার ভয়ে দস্তানা পরার মত তাঁর বয়স, খ্যাতি বা সুপরিচিত কৃতিত্বের খাতিরে তাঁকে মেনে চললে তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হতেন।

কিন্তু সাধারণ মানুষের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থায় যোগাযোগের কিছু সূত্র থাকা চাই। বিশেষতঃ এর অভাবে যেখানে সকলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সেখানে এটা দরকার। যুদ্ধের জন্য যত সামান্য পরিমাণই হোক, কিছু শক্তি-সঞ্চয়ের উপায় থাকা চাই। প্রাচীন কালের ভারতে শিক্ষাকে সামাজিক জীবনের শ্রেষ্ঠ অলংকার বলে মনে করার ফলে এই প্রয়োজন মিটত। সে যুগে কোন অভিজাত পরিবারে পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধ না হ'লে কোন অসাধারণ বিবাহ-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ ব'লে মনে করা হত না। প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীগুলিকে বিশেষ বিশেষ ব্রাহ্মণের সভাপতিত্বে ও নির্দেশে এসে যোগদানের জন্য আক্রমণ জানানো হ'ত। সমগ্র বিদ্বৎসমাজের উপস্থিতিতে বিতর্ক হত। এই লোকেরা নিজেরা তর্ক করতে না পারলেও তর্কে আলোচিত বিষয় ও ভাষা সম্বন্ধে এতটা জানত যাতে তার্কিকদের নৈপুণ্যের তীক্ষ্ণ আগ্রহপূর্ণ সমালোচনা করতে পারে। এইভাবে উৎসাহিত হয়ে প্রতিযোগীরা তর্ক করত এবং দিন বা সময়ের শেষে বিজয়ীর নাম জানানো হত। কখনো কখনো কন্যার পিতা যে অর্থ যৌতুক দেবেন, তার সবটাই তিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে দিয়ে দিতেন। বিশিষ্ট এবং বিপুল জয়ের ক্ষেত্রে এরকম ঘটত। প্রায়ই দেওয়া হত তিন-চতুর্থাংশ, পঞ্চম-অষ্টমাংশ, এমনকি পঞ্চদশ-ষোড়শাংশ হিসেবে। কখনও কখনও এইভাবে প্রদত্ত পুরস্কার কেউ ক্রুদ্ধভাবে প্রত্যাখ্যান করত, ভাবত যে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে একেবারে পরাজিত হয়েছে, এ সত্য পুরস্কারের দ্বারা স্বাকৃত হয় নি। এরকম ক্ষেত্রে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন পণ্ডিত নিজের মত সমগ্র জগৎকে গ্রহণ না করানো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে অথবা কোন পুরস্কার না নিতে প্রস্তুত থাকতেন। ইউরোপে বীরত্বের প্রতিযোগিতায় যেমন নতুন বীরের আবির্ভাব যে কোন মুহূর্তে ঘটতে পারত, এখানেও তেমন কেউ বলতে পারত না, কোন অচেনা প্রতিভাধর ব্যক্তি এসে শ্রেষ্ঠ সুযোগকে বদলে দিতে পারে কি না। বিজয়ীকে সব আগন্তুকের বিরুদ্ধে, নতুন বা পুরনো সব সম্ভাব্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে নিজের খ্যাতিকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তুত থাকতে হত।

অপেক্ষাকৃত অশিক্ষিত লোকদের উপস্থিতিতে যদি তর্কযুদ্ধ এরকম উৎসাহের পর্যায়ে পৌঁছে থাকে, তাহ'লে যখন পণ্ডিত বা সাধুরা নিজেদের মধ্যে সভার আয়োজন করতেন, তখন কি হত আমরা কল্পনা করতে পারি। এরকম সভার ঘোষণা ও ব্যয় বহনের দায়িত্ব নিতেন রাজারা বা শহরবাসীরা, দূর-দূর থেকে, দূরের অখ্যাত টোল, প্রাসাদের গ্রন্থাগার, বড়-বড় বিখ্যাত কেন্দ্র থেকে অংশগ্রহণকারী পণ্ডিতরা

আসতেন। যখন সত্যি তর্ক শুরু হত—আমরা শুনেছি, পরাজিতরা রাগে-অপমানে প্রতিজ্ঞা করতেন অনশনে মৃত্যুবরণ করবেন। আমরা শুনেছি, একটানা অনেকদিন ধরে প্রবল যুদ্ধ চলত। শেষে যখন জয় ঘোষণা করা হত, তখন বিজয়ী সাফল্যের উত্তেজনায় আত্মহারা হয়ে মেঝের মাদুর ছিঁড়ে ফেলত, যাতে গম্ভীর, সম্মানিত শত্রুদের মাথার ওপরে বিদ্বেষের চিহ্নস্বরূপ ধুলো ছড়িয়ে দিতে পারে।

এরকম ঘটনার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের স্নাতকোত্তর ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা একটা আভাস পাই। হৃষীকেশের মত জায়গায় এখনো আমরা সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণদের মিলনের বড় বড় কেন্দ্রের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাই। যে কুম্ভমেলা পালা ক'রে হরিদ্বার, এলাহাবাদ ও নাসিকে হয়, সেটা আমাদের প্রাচীনতম সবচেয়ে বড় পণ্ডিতদের মিলনক্ষেত্রের একটি। যারা এখানে অংশ নেয়, তারা ধর্মের ক্ষেত্রে নবাগত নয়, তারা অভিজ্ঞ পণ্ডিত, পারস্পরিক শিক্ষার জন্য মিলিত হয়। যে প্রচলিত কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, হৃষীকেশে ব্যাস চারবেদ সঙ্কলন ও বিভাগ করেছিলেন, সেই কাহিনীর ঐতিহাসিকতাকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি না। এইরকম কোন প্রথায় আহূত সভায় বড় বড় পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজ হয়ত ভালভাবে হয়।

এইভাবে আমরা সংস্কৃতি-শিক্ষার উন্নতির দ্বিমুখী ধারার ইঙ্গিত পাই, একটা স্কুল বা কলেজের, অন্যটা যথার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের। এই শেষ ধারা অল্পবিস্তর ভ্রাম্যমান হলেও নির্দিষ্ট ও বাস্তব ছিল। অন্যদিকে, ব্রাহ্মণ্য বিদ্যালয়গুলি ছিল অসংখ্য এবং নিখুঁতভাবে গঠিত। কুড়ি বছর বয়সে যে ছাত্র আসত, সে কখনও পঁয়ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত টোলে থাকত, জ্ঞানলাভের প্রধান বাসনা তৃপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ ও নাগরিক জীবন যাপন করত না। অথচ "খুব অল্প লোক সিদ্ধান্তে পৌঁছত"। বস্তুতঃ কবিতার মত সিদ্ধান্তও ছিল স্বাধীন। মানুষ যা কিছু শিখেছে, এটি ছিল তার চরম ফল। তাকে শিখতে হত কি ক'রে "পঞ্চ শাখা"র তর্ককে চালিত করতে হয়, আধুনিক জগৎ একে বলে যুক্তিবিদ্যার প্রধান ও অপ্রধান অনুমান। সে জানত কোন্ কুযুক্তির কি উত্তর দিতে হবে এবং কত ধারায় প্রমাণ দেওয়া সম্ভব। এইসব শিখবার পর তাকে যে তর্ক এবং বিশ্বাস, উভয় ক্ষেত্রে নিজের পথে চলতে এবং জ্ঞান প্রয়োগ করতে দেওয়া হত, এতে তার ভাল হত। মতামত স্পষ্টতঃ ভুল হ'লে তা প্রমাণ ক'রে দেওয়া উচিত হলেও মত যে চাপিয়ে দেওয়া হত না, এটা সাধারণভাবে লোকের উপকার করত। সে জ্ঞান অর্জন করুক এবং যথাসাধ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছোক। বস্তুতঃ জ্ঞান ও সম্পদ সর্বদা প্রতিদ্বন্দ্বী ভগিনী। দেখলে মনে হয়, ওরা বন্ধু; কিন্তু ওদের মধ্যে রয়েছে গোপন, গভীর ঈর্ষা। একজনকে যে আন্তরিক ভালবাসা দেখায়, সে অন্যের অকৃপণ আশীর্বাদ লাভে ব্যর্থ হয়। অন্য দিকে, সৌজন্যের খাতিরে দুজনের প্রত্যেকেই ভগিনীর সেবককে যথেষ্ট সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। তাই অত্যন্ত ধনী লোক একেবারে অশিক্ষিত হয় না, অত্যন্ত বিদ্বান ব্যক্তিও সর্বদা অনশনে কাটায় না। যথেষ্ট

অসুবিধা হ'লেও তা কখনো মাত্রা ছাড়ায় না। অতএব, প্রথম থেকে একজনের জানা দরকার, সে সত্যি কি চায়। সর্বোপরি, সে যেন ধন-অর্জনের জন্য জ্ঞানের পেছনে না ছোটে। প্রাচীনকালে উপহার দেওয়া হত প্রধানতঃ জিনিষের মাধ্যমে। তাই বছরে বছরে টোলে ছাত্রদের খাওয়াবার জন্য যথেষ্ট চাল আসত, অথচ, গুরুর স্ত্রীর সমস্ত সম্পদ বলতে থাকত, কয়েকটি রূপোর গয়না এবং পেতলের রান্নার বাসন! প্রকৃতপক্ষে, মানুষের জন্য শ্রেষ্ঠ শ্রমের কখনও অর্থে মূল্য দেওয়া হয় না। গুরুর পরিবারের মহিলাদের উৎসাহ যদি তাঁর নিজের মত না হত, তাহ'লে গুরু কি ক'রে আদৌ টোল চালাতেন বোঝা কঠিন। কারণ, স্ত্রীকে রান্না, পরিচ্ছন্নতা এবং অসুস্থকে সেবা করার কাজ করতে হত। প্রত্যেক ছাত্র তাঁকে মায়ের মত দেখত, তার সঙ্গে গুরুর যেরকম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকত, এঁর সঙ্গেও সেরকম থাকত। তিনি বিধবা হলে তাঁর ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকত ছাত্ররা। দরকার হ'লে তাঁর জন্য তাদের ভিক্ষা করতে হবে। এই সম্পর্কের হল, মা ও সন্তানের। ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষক ও তাঁর স্ত্রীর পিতামাতার মত এই সম্পর্ক আমরা আভাস পাই ভারতীয় জনগণের কাব্যে ও ইতিহাসে। মহাভারতের অন্যতম প্রথম ঘটনা হ'ল, দেবযানীর কাহিনী, তার ভালবাসা ঘিরে ধরেছিল অচেনা যুবক গুরুভ্রাতা কচকে। সে দেবযানীর পিতার কাছে এসেছিল রহস্যময় মন্ত্র শিখতে। বস্তুতঃ ও এসেছিল দেবতাদের রাজ্য থেকে মানুষের বিদ্যা শিখতে। ও জানল, প্রথমে গুরুর সাহায্য ও মুক্তির জন্য ব্যবহার করলে ঐ বিদ্যা গভীর মহিমা ও সৌন্দর্যে পবিত্র হয়ে ওঠে। পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পর কচকে আপন দেশে ফিরতে হবে। দেবযানী বিশ্বাস করতে পারল না যে, ওরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, ও স্ত্রী হয়ে সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ জানাল। কিন্তু ওর বাবার ছাত্র ওকে বোনের মত দেখে, এ চিন্তা তার পক্ষে অসম্ভব। তখন হতাশায় সুন্দরী দেবযানী ওকে শাপ দিল যে, ও যে বিদ্যা শিখেছে তা ভবিষ্যতে নিষ্ফল হবে। ও নিজের ক্ষেত্রে এই অভিশাপকে মেনে নিল, কিন্তু বিনয়ের ভঙ্গীতে বলল, "তবে, যাকে এই বিদ্যা শেখাব তার ক্ষেত্রে এটি ফলবতী হবে!"

শোনা যায়, অনেকটা এই মনোভাব নিয়ে পরবর্তী কালে মহান আকবর বারাণসীর ব্রাহ্মণদের কাছে বৈদিক সঙ্গীতের মাত্রা ও ধ্বনির জ্ঞান-অর্জনের চেষ্টা করেন, তবে কোনবারই লাভ হয় নি। শেষে তিনি ছলনা করবেন বলে স্থির করেন। একদিন সকালে একজন বড় পণ্ডিত স্নান করতে যাওয়ার একটু পরে দেখেন, ঘাটে এক ব্রাহ্মণ যুবক ক্ষুধায় মূর্ছিতপ্রায়, সে বলল যে, সে দূর থেকে এসেছে তাঁর কাছে বেদ শিখতে। দয়ালু পণ্ডিত তাকে বাড়ী নিয়ে গেলেন, ছাত্র ও সন্তানের মত গৃহে রাখলেন। কালক্রমে সে গুরুর কন্যার প্রেমে প'ড়ে তাকে বিয়ে করতে চাইল। যুবকটির স্বভাব অত্যন্ত উন্নত ও মেধাযুক্ত ছিল বলে পণ্ডিত তাকে ভালবাসতেন, শিক্ষার শেষে তার অনুরোধ তিনি পূর্ণ করবেন। কিন্তু যুবকটি এত বঞ্চনা করার

কথা ভাবতে পারল না এবং বিয়ের আগের দিন জানাল যে, সে মুসলমান। ব্রাহ্মণ তাঁর প্রতিশ্রুতি বা আশীর্বাদ ফিরিয়ে নিলেন না। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, তাঁর বিদ্যার পবিত্র শপথ ভঙ্গ হয়েছে, তাঁর গোষ্ঠীর পবিত্রতা চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যাবে। শোনা যায়, তিনি না জেনে যে দুটি অন্যায় করেছেন, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আগুনে পুড়ে মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা করেন।

ইংরিজী শিক্ষার উদ্ভবের আগে যে সংস্কৃতি ভারতের বৈশিষ্ট্য ছিল, তাতে আমরা দেখেছি যে, কঠোর ধরনের বিদ্যায় অ-ব্রাহ্মণ সমাজ সমালোচনা ও আনন্দ লাভ করত, যেমন, উচ্চস্তরের সঙ্গীত-নৈপুণ্য ইউরোপে সব শ্রেণীতে সমাদৃত হয়। কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রের সুন্দর ফুলগুলি স্বতস্ফূর্তভাবে উপভোগ করতে দেওয়া হত। দর্শন, তর্কবিদ্যা, এমনকি প্রাচীন শাস্ত্রের আবৃত্তিকেও সংশোধন ও নিয়ন্ত্রিত করা যেত। কিন্তু সৃষ্টিশক্তিকে ঈশ্বরের করুণা বলে মনে করা হত, একমাত্র এ ক্ষেত্রে এই বাধা ছিল যে, যুক্তি-বিদ্যায় শিক্ষিত ব্যক্তিকে যেমন ভুল তর্কে বিভ্রান্ত করা যায় না, তেমনই মানসিক কাজের যে কোন সূক্ষ্ম কঠিন পদ্ধতিতে শিক্ষিত লোক মহত্ত্ব ও সৌন্দর্যের ত্রুটি বুঝতে পারে না।

বোঝা যায়, এত ব্যাপক সংগঠনের জন্মকাল থেকে কোন রকম স্বীকৃতি ছিল। আমরা এখানে যে বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রথা দেখতে পাই নিশ্চয় বহু শতাব্দী ধরে কোন শক্তিশালী প্রভাব তাকে লালপালন করেছে। এই প্রসঙ্গে আমরা মনে না ক'রে পারি না যে, চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে পাটলীপুত্রের মহান গুপ্তসাম্রাজ্য সংস্কৃত শিক্ষা ও সাহিত্যের ভাগ্যের সঙ্গে যে অচ্ছেদ্য-বন্ধনে বাঁধা ছিল, সেটা তারা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিল। সে যুগে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অবনতি তখনও শুরু হয় নি। তখন নালন্দার বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তার শক্তির শিখর দেশে। সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞানের বহু শাখায় সে তার গবেষণা চালাচ্ছে। নালন্দা ছিল রাষ্ট্রীয় মানমন্দির এবং সরকারী কাজকর্মের কেন্দ্র; কারণ, হিউয়েন-সাং আমাদের বলেছেন, একমাত্র ওখানেই দেশের জলঘড়ি রাখা হত, এই ঘড়ি সারা মগধের সময় পরিচালনা করত। নালন্দার খ্যাতিতে শুধু ভারতের সব অংশের নয়, চীনদেশেরও ছাত্র আসত। বিক্রমপুরের পারিবারিক ইতিহাসগুলি থেকে জানা যায় যে, নালন্দায় পাঁচশো জন অধ্যাপক ছিলেন এবং অন্ততঃ একবার তাঁদের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের একজন—ভারতীয় বংশধারায় পণ্ডিতদের গৌরবের স্মৃতি এতদূর বিস্তৃত ছিল।

নালান্দা সম্পর্কে আমাদের শেষ স্পষ্ট ধারণা হয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি হিউয়েন-সাঙের পরিদর্শনের সময়ে। আবার নবম শতাব্দীর শুরুতে যবনিকা উঠল শঙ্করাচার্যের জীবন ও জীবিকার যুগে। নানা গল্পে বলা হয়েছে, অজ্ঞ, নিরক্ষর বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের তর্ক ও আলোচনায় পরাস্ত ক'রে তিনি ঐ পবিত্র স্থানগুলির ভার দেন তাঁর নিজের লোকদের উপরে। এতে প্রমাণ হয়, ততদিনে সংস্কৃতভিত্তিক

সভ্যতার ধারা অল্পবিস্তর সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। আমরা বিশ্বাস না ক'রে পারি না যে, ব্রাহ্মণ্য শিক্ষা-সংগঠন নিশ্চয় বৌদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থার প্রাচীনতর রূপের অনুরূপ, সেদিন পর্যন্ত বাঙালীর টোলে যে জীবন ছিল, তা নিশ্চয় অজন্তা ও ইলোরা গুহার মত জায়গার প্রাচীনতর জীবনের হুবহু প্রতিরূপ। কিন্তু এই যে বৌদ্ধরা এই পাণ্ডিত্যের প্রতিযোগিতায় হার স্বীকার ক'রে নিয়ে তাদের পবিত্র স্থানগুলির দায়িত্ব বিজেতাদের হাতে তুলে দিল, এতে যেন আমরা আরও প্রাচীন, একেবারে আদিম পৃথিবীর আভাস পাই।

সাধুদের জমায়েত এবং বিতর্কযোগ্য বিষয়গুলি নিয়ে প্রকাশ্য আলোচনার যে প্রথা, তা সম্ভবতঃ গুপ্তযুগে এবং শঙ্করাচার্যের প্রভাব ও কার্যকলাপের একেবারে প্রথম যুগেই পরিণতিলাভ করেছিল। বাংলায় গৌড়-সাম্রাজ্য আরও চারশো বছর নিরাপদে রাজত্ব ক'রে শের শাহ্ এবং পরবর্তী মুঘলদের কাছে হার স্বীকার করে। এই গৌড়-সাম্রাজ্য স্বেচ্ছায় কনৌজী ব্রাহ্মণদের ধর্মীয় সভার সঙ্গে যোগ রেখেছিল, এই সভা স্বতন্ত্র রাজসভার মত থেকে যতদিন সাম্রাজ্য বেঁচেছিল, ততদিন প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। এই বলিষ্ঠ দীর্ঘস্থায়ী জাতীয় স্বাতন্ত্র্যকে বাংলার সংস্কৃত সভ্যতার উন্নত রূপের প্রকৃত কারণরূপে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। ভৌগোলিক স্বাধীনতা সর্বদা প্রথা ও প্রতিষ্ঠানের ঐক্য ঘটায়, অন্যত্র বৈদেশিক আক্রমণে তা নষ্ট হয়। এই নিয়ম অনুসারে আমরা দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণতম বিন্দুতে ও পূর্ববঙ্গে তখনও উজ্জ্বল অতীতের চিহ্ন দেখার আশা করতে পারি না, অন্যত্র সে সব চিহ্ন আর ছিল না। টোলের জীবন-যাত্রায় এবং বিবাহ-বাসরের তর্ক যুদ্ধের দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে আমরা মধ্যযুগের এরকম চিহ্ন নেই এবং সে চিহ্নের বক্তব্য দুর্বল নয়। নালন্দায় যে আগুন ছিল মিথিলা, নদীয়া ও বিক্রমপুর তার স্ফুলিঙ্গ। বারাণসী এবং হৃষীকেশ এখনও আমাদের সেই কালের সাক্ষ্য দেয় যখন আমাদের পূর্বপুরুষদের মনে ক্ষণিক মঙ্গলের চেয়ে বড় ছিল মন ও আত্মভিত্তিক জীবন। ঐ জীবন ছিল বিপুল শিক্ষাবিস্তারের অংশ ভারতের সন্তানদের কর্তব্য হল আবার তাকে বাঁচিয়ে তোলা।

বারাণসী: একটি আলোচনা

পবিত্র স্থানেও আমরা সর্বদা বিরল অন্তর্দৃষ্টির শান্ত মুহূর্তগুলি খুঁজে পাই না। বারাণসীতে আমার তৃতীয়বারের পরিদর্শনের সময় একটি দিন দুপুরের পর কোন সময়ে বিশ্বনাথবাজারে বসেছিলাম। আমার চারিদিকে সব নিস্তব্ধ, তন্দ্রাচ্ছন্ন। সাধুর মত দেখতে দোকানদাররা তাদের সামান্য জিনিষপত্রের ওপরে বসে ঢুলছে; কোথাও নামাবলী, কোথাও-বা কয়েকটি ছোট পাথরের শিব। সরু পথে যানবাহন বেশ কম, কিন্তু মাথার ওপরের অদৃশ্য নীল পথ ধরে চাতক পাখিরা উড়ে গাছের মধ্যে বাসায় যাতায়াত করছে। তাদের শব্দে এবং বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের বিরাট ঘণ্টার গভীর প্রতিধ্বনিতে বাতাস পূর্ণ, অবিরাম নগ্নপদ ভক্তদের স্রোত মন্দিরে ঢুকে প্রার্থনা করছে, তারপর মন্দির ছুঁয়ে চলে যাচ্ছে। সেই কম্পিত, বেদনার্ত ঘণ্টাধ্বনি সেখানে হচ্ছে, ঐ শান্ত মুহূর্তে মনে হল, ওটা যেন কোন রহস্যময় স্তূপ, শহরের জীবনের প্রতিটি স্পন্দনে সে স্পন্দিত, রোমাঞ্চিত। যে কেউ বিশ্বাস করবে যে, ওর ঐ শব্দের তরঙ্গ কোন যান্ত্রিক স্পন্দন থেকে জাত নয়, বারাণসীর দূর-দূরান্তে তা প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কোথাও কান্না, কোথাও প্রার্থনা, আবার কোথাও আনন্দের সুর হয়ে: ঐ ঘণ্টা যেন নিপুণ তাঁতীর মত সঙ্গীতের সুষমা বুনে চলেছে আর পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিচ্ছে আনন্দ-বেদনার অসম্পূর্ণ জটপাকানো সুতোগুলি। আমাদের মনে হচ্ছে, ওগুলি যেন অর্থহীন, এলোমেলো।

একটু পিছনে রয়েছে ফুলবিক্রেতাদের দোকান, ওরা দরজার ওপারের শিবের পুজোর জন্য সাদা ফুল বেচে। এ কি কাজ, সারা জীবন, দিনের পর দিন শুধু প্রভুর পূজার জন্য ফুল জোগানো! এই কাজ করতে গিয়ে প্রাত্যহিক পূজার মাধ্যমে কেউ কি মুক্তির স্বপ্ন দেখেনি?

তারপর আমার মনে এল, ইউরোপের প্রাচীন পাত্রীদের কথা, ভাবলাম এক বিরাট মন্দিরের ছায়ায় এই ভাবে চাতক পাখি, মানুষ আর ফুলের মত বেঁচে থাকার অর্থ কি। কারণ, এই হল বারাণসী—মন্দিরের প্রাচীরের চারদিকে গঠিত নগরী।

প্রায় বারাণসী সম্বন্ধে একথা বলা হয় যে, এ জায়গা আশ্চর্যরকম আধুনিক, এ মন্তব্যে কিছুটা সত্য রয়েছে। বরুণা ও অসির সঙ্গমের মাঝে গঙ্গার তীরে রয়েছে যে সব প্রাসাদ মঠ ও মন্দির, সেগুলি তৈরি হয়েছিল প্রধানতঃ গত তিনশো বছরে। ওগুলি আবার গড়ে তোলার মত যথেষ্ট দক্ষতা ও রুচি এখনও ভারতে রয়েছে; যদি অবশ্য অচিরে ওগুলি ধ্বংস হয়। এই অর্থে, বারাণসী আধুনিক ভারতীয় জনগণের সৃষ্টি।

কিন্তু কখনও কোন শহর এভাবে অতীতের মহিমা প্রচার করে নি। বাজার,

বাড়ী, গৃহের গঠনে সর্বদা অতীতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন, এখানে রয়েছে জম্মু ছত্র, জৌনপুরী—পাঠান-রীতিতে গঠিত, দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারতে এ রীতি প্রচলিত ছিল। কাছেই একটা ছাদের রেলিং দেখছি যাতে অশোক যুগের বেষ্টনীর অনেক বৈশিষ্ট্য বজায় রয়েছে, শুধু পাথরের বদলে এটি কাঠের তৈরি। গঙ্গার ওপরে ঝুঁকে পড়া একটি বাড়ীতে আমি স্তম্ভযুক্ত ঘরও দেখেছি, ঐ বাড়ীর মালিকদের দাবী অনুযায়ী ওটি হয়তো প্রায় দু হাজার বছরের পুরনো। এখানে, এই যে বিশ্বনাথের বাজারে আমরা এখনও ঘুরছি, সেটাই হয়তো বৈদিক পূর্বপুরুষদের চলাচলের আরণ্য পথ ছিল, এখানে ওঁরা বিরাট নদীর পূর্বদিকে সূর্যোদয় দেখতেন, সেখানে এখন বিশ্বেশ্বরের সোনার মন্দির, সেখানে হয়ত ওঁরা পূজা উপলক্ষ্যে ঋক্ আবৃত্তি ক'রে হোম করতেন।

সবচেয়ে বেশীদিন স্থায়ী হয় পথ। ইউরোপীয় শহরের বাড়ী ও বাগানের পেছনে আঁকাবাঁকা পথ অল্পদিন আগে হয়ত ছিল মাঠ ও ক্ষেতের পথ। অনুরূপভাবে সব দেশে পায়ে-চলা পথ অলিখিত ইতিহাসের নীরব ইতিবৃত্ত। কিন্তু কে এই ছোট্ট পথের কাহিনী আবিষ্কার করবে অথবা গত চার হাজার বছরে এর পাথর বেয়ে যাদের পদক্ষেপ যাতায়াত করেছে, তাদের জীবন-মৃত্যু নিয়ে কে সুদীর্ঘ কবিতা লিখবে?

সত্যিই আজকের এই শহর সম্পর্কে যে কোন সাধারণ সমালোচকের যা ধারণা তার চেয়ে এর বয়স বেশী। এখানেই সারনাথে ৫৮৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ বা তার কাছাকাছি সময়ে সেই মহান বাণী ধ্বনিত হয়েছিল, যার প্রতিধ্বনি কোনদিন ইতিহাস থেকে মিলিয়ে যায় নি: "হে সন্ন্যাসিগণ, তোমরা শোন, মৃত্যু থেকে মুক্তির পথ পাওয়া গেছে!" এর ফলে, নির্বাণলাভের আগে ও পরে বুদ্ধের জীবনে মৃগদাবে যে গুরুত্ব দেখা দেয়, তার থেকে ভালোভাবে বোঝা যায়, সেই যুগে দর্শনের কেন্দ্ররূপে এর কি গুরুত্ব ছিল। তিনশো বছর পরে, মহাপ্রভুর জীবনের অতি পবিত্র ঘটনাগুলির স্মারক-গঠনের চেষ্টায় কোন গুহার বেষ্টনীযুক্ত এক ক্ষুদ্র স্তূপ অশোক খুঁজে পেয়েছিলেন। তখনই সেটি মাটির নীচে চলে গিয়েছিল, ঐ জায়গা বিশেষভাবে বুদ্ধের চরণস্পর্শে পবিত্র হয়েছিল এবং সাম্প্রতিক খননকাজের ফলে আমরা এটা জানতে পেরেছি। এইভাবে আমরা জানতে পেরেছি যে, শুধু বারাণসীর মৃগদাবই (এই নামকরণের সম্ভবতঃ কারণ এই ছিল যে, এটিকে বড় পশুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার বিশেষ চেষ্টা হয়েছিল) ৫৮৩ ও ২৫০ খ্রীঃ পূঃ গুরুত্বপূর্ণ ছিল তাই নয়, উপরন্তু এর মধ্যবর্তী সময়েও এটি একটি নিরাপদ আশ্রয় ছিল, এর থেকে নিশ্চিত বোঝা যায়, অতি খুঁটিনাটি বিষয়েও এক প্রথা বজায় রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিরাট সাংস্কৃতিক বিকাশের উৎসরূপে বুদ্ধের আবির্ভাব-তিরোভাবের একমাত্র সাক্ষী শুধু সারনাথ নয়। যেমন, মুসলমান যুগের আগে বহুদিন ধরে আব্কারিয়া কান্দ একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ধর্মকেন্দ্র ছিল না। দশাশ্বমেধ ঘাট ও বাজারের নাম শুনলেই এমন দীর্ঘ সময়ের কথা মনে পড়ে, যার মধ্যে দশটা রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

এক একটি যজ্ঞ অন্ততঃ এক একটি রাজত্বে। অর্থাৎ, সম্ভবতঃ পুরো পাটলিপুত্র যুগে, ৩৫০ থেকে ৪০০ খ্রীঃ পূঃ বারাণসী ছিল রাজত্বের ধর্ম ও যজ্ঞ সংক্রান্ত কেন্দ্র। এখানে দুটি অশোক স্তম্ভ আছে, একটি কুইন্স কলেজের প্রাঙ্গণে এবং অন্যটি আমরা জানি সারনাথের প্রাচীন মঠের প্রবেশ-পথে। আমরা ভালভাবে জানি যে, বুদ্ধের যৌবনকালে বারাণসী ছিল ব্যস্ত শিল্প-কেন্দ্র। তিনি সম্ভবতঃ ৫১০ খ্রীঃ পূঃ সন্ন্যাসীর গেরুয়া পরার জন্য যে পোষাক ফেলে দিয়েছিলেন, বহু বইতে পড়া যায়, তা ছিল বারাণসী রেশমের তৈরি।

কিন্তু বস্তুতঃ এটাই আমাদের পক্ষে আমাদের আশা করা স্বাভাবিক। কারণ প্রাচীনকালে যে কোন দেশের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য সর্বদা ছিল জলপথ, নদীর উত্তরের বাঁকে বারাণসীর অবস্থানের ফলে দক্ষিণ ও পূর্বের সব পায়ে-চলা পথ এখানে এসে মিলিত হয়ে স্বভাবতঃ বারাণসীকে ভারতের বৃহত্তম বিতরণকেন্দ্র ক'রে তুলেছিল। এর ফলে সে হয়ে ওঠে শহরের সমষ্টি। একটার ওপরে আর একটা শহর গড়ে উঠেছে; যুগের পর যুগ জড়ো হয়েছে। ধনবসতি এমন সব বাড়ী আছে যাদের ভিত গাঁথা হয়েছিল ইটের খনিতে এবং তাদের মালিকরা এইসব প্রাচীন বস্তু বিক্রি ক'রে চালায়। অন্ততঃ একটি মন্দিরের কথা আমি জানি, যার মেঝে বর্তমান পথের রেখা থেকে আট বা দশ ফিট নীচে এবং যার নির্মাণকাল স্পষ্টতঃ দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ শতাব্দীর মাঝে।

আমরা যদি বড়র সঙ্গে ছোটর তুলনা করি, তাহ'লে বারাণসীকে অশোক ও অশোকোত্তর যুগের ধর্মকেন্দ্র বলা যায়। পরে রাজপুত ও মুসলমানদের সামরিক ভারতবর্ষে দিল্লীর যে স্থান ছিল, প্রাচীন ভারতে বারাণসীর স্থান ছিল সেইরকম এবং ভারতের পূর্বাঞ্চল ছিল বৌদ্ধ। সারনাথে সেই মহান সন্ন্যাসীর স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মমতের অনুরাগী ভক্তরা। বারাণসীতে গৃহস্থ ও নাগরিকরূপে ব্রাহ্মণরা এই শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করত যে, মহাদেবের মধ্যে বুদ্ধের মত মহত্ত্বের অভাব নেই। বোম্বাই-এর বন্দরে এলিফ্যান্টার প্রবেশপথে ক্ষোদিত বাঘছালপরা, বুদ্ধের মত ধ্যানে উপবিষ্ট শিব ছিলেন বৌদ্ধযুগের শেষদিকে হিন্দুর আদর্শ। সুতরাং যে বৈদিক শহরের পথ দিয়ে বুদ্ধ গিয়েছিলেন, তা হ'য়ে উঠল শিবের পবিত্র শহর; ওখানে শিবের প্রতীক গঠন ও প্রতিষ্ঠা—নিরাকার ঈশ্বরকে পাথরে রূপদানের কাজ দীর্ঘ দিন ধরে খুব প্রশংসনীয় কাজ ছিল, ঠিক যেমন বৌদ্ধ তীর্থস্থানে বহুদিন ধরে স্তূপনির্মাণ ছিল প্রশংসনীয় কাজ। না, এখনও আদি পৌরাণিক যুগের প্রাচীন স্তূপ এবং বারাণসী রাস্তায়-ঘাটে পরবর্তী পরিবর্তন-কালীন প্রাচীন শিবলিঙ্গ, সেই সময়ের বিলীয়মান যুগে বুদ্ধের প্রভাবের সাক্ষ্য দেয়।

কিন্তু বারাণসী শুধু ভারতীয় তীর্থক্ষেত্রে নয়, শিক্ষাকেন্দ্রও বটে মন্দির ও মঠের ছায়ায় পণ্ডিত বা সংস্কৃতজ্ঞদের বিদ্যালয় এবং বাসস্থান রয়েছে, ভারতের সব জায়গা থেকে ছাত্ররা সেখানে আসে চিরন্তন সাহিত্য এবং হিন্দুধর্মের প্রাচীন রীতিনীতি

জানতে। সংস্কৃত ন্যায়শাস্ত্রে নদীয়া বিখ্যাত, কিন্তু বারাণসী বিখ্যাত দর্শন ও ব্রাহ্মণদের স্তোত্রের জন্য। তাই পুজা ও দর্শনের প্রশ্নে বারাণসী বরাবর শেষ কথা হয়ে রয়েছে এবং প্রতিটি ভ্রাম্যমান ছাত্র নিজের জায়গায় ফেরার সময়ে ভারতের সর্বত্র এই প্রভাবকে ছড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্যই এ সংস্কৃতি মধ্যযুগীয় ধরনে প্রচারিত মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি। এখানে একটা বই শেষ করতে একজন লোকের বারো বছর লাগে, অথচ, আধুনিক তুলনামূলক পদ্ধতিতে আমরা এক বছরে বারো থেকে কুড়িটা বই ওপর-ওপর শেষ করতে বাধ্য হই। অতএব দেখা যাচ্ছে, আমরা এখানে একটা বিষয়ের বিভিন্ন দিক্‌গুলির যোগসূত্র না প'ড়ে পড়ছি বিষয়ের নামগুলো, সমন্বয়ের বদলে শুধু তাৎপর্য। কিন্তু এই কারণেই নিজস্ব ধরনে স্বতন্ত্র ও দৃঢ় বারাণসীর পণ্ডিতরা নির্ভয়ে নিজের মত প্রকাশ করে, যেমন ক'রে আধুনিক জগতের অন্যান্য মধ্যযুগীয়রা,—জন বানিয়ান, উইলিয়ম ব্লেক।

কিন্তু বর্তমান কালে যদিও বারাণসীর সংস্কৃতি-কেন্দ্রের রূপটি দ্রুত লোপ পাচ্ছে, তবু আমরা লক্ষ্যণীয় আর একটি অসাধারণ সুযোগ পাচ্ছি। ভারতে মুসলমান শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র জৌনপুরের পাশাপাশি এ শহর দাঁড়িয়ে আছে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃত শিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে। বস্তুতঃ বারাণসী হ'ল হিন্দু প্রদেশগুলির সংস্কৃতভিত্তিক সভ্য এবং মুসলমানদের পারসিক ও আরবী সংস্কৃতির মাঝের সীমারেখা। তাই এখনও ওখানে এমন লোক আছে যারা একদা জগতে জাতীয় শিক্ষার অতি যোগ্য নিদর্শন গড়ে তুলেছিল, এইসব বয়স্ক হিন্দু ভদ্রলোকরা যৌবনে শুধু সংস্কৃত সাহিত্য পড়তেই শেখেন নি, তখন যা ছিল রাজসভার বিশেষ কৃতিত্ব, সেই পারসিক কবিতাও পড়তে ও অনুবাদ করতে শিখেছিলেন। এই বিশেষ সংমিশ্রণ থেকে উদ্ভূত মনের জন্ম বারাণসীতে সম্ভব হয়েছিল, একদিকে হিন্দু পণ্ডিত ও অন্যদিকে জৌনপুরের মৌলবীর উপস্থিতির ফলে—এ মন অবশ্যই পণ্ডিতের নয়, কিন্তু এ মনের অধিকারী জগতে মার্জিত, বিদগ্ধ এবং নাগরিক। যারা পারসিক ভাষায় প্রাচীন শিক্ষা পেয়েছিল সেই মার্জিত হিন্দুদের শেষ জনের সঙ্গে মানুষ আভিজাত্যের যে সুন্দর প্রকাশ দেখেছে, তার একটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আমরা এখনও যেমন মাঝে মাঝে এশিয়ায় আধুনিক ও মধ্যযুগীয় সংস্কৃতি পাশাপাশি দেখি, তেমন যারা দেখেছে তারা কখনও সন্দেহ করতে পারবে না যে, যথার্থ সাহিত্যের অধিকারী মধ্যযুগীয় মানুষের।

অতএব, বারাণসী হল পরোক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়। মধ্যযুগের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এখানেও বরাবর পারম্পরিক সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বিপুল বেষ্টনী ছাত্র ও পণ্ডিতদের সাহায্য করত। যে শিক্ষার প্রতি অনুরাগে হাজার মাইল পথ পায়ে হেঁটে এসেছে, তার পক্ষে অন্ন ভিক্ষা করা লজ্জাকর নয়। মধ্যযুগে লাইপ্‌জিগ, হাইডেলবার্গে বা অক্সফোর্ডও এটা লজ্জার ছিল না। আমাদের স্কুল-কলেজ তৈরি হয়েছিল এইসব পণ্ডিতদের জন্য। ধনীদের স্ত্রীরা এদের জন্য অর্থ দিতে চাইত ৮

বারাণসীতেই শুধু খাদ্য ভিক্ষা করা নয়। এক শীতের ভোরবেলা অন্ধকারে আমি বাঙ্গালী টোলের পথ দিয়ে স্নানের ঘাটে চলেছি, তখন দূরে সংস্কৃত মন্ত্রের স্তব শুনতে পেলাম। একটু পরে এক ছাত্রকে দেখলাম, সে সারারাত কোন ধনীর বাড়ীর পাথরের বারন্দায় শুয়েছে, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা থেকে বাঁচবার জন্য সাধারণ চট দিয়ে সযত্নে বারান্দাটা ঘেরা, এখন পাঁচটার আগে উঠে সে লণ্ঠনের আলোয় সে-দিনের পড়া মুখস্থ করছে। আর একটু দূরে আর একজন পড়ছে, তার চটের ঘেরা বা লণ্ঠনের বিলাসিতা নেই। সে একটা কম্বল গায়ে দিয়ে খালি পাথরে সারারাত শুয়েছে এবং এখন রাস্তার আলোতে পড়ছে।

এখানে শিক্ষানুরাগের সঙ্গে রয়েছে পরিশ্রম ও দারিদ্র্য। এদের পক্ষে বিদ্যালয়ের কাজ করার পর অন্ন উপার্জন করা স্পষ্টতঃ অসম্ভব। মধ্যযুগে ধনী, অভিজাত ও ব্যবসায়ীদের স্বাভাবিক দান নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ছিল —তখন ধর্মসংক্রান্ত উৎসাহ ছিল প্রবল, সমস্যা ছিল কম—যে সব পণ্ডিতদের বাড়ীতে ছাত্ররা থাকত, তাঁদের খরচ জোগোনো যেত। কিন্তু আধুনিক যুগে ছাত্রপ্রথা দেখা দিয়েছে। শোনা যায়, এ শহরে এরকম তিনশো পঁয়ষট্টিটা ছত্র আছে। যে বাড়ীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক রোজ খেতে পায়, তাকে 'ছত্র' বলে। কেউ কেউ দুবেলা টাকা দেয়। কেউ অব্রাহ্মণদের খেতে দেয়। অনেক ছত্র ধার্মিক বিধবা বা রাজাদের দান। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত যে, ছাত্রদের খাদ্য-জোগানোর দায়িত্ব শহরের। শিবের এই সন্তানদের কাছে বারাণসী কি মা অন্নপূর্ণা নয়, যাঁর হাত সর্বদা "অন্নে পরিপূর্ণ" ?

যারা অধ্যয়নের ব্রত গ্রহণ করত, তাদের প্রতি যে যুগে মানুষ কৃতজ্ঞ হয়ে অনুভব করত যে, এদের বিদ্যানুরাগ যেন জন্মমুহূর্তে মৃত্যুবরণ না করে, এর জন্য তাদের মোটা অর্থদণ্ড দিতে না হয় এবং প্রবেশার্থীদের তালিকায় যত বেশী সম্ভব নামের পাশে "অসফল" না লেখা হয়, এদের জীবনের প্রয়োজনের জন্য সব দায়িত্ব জাতিকে নিতে হবে, সে যুগের কথা ভাবলে কি অদ্ভুত মনে হয়।

কিন্তু বারাণসী শুধু কয়েকটি মন্দিরের সমষ্টিমাত্র নয়। সে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় নয়, তিন হাজার বছরের ইতিহাস ও শিল্পের কেন্দ্রমাত্র নয়। তার নদীতীরের কেন্দ্রে রয়েছে মহিমাময় মণিকর্ণিকা। কারণ, ওটি বিরাট জাতীয় শ্মশান, বিশাল দাহস্থান। "যে বারাণসীতে মারা যায়, সে নির্বাণলাভ করে"। এই কথাগুলো হয়ত গভীর ভালবাসার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঐ সুন্দর ঘাটগুলিতে রাত বা ভোরের স্পর্শ কপালে নিয়ে, কানে মন্দিরের ঘণ্টা ও স্তোত্রের শব্দ নিয়ে হৃদয়ে শিবের প্রতিশ্রুতি ও অতীতের স্মৃতি নিয়ে কে না মারা যেতে চাইবে? আনন্দে বৃত এই মৃত্যুই কি মুক্তি নয়, লক্ষ্য নয়? "হে ঈশ্বররূপী মহান জ্ঞান, তুমি আমাতে স্থিতিলাভ কর!" ফুলওয়ালাদের দোকান থেকে যে পুষ্পসজ্জিত বিশ্বেশ্বরের চারদিকে ব্রাহ্মণদের সন্ধ্যাবন্দনা শুনেছে, এই অনুভূতিই তার হয়েছে। সে মানুষ আর কখনও ভাবতে পারে না যে, ঈশ্বর সিংহাসনে বসে আছেন, আর তাঁর সন্তানরা চারদিকে

মতভাস্থ হয়ে বসে আছে। কারণ, সে এই রহস্য জানতে পেরেছে যে, শিব রয়েছেন মানুষের হৃদয়ে, তিনি পরম চেতনা, পরম জ্ঞান ও পরম আনন্দ। যে জায়গা আত্মায় এমন বাণী জাগিয়ে তুলতে পারে সেখানে সম্ভব হলে আমরা কে মারা যেতে না চাইব?

সারা ভারত এ কথা অনুভব করে। সারা ভারত এ বাণী শুনতে পায়। একে একে, ধীরে ধীরে, অধিকাংশ মাথা নীচু ক'রে, খালি পায়ে আসেন বিধবারা ও সাধুরা, পবিত্র মৃত্যুর বাসনা ব্যতীত যাঁদের জীবনে আর কোন বাসনা নেই। বারাণসীতে কত সতীর স্মারকস্তম্ভ দেখা যায়, একটা মণিকর্ণিকা ঘাটে, অনেক ছড়িয়ে আছে বারাণসীর বাইরে মাঠে-পথে। শোকের সময়ে বৈধব্যের গৌরবের স্মৃতি এগুলি। কিন্তু আরও গৌরব আছে। এই বারাণসীর গোপন পথে পথে এমন হাজার রমণী রয়েছে, যারা ধবধবে সাদা পোষাকে শরীর ঢেকে স্নান, উপবাস ও অবিরাম প্রার্থনা করছে, তাদের জীবন হল, প্রিয় আত্মার উন্নতির দীর্ঘ প্রচেষ্টা। পণ্ডিত যদি সত্যি জাতির ভৃত্য হয়, তাহ'লে এরা কি কম? জাতীয়তার পায়ের কাছে আড়ালে প্রজ্বলিত আদর্শ নারীত্বের "অকম্পিত" প্রদীপ তো এইটিই, এ আলো কি জগতে ছড়িয়ে পড়ে নি?

আবার, বারাণসী হল, সমগ্র ভারতীয় জাতীয়তার মিলনের প্রতীক। নবাগত যখন নদীপথে মন্দির ও স্নানের ঘাটের দীর্ঘ সারি পেরিয়ে যায়, প্রত্যেকটি মন্দির ও ঘাটের ইতিহাস শোনে, তখন এই স্থাপত্যের সৌন্দর্যের প্রথম প্রকাশে রুদ্ধশ্বাস হয়ে সে ভাবে, ভারতের প্রতিটি পথ নিশ্চয় বারাণসীতে এসেছে। এখানে রয়েছে দক্ষিণী সাধুদের প্রধান কেন্দ্র কেদারনাথের মঠ, এ মঠ মাদ্রাজে সব হিমালয় তীর্থের ফলের প্রতীক। অসাধারণ মারাঠা রাণী, বিধবা অহল্যাবাঈ রাণীর ঘাট এখানে রয়েছে, তাঁর তৈরী মন্দির, রাস্তা ও পুকুর সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে আছে, এরা শাসকদের মাতৃহৃদয়ের পরিচয় দেয়। অথবা, এর পেছনে আমরা দেখতে পাই, শঙ্করাচার্যের সম্প্রদায়ের মঠ, এঁরা উচ্চবর্ণের দণ্ডী সাধু, নবম শতাব্দীর শুরুতে প্রতিষ্ঠাতার আমল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এঁদের ধারা অব্যাহত এবং প্রথা স্বীকৃত। আবার, আমরা নাগপুরের ভোঁসলেদের প্রাসাদ দেখতে পাই (এখন দ্বারভাঙ্গার মহারাজাদের হাতে)। এ প্রাসাদ মারাঠাশক্তির ইতিহাসের সঙ্গে বারাণসীকে যুক্ত করেছে, আর একটু দূরে রয়েছে গোয়ালিয়র, এমন কি, নেপালের রাজবাড়ী। এ শহর শিবের হলেও এখানে সব কিছু শিবের উদ্দেশে উৎসর্গিত নয়। কারণ, এখানে আবার আমরা দেখি বেণীমাধবের মন্দির, যে নাম বিষ্ণুর অন্যতম প্রিয় নাম। এমন কি, মুসলমান রাজারাও বাদ পড়েন নি। কারণ, আকবরের আমলের প্রাচীন সুন্দর মানমন্দিরের যন্ত্রপাতি ও বক্তৃতাকক্ষে দেখা দিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞান আর আওরংজেবের মসজিদের উঁচু চূড়ায় রয়েছে মুসলিম বিশ্বাসের প্রকাশ।

কিন্তু গঙ্গার তীরভূমি সম্পর্কে যা সত্য তা আরও স্পষ্ট হয় যখন আমরা পিছিয়ে গিয়ে পুরো শহরটাকে দেখি। রঞ্জিৎ সিং কোন আলাদা বাড়ী করান নি, কিন্তু বিশ্বেশ্বরের ছাদ সোনা দিয়ে ঢেকে তাঁকে অমৃতসরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধনে বেঁধেছেন। পঞ্চকোশ অঞ্চল জুড়ে মন্দির-মঠ, দান-ধ্যানের জন্য বাংলার জমিদার, পাঞ্জাবের সর্দার আর রাজপুতানার অভিজাতরা সবাই পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছেন।

অথবা শিল্পের ক্ষেত্রেও আমরা একই জিনিষ দেখতে পাই। বারাণসীর নিজস্ব সূক্ষ্ম বস্ত্র ছাড়া ওখানে আমরা মাদ্রাজ ও দাক্ষিণাত্যের শাড়ীও কিনতে পারি। কিংবা, পাঞ্জাবের কাঠের কাজের জন্য আমরা বিশ্বনাথের বাজারে যেতে পারি। একই শহরে আমরা দেখতে পাব, নাসিক, ত্রিচিনোপল্লী এবং নেপাল সীমান্তের পিতলের কাজ। ভারতের যে-কোন জায়গার চেয়ে এখানে আমরা পাব জালজাতের গয়া, জব্বলপুর ও আগ্রার পাথরের বাসন, অথবা, নর্মদার শিব এবং গোমতী ও নেপালের শালগ্রাম শিলা। এখানকার পথে পথে প্রত্যেক প্রদেশের খাবার কেনা যায়, এখানকার সীমানার ভেতরে ভারতের প্রত্যেক জাতির ভাষা শোনা যায়।

শোনা যায়, ভারতের সব জায়গায়, ধর্ম ও প্রথার প্রশ্নের চরম মীমাংসা হয় বারাণসীতে। এখানে দিনের খাদ্য দেবতাকে দেওয়া হয়েছে, খবর পেলে গোয়ালিয়রের রাজপুত্ররা আহার করেন। এখানে প্রাচীন ধর্ম ও শিল্পের নিদর্শন, প্রাচীন শিল্পের ধারক বৃদ্ধ কারিগর এখনও রয়েছে, এখনও হয়ত তাদের দেখা যেতে পারে, অথচ অন্য সব জায়গায় তারা এত বিরল যে, প্রায় বিলুপ্ত হতে চলেছে। এখানে ঘাটে মহাকাব্যের কাহিনীর নির্ভরযোগ্য রচনাগুলি ব্যাসরা গেয়ে শোনান। এখানে, বড় বড় ভোজে এখনও খাদ্যের চেয়ে শাস্ত্রপাঠের গুরুত্ব বেশী। এ কথা একেবারে স্পষ্ট যে, নগর ও ধর্মকেন্দ্রিক ল্যাটিন সাম্রাজ্যে যেমন প্রবাদ ছিল, "সব পথ রোমে পৌঁছেছে", তেমন ভারতেও, যতদিন ভারত রয়েছে, ততদিন সব পথ, সব ধর্ম, সব যুগ, সব ঐতিহাসিক ঘটনা কোন-না-কোন সময়ে আমাদের বারাণসীতে নিয়ে যাবে।

এরকম জায়গায়, এত বিচিত্র তাৎপর্যে মণ্ডিত, একটি মহাদেশের তীর্থকেন্দ্র এই শহরের নিশ্চয় দৃঢ় নাগরিক সংগঠনের গভীর প্রয়োজন ছিল। গঠিত হওয়ার সময়ে এরকম প্রয়োজন যে শহরে স্বীকৃত হয়েছিল, তা আমরা বহুভাবে দেখতে পাই। এখানকার মত স্বায়ত্তশাসনের এমন প্রমাণ ইউরোপের কোন মধ্যযুগীয় শহরে আমরা পাই না।

ইউরোপীয় মহান সমাজতত্ত্ববিদ ক্রোপোৎকিন বলেন, "মধ্যযুগীয় শহরের সংগঠনে দুটি স্তর আছে; সব গৃহস্থরা ছোট ছোট অঞ্চলিক দলে সংগঠিত হত—রাস্তা, গ্রাম, অঞ্চল অনুযায়ী—আর ব্যক্তিরা প্রতিজ্ঞা ক'রে পেশা অনুযায়ী এক এক দলে সংঘবদ্ধ হত; প্রথমটি, শহরের গ্রামসাম্প্রদায়িক উৎসের ফল আর দ্বিতীয়টি, নতুন অবস্থার ফলে উদ্ভূত পরবর্তী ধাপ।"

এই শহরের উন্নতির কারণস্বরূপ আমরা যদি 'পরিশ্রম' সংক্রান্ত ইউরোপীয় ধারণা বাতিল ক'রে দিই, তাহ'লে এ বিবৃতি অভ্রান্ত এবং এখনই তা এখানে প্রয়োগ করা যায়. ইউরোপীয় ধারণার বদলে তার পরিবর্তরূপে আমাদের আনতে হবে ধর্ম ও শিক্ষাসংক্রান্ত ভারতীয় ধারণা। এখনও পরিশ্রম অবশ্যই রয়েছে, আমরা জানি তার উন্নতিও হয়েছে এখানে গত অন্ততঃ তিন-হাজার বছরে। কিন্তু বারাণসীর গঠনের ক্ষেত্রে তা কখনও প্রধান ও স্ব-নির্ভর উপাদান হয়ে মাথা তুলতে পারে নি। এই মূল তাৎপর্য, মিলনের এই উন্নততর উপাদান এখানে এনেছে পুরোহিত ও পণ্ডিত, মঠ ও কবিদের উপস্থিতি এরা পেশাগত কারণে যে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত তা নয়, এরা যুক্ত জাতি, প্রথা, ধর্মীয় সম্পর্কের অদৃশ্য, আধ্যাত্মিক বন্ধনে—সংক্ষেপে, হিন্দুধর্মের বন্ধনে। কারিগর নয়, হিন্দুর কারিগর সুলভ মনোভাব বারাণসীকে বর্তমানের রূপদান করেছে এবং এখানে, এই শহরে অমরা জানতে পেরেছি যে, বৈদেশিক প্রভাব থেকে মুক্ত এবং সমগ্র জাতির সোৎসাহ সহযোগিতায় ধন্য ভারতীয় বিশ্বাস কি সূক্ষ্ম ছবি সৃষ্টি করতে পারে। এ কোন সামান্য কাজ নয়। এর দ্বারা গঠিত বারাণসীতে হিন্দুর প্রতিভা ভালভাবে প্রকাশ পেতে পারে। সে শিবের শহরের কাছে এর বিচার দাবী করতে পারে।

অবশ্য, এই শহর সম্বন্ধে ক্রোপোৎকিনের বিশ্লেষণের প্রথম উপাদানের কথা যখন ভাবি, তখন দেখি, বারাণসীর অতি উজ্জ্বলরূপ। একটা তীর্থস্থানিক শহরে আমাদের স্বভাবতঃ মনে হয় যে, আত্মরক্ষার জন্য গৃহস্থদের কোন যৌথ সংগঠন নিশ্চয় খুব দরকারী। এরকম শহরের রক্ষার প্রয়োজন অন্য জায়গার চেয়ে বেশী। পয়ঃপ্রণালী, রোগী-পরিবহন, হাসপাতালের কাজ, অবাঞ্ছিতদের বিতাড়নের কি ব্যবস্থা ছিল? হয়ত মধ্যযুগে এ সব কাজের নাম এরকম ছিল না, কিন্তু নিশ্চয় এদের অস্তিত্ব ছিল এবং এ সব প্রয়োজন মেটাতে হত। গৃহস্থরা ছোট ছোট আঞ্চলিক সংগঠনে আবদ্ধ হত—রাস্তা, পাড়া অনুযায়ী। বারাণসী শহরের প্রধান রাস্তাগুলি কি ছোট ছোট চত্বর আর গলিতে বিভক্ত নয়, বড় রাস্তা থেকে উঠে গেছে কয়েক ধাপ চওড়া সিঁড়ি, তার শেষে আলাদা দরজা? এ সব দরজার প্রতিটিতে যখন আলাদা প্রহরী থাকত এবং রাতে দরজা বন্ধ হয়ে সকালে খুলত, সে কি ত্রিশ-চল্লিশ বছরেরও বেশী আগে? অবশ্য বহু জায়গায় এখন বড় বড় দরজাগুলি আপনিই সরে গেছে, কিন্তু থাম, আংটা, কব্জা এখনও তাদের প্রাচীন ব্যবহারের সাক্ষ্য দেয়। অন্যত্র, দরজাগুলি এখনও দেওয়ালের গায়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেতে গিয়ে এক মুহূর্ত থমকে থেমে লোক নিজের মনে প্রশ্ন করে, "কবে এ দরজা শেষ বন্ধ হয়েছিল?" এক-এক বাঁক গুরুত্বপূর্ণ বাড়ীর সামনে এই দরজাগুলি, হিন্দুদের দ্বারা গঠিত বারাণসীর শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতার নীরব সাক্ষী। এডিনবরা, নুর্ণবার্গ, প্যারীর মত এখানেও সন্ধ্যার পরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এইভাবে ধনীদের বাড়ীগুলির দরজা বন্ধ হওয়ার ফলে ঐ জায়গাগুলি অপরিচ্ছন্নতা ও বিপদ থেকে রেহাই পেত। শহরের ভূগর্ভ পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের

পয়ঃপ্রণালীর যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব ওদেরই নিতে হত, শহরের এ ব্যবস্থা ছিল প্রাচীন পাটলীপুত্রের অনুরূপ। এদের নিজস্ব এলাকার মধ্যে যারা বিপদগ্রস্ত হত তাদের বিপদমুক্ত করার দায়িত্ব থাকত ওদের এবং সারা শহরের সাধারণ দায়িত্বে এরা পূর্ণ অংশ গ্রহণ করত। কিন্তু পাড়া বা আঞ্চলিক যে সব দরজা এখনও বাজার এলাকায় রয়েছে, সেখানে প্রহরীরা পাহারা দেয় সেগুলি দেখলে আমরা নাগরিক ব্যবস্থা এবং দৃঢ় ও শান্তিপূর্ণ নগর-প্রতিরক্ষার পূর্ণ গুরুত্ব বুঝতে পারি। কারণ এখানে, এইসব দরজার অভ্যন্তরে আমরা দেখতে পাই স্বর্গের প্রহরী কালভৈরবের মন্দির, তিনি দণ্ড ও কুকুর নিয়ে রাতের পর রাত শিবের শহর পাহারা দেন, প্রহরী ও দ্বারপালরা এঁর পূজা করে, ঐ পবিত্র সীমানায় কে ঢুকবে না ঢুকবে, তা স্থির করার চরম ক্ষমতা এঁর হাতে। প্রত্যেক প্রহরী নিজেকে এই স্বর্গীয় প্রহরীর ভৃত্য ও পার্থিব প্রতিনিধি বলে মনে করত। শিবের কৃষ্ণ দৈত্যানুচর এই কালভৈরবের পূজায় আমরা মধ্যযুগে বারাণসীর নগর সংগঠনের সম্পূর্ণ ইতিহাস দেখতে পাই।

অন্য জায়গার চেয়ে এখানে আধুনিক যুগ সম্ভবতঃ দেরীতে এসেছে। কিন্তু এসেছে এবং অন্য জায়গার মত এখানেও তার কাজ ছিল সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলা আর উন্নতির গতি যে যুগে ধীর ছিল, সে যুগে যে-সব সমাধান আবিষ্কৃত হয়ে ছিল, সেগুলিকে অবহেলা করা। স্থানীয় ও আঞ্চলিক বহুবিধ দায়িত্বের সমন্বয়ের সূত্রে গঠিত আত্মরক্ষার যে দৃঢ় রজ্জুতে বারাণসী নিজের প্রয়োজন মেটাতে পারত, সে রজ্জু এখন নেই। এ আঘাতে সাম্প্রদায়িকতাবোধ বিমূঢ় হয়ে গেছে। কারণ, এ কথা তাকে বোঝানো হয়েছে যে, শক্তির দৃঢ়, কেন্দ্রীয় সমন্বয়ের কাছে সে অসহায়। এইভাবে, নগর-সংগঠনের প্রাচীন অধিকার ও প্রাচীন স্বায়ত্তশাসন লুপ্ত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে রেলপথ বারাণসীকে ভারতের সব জায়গার সঙ্গে যুক্ত করেছে। আগে যত লোক সারা বছরে পায়ে হেঁটে বা নৌকায় এখানে আসত, এখন রোজ ততজন রুগ্ণ, পঙ্গু, ক্ষুধার্ত লোকের পক্ষে আসা সম্ভব হচ্ছে।

এইভাবে আধুনিক বারাণসীতে অজস্র প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। অতীত যুগের মানুষের সাধারণ বুদ্ধি, স্বতস্ফূর্ত সহানুভূতি এবং সতর্ক নগর-প্রশাসন থাকলেও এ সব প্রয়োজনের কথা তারা জানত না। এখনও মুমূর্ষুরা এখানে মারা যেতে আসে, কিন্তু এখন শহরে পৌঁছনো অত সহজ নয় বলে ওরা একেবারে নিরাশ্রয় অবস্থায়, রোগ, ক্ষুধা, কষ্ট নিয়ে ঘাটে, রাস্তার ধারে পড়ে থাকে, হিন্দুর মানবিকতা ও শোভনতার প্রতি যে ভালবাসা, তার সঙ্গে এটা খাপ খায় না।

দরিদ্র মেহনতী মানুষরা শেষ আশাও হারিয়ে গেলে এখানে আসে এই বিশ্বাসে যে, মহাদেব নিজের শহরে তাদের শেষ আশ্রয় হবেন। প্রাচীনকালে বারাণসী যখন ছিল সমৃদ্ধ রাজধানী, তখন হলে এরা নিজেদের জেলার শহরের ধনী লোকদের কোন বাড়ী বা পাড়ায় যেত, তাদের সদয় প্রচেষ্টায় কোন-না-কোন সময়ে কাজ পেয়ে যেত। কিন্তু এখন এরা কাউকে চেনে না। এদের একমাত্র পরিচিত শব্দ

হ'ল, মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ। পুরোহিত ও অন্যান্য ভক্তরাও অপরিচিত। এই আশ্রয়স্থলে এসে এরা দেখে এক হতাশা থেকে আর-এক হতাশায় এসে পড়েছে।

অথবা, দরিদ্র ছাত্র এখানে পড়তে আসে। আগেকার দিনে সে গুরুর বা কোন ধনী পৃষ্ঠপোষকের গৃহে আশ্রয় ও খাদ্য পেত, অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের একজনের মত সেখানে সেবা পেত। এখন তথাকথিত ছাত্রের সংখ্যা বিরাট এবং সম্ভবতঃ এদের মধ্যে অনেকে অলস। নিশ্চয় প্রলোভন অনেক বেড়ে গেছে, সেই সঙ্গে দূরের গৃহ আর শহরের পাড়ায় প্রাচীন সম্পর্কের নৈতিক ধারাবাহিকতা হারিয়ে গেছে। যাই হোক, অতি আগ্রহী ছাত্রদের মধ্যেও এরকম কিছু ছেলেকে আমরা দেখেছি, রাস্তায় থাকতে হয়। এরা যখন অসুখে পড়ে, সাহায্য করার কেউ থাকে না। 'ছত্র' সত্যিই চমৎকার প্রতিষ্ঠান, এই প্রাচীন শহরের সন্তানদের প্রয়োজন মেটাবার আশ্চর্য ক্ষমতা এতে দেখা যায়। অথচ, মাঝে মাঝে বাড়ী হাসপাতাল দরকার হয়।

শেষে রয়েছে, বিধবা ভদ্র স্ত্রীলোকদের সমস্যা, যারা মৃত স্বামীদের জন্য প্রার্থনা করতে এখানে আসে। অন্যদের মত এদেরও অনেক ক্ষেত্রে ব্যবস্থা খুব সামান্য। তবু, এখন এরা বন্ধুদের কাছে আসতে পারে, এদের ঘর ভাড়া ক'রে বাড়ীওয়ালাকে ভাড়া দিতে হয়। ভাড়া অনেকদিন বাকী পড়লে বাড়ীওয়ালা যখন ভাড়াটেকে বার ক'রে দেয়—সে ভাড়াটে স্ত্রীলোক এবং দুর্বল হ'লেও—ঐ বাড়ীওয়ালা সম্বন্ধে আমরা কঠোর ভাব পোষণ করতে পারি না। কারণ, সে হয়ত ব্যাপারটা এইভাবে ভেবেছে যে, নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে হ'লে এই পথে যেতে সে বাধ্য। এর চেয়েও অদ্ভুত হ'ল পুলিশের ভয়, অসহায়দের মধ্যে এ ভয় আমরা সর্বদা দেখি এবং এই ভয়ের কারণে, ফ্ল্যাটবাড়ার তত্ত্বাবধায়করা বাড়ীর নিরুপদ্রব মুমূর্ষু ভাড়াটেকে বার ক'রে দেয়, পাছে পরে জিনিষচুরির দায়ে তাকে আদালতে যেতে হয়।

অতএব, আধুনিক যুগের ধ্বংসাত্মক স্পর্শের ফলে এখন বারাণসী সবচেয়ে খাঁটি মধ্যযুগীয় শহর। চার হাজার বছর বা তার বেশী সময় ধরে অবিরাম উন্নতির পর সে কি সন্তানদের কাছে স্মৃতিমাত্র হয়ে থাকবে? নাকি, যে উৎসাহের নতুন ধারা জাতির শিরায় শিরায় বইছে, তারই কি কোন যাদুর বলে সে আবার প্রাচীন জীবনধারাকে নতুন ক'রে তুলতে পারবে? জাতীয়তাবাদী ভারতের পুত্র-কন্যারা, তোমাদের পিতৃপুরুষদের দান প্রাচীন শহরগুলির জন্য তোমাদের কি করার বাসনা রয়েছে?

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়ার ক্ষেত্রে ইতিহাসকে ভুলভাবে পড়ার একটা অন্যায় প্রবণতা রয়েছে, ঐ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান থাকলে এ ইতিহাস পড়া খুব দ্রুত শেষ হ'তে পারে না। ভারতে একসময়ে হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম—এই দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম ছিল, এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ইউরোপীয় কল্পনা। এর উদ্দেশ্য, ইউরোপীয় মনের অভিপ্রেত পথে এশীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করা। এ কথা আর পুনরাবৃত্তি করার দরকার নেই যে, ভারতে নিজস্ব পুরোহিত, মন্দির ও মতবাদযুক্ত বৌদ্ধধর্ম নামে কোন ধর্ম কখনও ছিল না। হিন্দুধর্ম নামেও কোন ধর্ম ছিল না। হিন্দুধর্মের নামকরণ ও সংজ্ঞা নির্ধারণের ধারণা। মুসলিম যুগের আগে পর্যন্ত, অবাস্তব এবং ১৮৯৩ সালে শিকাগোর ধর্মসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের বিখ্যাত বক্তৃতা যখন সারা ভারতে গৃহীত ও স্বীকৃত হ'ল, তার আগে পর্যন্ত এ কাজ প্রকৃত পক্ষে হয়েছে ব'লে মনে করা যায় না। অতএব, ভারতে কোন একসময়ে বৌদ্ধধর্মকে ছাড়িয়ে উঠেছিল হিন্দুধর্ম এবং বুদ্ধগয়ার মন্দিরের দায়িত্ব এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর হাতে গিয়েছিল, এ কথা মনে করাটা অদ্ভুত। অর্থাৎ, এ ধারণা যাদের মনে রয়েছে, তারা অত্যন্ত অশিক্ষিত না হ'লে এ ধারণা হবে অদ্ভুত। বস্তুতঃ, বুদ্ধগয়ার গ্রাম ও মন্দির প্রায় পঁচিশ শতাব্দী ধরে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মানুষের বিশ্বাসের প্রমাণ হওয়ার ফলে ঐতিহাসিক স্মারকরূপে সে এত অসাধারণ যে, এই জাতীয় স্মারকের ক্ষেত্রে এর কাছাকাছি আসার মত কিছু নেই। এখন আমরা সুজাতার বাড়ীর চিহ্ন খুঁজে পাই—সুজাতা এক গ্রাম্য-নারী, যে বুদ্ধকে বোধিলাভের আগের দিন খাদ্য দিয়েছিল, আমরা প্রাচীন গ্রাম, জঙ্গল, নদী, পুকুরের একটা ধারণা করতে পারি, যেখানে একটা বিশেষ গাছ ছিল, সে জায়গা আমরা সঠিক চিনতে পারি; এ সব ঘটেছে খ্রীস্টের জন্মের পাঁচ থেকে ছয় শতাব্দী আগে। নরওয়ের পশ্চিম তীরে একটা গাছ আছে, তার কথা গানে পাওয়া যায়। কিন্তু ১১ শতাব্দী পর্যন্ত সে সব গান লেখা হয় নি। এথেন্স শহরের ইতিহাস বুদ্ধগয়ার মত প্রাচীন, কিন্তু এথেন্স শহরের রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। জেরুসালেম হয়ত আরও প্রাচীন, কিন্তু ইহুদী সম্প্রদায় তাদের দায়িত্ব অন্যান্য আরবদের হাতে দিতে বাধ্য হয়েছিল। বুদ্ধগয়া এ ক্ষেত্রে একক। ব্যক্তির প্রকাশের অন্তরঙ্গতা ও খুঁটিনাটিতেও সে একক। অশোক যুগের

বেষ্টনীর ভিতরের পথের এক অংশ জুড়ে উনিশটি পদ্মচিহ্নিত যে দীর্ঘ স্মারক রয়েছে, এমন রোমাঞ্চকর স্মারক খুব কম আছে। আমরা শুনেছি, "বুদ্ধত্ব লাভের পর সাতদিন বুদ্ধ কথা বলেন নি। তিনি নীরবে এখানে পায়চারি করতেন আর প্রতি পদক্ষেপে একটি ক'রে পদ্ম ফুটে উঠত।" এ গল্পের অর্থ কি আমরা বুঝতে পারি না? সব শেষে আমরা যখন উঁচু বেদীর পিছনে, বেষ্টনীর ভিতরে বেড়ে-ওঠা গাছটির কাছে আসি, তখন জগৎ হয়ে উঠেছে কবিতা,—অর্থাৎ, প্রকৃতপক্ষে এটি বর্তমান পূর্ব এশিয়ার আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। অথবা, ইচ্ছা করলে, আমরা এই গাছের মৃত্যু, অলৌকিকভাবে তার পুনর্জীবনকে কেন্দ্র ক'রে বৌদ্ধ-জগতের ক্রমোন্নতি অনুধাবন করতে পারি—স্মারকগুলিতে অশোকের প্রস্তরচিত্রে এই গাছের ইতিহাস রয়েছে—এই জায়গা সম্বন্ধে যুগ-যুগব্যাপী ইতিহাস রয়েছে চীনা, জাপানী, শ্যাম, বর্মী, সিংহলী স্মারকে।

কিন্তু ঐ বৌদ্ধ জগৎ এবং তার বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে ভারতে সামান্য জানা গেছে। আমাদের অনেক পাঠক হয়তো শুনলে অবাক হবেন, বৌদ্ধধর্ম উত্তর ও দক্ষিণ, এই দুইভাগে বিভক্ত। উত্তর গোষ্ঠীতে রয়েছে চীন, জাপান, তিব্বত; সিংহল রয়েছে দক্ষিণী গোষ্ঠীতে। যদি আমরা কল্পনা করি যে, হিন্দুধর্মে জাতিভেদ নেই; সব মূর্তি ও পূজার প্রতি রয়েছে উদার মনোভাব; ধ্যানের উন্নতি ঘটেছে: ধর্মীয় চেতনায় দার্শনিকের শূন্যবাদ থেকে শিশুর পুতুল পূজা পর্যন্ত সব স্তরের অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে, তাহ'লে জাপান যে উত্তর গোষ্ঠীতে রয়েছে তার একটা স্পষ্ট ছবি পাব। এটা আসলে হিন্দুধর্মেরই সহোদর। অন্যদিকে, দক্ষিণী গোষ্ঠী আদৌ এরকম নয়। সিংহলী লোকের চীন-জাপানের বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক যেন, হিন্দুধর্মের কোনো গোঁড়া, বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কের মত। এ ধর্ম অত্যন্ত দার্শনিক। এর থেকে বোঝা যায়, এ ধর্ম জনপ্রিয় পূজাকে অন্তর্ভুক্ত না না ক'রে বাদ দিয়েছে। এর লক্ষ্য সম্পূর্ণতা। এর কাছে 'ঈশ্বর' কথাটি কু-সংস্কার। এর কাছে 'ঈশ্বর' কথাটি কুসংস্কার। অতএব দেখা যাচ্ছে, জাপানী বা উত্তর সম্প্রদায় হয়ত দক্ষিণী গোষ্ঠীকে গ্রহণ করতে পারে. কিন্তু দক্ষিণীরা তা কখনো করবে না, সিংহলী সম্প্রদায় যে ক্ষমতা পেয়েছে, চীন-জাপানগোষ্ঠী তাকে বিপজ্জনক মনে করবে, তারা এই কথা বলতে চাইবে বৌদ্ধ গোঁড়ামির একটা যুক্তিহীন মান গড়ে তোলা হয়েছে। বস্তুতঃ বিভিন্ন গোষ্ঠীর মনোভাব ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট মনোভাবের সঙ্গে তুলনীয়। জাপানের ছেলেমেয়েরা যে "মহাযান" বা মহৎ পথে জন্ম নিয়েছে তাতে

গৌরব এবং দুঃখের কথা, যে দুর্ভাগ্যরা হীন পথ, হীনযান বা দক্ষিণী গোষ্ঠী, তাদের প্রতি বিদ্বেষ অনুভব করতে শেখানো হয়। অবস্থা অন্যরকম হতে পারে না, এ ক্ষেত্রে, বৌদ্ধধর্মের সুবিধা আমরা সহজে দেখতে পাই, এতে বৌদ্ধধর্মের প্রধান পবিত্র স্থান রয়েছে এমন লোকদের হাতে, যারা নিজেদের উদার চিন্তার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন, অন্যান্য গোষ্ঠীর মতের সঙ্গে তারা কোন যোগ রাখে না। অন্যদিকে বুদ্ধগয়ার গিরি সন্ন্যাসীরা যে আতিথ্য ও সৌজন্য দেখায়, তাতে হিন্দুরা খুব গর্ব অনুভব করে। এই ভদ্রতায় একটা রাজকীয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কারণ অতিথি আসামাত্র মোহান্ত—ইনি নিজেও সম্পূর্ণ হিন্দু সন্ন্যাসী—জানতে চান, অতিথি মাংস না মদ চায়, তাকে ইচ্ছা নির্দ্বিধায় জানাবার জন্য অনুরোধ করেন। স্পষ্ট বোঝা যায়, বুদ্ধগয়ার মঠাধ্যক্ষ বংশপরম্পরায় অভ্যর্থনায় অভ্যস্ত। এ কথা কি সত্য নয়? বিদেশ থেকে আগত তীর্থযাত্রী কি এক অর্থে দূত নয়? মোহান্তের মাধ্যমে প্রকাশিত সৌজন্য কি এশিয়ার অন্যান্য জাতির প্রতি সমগ্র ভারতীয় জনগণের বন্ধুত্ব ও অভ্যর্থনা নয়?

বুদ্ধগয়ায় গেলে শঙ্করাচার্যের ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর পূর্বসূরীদের ভাবধারা ও শিক্ষার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসায় সবচেয়ে বেশী উৎসাহ যোগায়। বৌদ্ধধর্ম ও হিন্দুধর্মকে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী মনে ক'রে নির্বোধ, অল্পবিত্তর বিস্তর নিরক্ষর লোকরা প্রমাণ করে যে, শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধের মধ্যে বিরাট কালগত ব্যবধানকে তারা বুঝতে পারে না; রোমক চার্চের কোন ঐতিহাসিক যদি জেসুইট ও বেনেডিক্টাইন গোষ্ঠীকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করতেন, তাহ'লে এই ভুলই হত—আসলে ঐ দুটি গোষ্ঠী দুই সময়ে গঠিত হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে এবং দুটি সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যের সঙ্গে পাশাপাশি রয়েছে। বুদ্ধ লক্ষ্যকে বলেছেন 'নির্বাণ'। শঙ্করাচার্য তার নাম দিয়েছেন 'মুক্তি'। কিন্তু এ হল একই বস্তুর দুটি আলাদা নাম। শঙ্করাচার্য শুধু অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও আধ্যাত্মিকতার শক্তিতে নিজের যুগের নেতা হয়ে উঠেছিলেন, বর্তমানের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা খুব স্বাভাবিক যে—তখন সম্ভবতঃ অবহেলিত বুদ্ধগয়ার মন্দিরকে বাঁচানোর ও রক্ষার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করবেন। যেভাবে এই রক্ষার কাজ হয়েছে, তার জন্য ভারত নিশ্চয় গর্ববোধ করতে পারে। একটি বিশেষ গাছের কাছে মিষ্টান্ন নিবেদন করা এবং কিছু পাঠ করা হয়ত আধুনিক মানুষের কাছে নিরর্থক মনে হবে। যে নিরক্ষর পুরুষ ও স্ত্রীলোকরা এইসব আচার পালন করছে, তারা নিজেরাও হয়ত তাদের কাজের ঐতিহাসিক

যোগসূত্রের কথা জানে না। কিন্তু এই অপরিণত পদ্ধতিগুলিই একমাত্র উপায় যার দ্বারা জনগণ সেই মহান যুগের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। তাহ'লে সব স্মৃতিকে যথাযথভাবে রাখতে হিন্দুধর্মের মত ধর্মকে কি কষ্ট করতে হয়েছে ? শঙ্করাচার্যের শিষ্যরা বুদ্ধকে এত ভালবাসতেন যে, তাঁকে মনে রাখা আধুনিক হিন্দু-ধর্মের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে, এ তথ্য বিস্ময়কর এবং শুধু এশিয়াতে এরকম হওয়া সম্ভব, সেজন্য ইউরোপীয় ছাত্ররা এটা কখনো বুঝতে পারে না। তাদের কাছে নাগার্জুন, অশ্বঘোষ, বোধিধর্মা, সবাই শঙ্করাচার্যের মতবাদের বিরোধী মতের সচেতন সমর্থক। সম্ভব হলে বিরোধী মতকে এঁরা ধ্বংস করতেন বা নিজেরা ধ্বংস হতেন। এক জাপানী বৌদ্ধ পুরোহিত বুদ্ধগয়া প্রথম দেখতে গিয়ে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কথা বলেছিলেন,—"এখন শঙ্করাচার্যকে বুঝতে পেরেছি। উনি ছিলেন দ্বিতীয় নাগার্জুন। "বলা বাহুল্য, দৃষ্টিভঙ্গী যথার্থ, একথা আরও সত্য কারণ, এর অর্থ বুঝতে সমগ্র এশীয় সংস্কৃতির প্রয়োজন হয়। তাহলে, বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধের মন্দির হল, নানা ধর্মের যথার্থ মিলনস্থল, চীন বা জাপানে অবস্থিত অবস্থিত হলেও এ মন্দির এরকমই হত। এখানে আমরা দেখতে পাই, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের দুটি ভিন্নমুখী শাখা গ'ড়ে উঠেছে, অশোক যুগের পর জনপ্রিয় ধর্মের বৃক্ষ এই দুই ধারায় বিভক্ত হয়েছিল। বুদ্ধের হীরক সিংহাসন—বিখ্যাত "বজ্রপ্রস্তর—বিষ্ণুপদ, মায়ের ও শিবের মন্দিরের পাশাপাশি রয়েছে এবং একটি থেকে অন্যটিতে যাওয়ার সময়ে আমরা বহু শতাব্দীব্যাপী সময়ের ধর্মীয় ভাবধারার সবগুলি স্তর দেখতে পাই। সম্ভবতঃ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল, প্রাচ্যের যে অদ্বৈতবাদ সব রকম প্রতীককে রক্ষা করে এবং পাশ্চাত্ত্যের যে প্রোটেস্টাণ্ট মত বা একেশ্বরবাদ কোন কিছুকে কুসংস্কার ব'লে ভাবলেই ত্যাগ করে। এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য আমাদের বিস্মিত করে। বুদ্ধ বা শঙ্করাচার্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী অন্যান্য মতকেও রক্ষা করে ও উৎসাহ দেয়, সে জানে, মহান উপলব্ধি লাভ করার এগুলি বিভিন্ন পথ।

অবশ্য, আরও একটা কারণে বুদ্ধগয়া আজকের দিনে হিন্দু জনগণের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। আধুনিক চেতনা অনেক বিষয়কে অনিবার্য ক'রে তুলেছে। এজন্য হিন্দুধর্মের বিভিন্ন অংশের ঐতিহাসিক সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করা দরকার। কিন্তু অধিকাংশ হিন্দু মন্দিরে আধুনিক হিন্দু—ছদ্মবেশে না গেলে,—ঢুকতে পায় না। বুদ্ধগয়ায় এরকম হয় না। ওখানে মঠের চিরাচরিত দায়িত্ব হ'ল বিদেশীদের ধর্মাচরণকে সুরক্ষিত করা। অতএব, সকলে সশ্রদ্ধ চিত্তে আসুক, এটুকু শুধু দাবী

করা চলে এবং বেদীমূলে অতিগোঁড়া লোকের মত আধুনিক হিন্দুও অভ্যর্থিত হয়। সন্ন্যাসীরা শুধু যে তাকে প্রবেশের আমন্ত্রণ জানান, তাই নয়, উপরন্তু যতক্ষণ সে পূজা করে ততক্ষণ তাকে খাওয়ানোর দায়িত্ব ও তাঁরা গ্রহণ করেন। এই কারণে বুদ্ধগয়া এক বিরাট জাতীয় ও ধর্মীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। পুরী যে ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিল, কিন্তু পারে নি, সে ভার নিয়েছে বুদ্ধগয়া। এখানে ভারতের সব সন্তান, এমনকি বুদ্ধের শিষ্যেরাও এসে প্রণাম জানাতে পারে। কারণ, বুদ্ধের হৃদয় কি পৃথিবীর মত বিশাল ছিল না? তাঁর ভাইদের কাছে কি তাঁর গৃহের দ্বার রুদ্ধ থাকবে?

পরিশিষ্ট—১

নিম্নলিখিত শিরোনামযুক্ত মূল রচনাটির শেষ অনুচ্ছেদগুলি 'ভারতীয় ইতিহাসের পদক্ষেপ'-এ 'বারাণসীর একটি আলোচনা' নামে প্রকাশিত হয়।

বারাণসী ও সেবাকেন্দ্র

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে আসার পথে এগুলি কয়েকটি পরিস্থিতি মাত্র। প্রাচীনকালে যখন স্থানীয় চেতনা বিপুল সমস্যার সঙ্গে সংগ্রাম করেছে, তখন সে দেখেছে তার সহযোগী অথচ উন্নততর উপাদান তাকে সাহায্য করেছে। হিন্দুধর্মের উদার মাতৃহৃদয়ে নাগরিক প্রয়োজন সাড়া জাগিয়েছে, সে জানত কি ভাবে কাজ করতে হয়। যতদিন আঞ্চলিক উপায়গুলির এই সুযোগ সত্যি ধ্বংস না হয়, ততদিন এরকম হবেই। যেখানে স্থানীয় সহানুভূতিবোধ অথবা সাহায্য ও পরিকল্পনার শক্তি যথেষ্ট নয়, সেখানে ধর্মকে হস্তক্ষেপ করতে হবে। যেখানে ধর্ম একা, সহায়হীন, সেখানে শহর সাহায্য করবে। এমন সময় যখন আসবে, যে, দুজনেই হতাশায় ভেঙে পড়বে, চেষ্টা আর করবেনা, তখন ঘটলে সমাপ্তি, নিঃসঙ্গতা দেবে দেখা।

এখানে যে সব কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার সম্মুখীন হয়ে ১৯০০ সালে একদল যুবক একত্র হয়ে বারাণসীর দুঃখীদের সাহায্য করার জন্য একটা সেবাদল গঠন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তারা শ্রীরামকৃষ্ণের নাম নিয়ে জড়ো হয়। ১৯০২ সালে স্বামী বিবেকানন্দ শেষ ভ্রমণের সময় এই শহরে এসে ওরা তাঁর দর্শন ও আশীর্বাদ পায়। এদের একজন এখনো নিজের পদে অবিচল থেকে যে উদ্দেশ্যকে প্রথম খুঁজে পেয়েছিল তার জন্য দিনের পর দিন একভাবে কাজ ক'রে চলেছে। একজন এক রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে গুলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। কিন্তু এখন সেবাকেন্দ্রের কাজ চলছে, হাওড়ার বেলুড় মঠ থেকে কর্মী পাঠানো হচ্ছে, তাঁরা সবাই সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী। কাজটা শ্রমসাধ্য। একজনকে কর্মাধ্যক্ষ, গ্রন্থাগারিক ও কম্পাউণ্ডারের কাজ করতে হয়। আর-একজন রোগীদের খাওয়ায় ও সেবা করে। তৃতীয় জন দরজায় দরজায় চাল ভিক্ষা করে, আবার সে অন্যত্র সাহায্য জোগায় বা দরিদ্রদের দেখতে যায়। একজন সন্ন্যাসী সমস্ত কাজটার দায়িত্বে থাকেন। তিনজন ভৃত্য, একজন রাঁধুনী, একজন ঝাড়ুদার, একজন ঠিকাদারী বা ঝি আছে। এই সামান্য সম্বলের দ্বারা প্রাপ্তফল বোঝা যাবে পরবর্তী বিবরণ থেকে। এখনই এমন কাজ হয়েছে যে, এই কাজ বাড়ানোর দরকার হয়ে পড়ছে।

দেখা যাচ্ছে, যে বৃদ্ধ লোকেরা এখানে থাকতে চান, রোগীদের সঙ্গে তাঁদের একঘরে রাখা চলবে না, কাজটা জরুরী। আবার কলেরা ও যক্ষ্মার মত সংক্রামক রোগেরও আলাদা জায়গা অবশ্যই থাকা উচিত। বর্তমান ক্ষেত্রে

এরকম রোগী খুব জরুরী হলে নেওয়া হয়, অথচ চৌকাঘাট হাসপাতাল ছাড়া এদের আর কোন জায়গা নেই. ঐ হাসপাতাল কাশীর পবিত্র সীমানার বাইরে, হিন্দুরা শুনে আতঙ্কিত হয় যে, ওখানে মৃতদেহ সৎকার করে ঝাড়ুদাররা। যারা আমাদের ধর্মের লোক, তারা শেষ মুহূর্তে পরিচর্যা করবে, সস্নেহ সেবায় শেষ অনুষ্ঠান পালন করবে, যেন তারা মৃতের আপন সন্তান—এই সুবিধা সম্বন্ধে কোন তর্ক করার দরকার নেই! সেবাকেন্দ্রের অনুগত কর্মীরাও মনে করেন যে, বসন্ত ও প্লেগের রোগী রাখার ব্যবস্থা তাঁদের করতে হবে। ওঁরা অস্ত্রোপচারে রোগীদের জন্য একটা ঘর চান। যারা দরিদ্র, বৃদ্ধ, যাদের এখন নিজেদের বাড়ীতে সেবা করতে হচ্ছে অতিকদর্য শৌচাগারের ব্যবস্থা মেপে নিয়ে তাদের জন্য ওঁরা জায়গা চান। সবশেষে, ওঁরা কর্মীদের নিজেদের জন্য এবং রোগীদের একটি গ্রন্থাগার ও উন্নত ধরনের ওষুধ-বিতরণকেন্দ্র চান।

এই সব বাড়ীর জন্য ভালো একটুকরো জমি সংগৃহীত হয়েছে, এখন দরকার ২১,০০০ টাকার অতীতের মত ভবিষ্যতেও কর্মীরা কেন্দ্র ও তার কাজের নিয়মিত পরিচালনার জন্য মাসিক ও বার্ষিক দান এবং চাঁদার উপরে নির্ভর করেন।

এরকম সাহায্য-প্রার্থনা আমার কাছে কেন্দ্রের সাহায্যভিক্ষা বলে ঠিক মনে হয় না। বরং এ যেন, সামগ্রিক একটি দায়িত্বগ্রহণে সাহায্যের আহ্বান। ধর্মীয় শহররূপে বারাণসীকে রক্ষার সুন্দর প্রথা বজায় রাখতে এবং নাগরিক সমস্যাগুলির সমাধানে সাহায্য করতে সব হিন্দু আগ্রহী। উপরন্তু, এই উদার আহ্বানে প্রত্যেক অঞ্চলের অংশ রয়েছে।

অতএব, সঙ্কট ও যুগান্তরের সময়ে স্থানীয়, সাম্প্রদায়িক বা সম্পূর্ণ নাগরিক চেতনাকে সাহায্য করার জন্য হিন্দু ধর্মের উন্নততর সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টার প্রতীক হল রামকৃষ্ণ সেবাকেন্দ্র। এই কেন্দ্রের জন্ম ধর্ম থেকে, কিন্তু এর লক্ষ্য আধুনিক পৃথিবীর উপযুক্ত, সে লক্ষ্য নাগরিক। ধর্ম একে অনুপ্রাণিত করলেও এর কাজকে সীমিত করেনি। এই সঙ্ঘ শহরের সেবা করতে চায়। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে প্রচুর প্রমাণ রয়েছে যে, এর সেবার পরিধির বাইরে নয় মুসলমানরাও। এরকম সেবা যে দেখা দিয়েছে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দিয়েছে, এতে আমরা মাতৃভূমির চিরন্তনী শক্তির প্রমাণ পাই। এই সঙ্ঘ লক্ষ্যের যে বর্ণনা দিয়েছে তাতে আমরা সভ্যতার উন্নতির প্রত্যেক স্তরে সনাতন ধর্মের যথার্থতাকে দেখতে পাই। আমি সমস্ত হৃদয় দিয়ে বিশ্বাস করি যে, এত অতীব প্রয়োজনীয় কাজের পথ ঐ বীর তরুণ মনদের দেখিয়ে দিয়েছে যে শক্তি, সে তার নিশ্চিত সাফল্যের পথেও ওদের পৌঁছে দেবে। পাঠক, তুমি যেই হও, তুমি কি সাহায্য করতে চাও?

প্রকৃত ধর্মপ্রচারক

ভারতে ধর্মপ্রচারকবৃন্দ

"দেখ, বাঘের দলে যেমন মেষশাবক, তেমন অবস্থায় আমি তোমাদের পাঠাচ্ছি।
সঙ্গে অর্থ, ধর্মপুস্তক, আভরণ নিও না।
পথে কাউকেগ্রহণ করো না।
তারা যা দেবে তাই আহার করবে।
যা উজাড় করে দিয়েছি, তার সবই তাদের দেবে।
সঙ্গে স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল রেখো না, শাস্ত্রগ্রন্থ নিয়ে যেও না, অতিরিক্ত বস্ত্র, আভরণ রেখো না।"

আদিখ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রতি আদেশ

১

যেখানে বলা হয়েছে, 'শেক্স্‌পিয়রের আত্মা তোমাকে এর চেয়ে বেশী ভালবাসতে পারত না। সেই অংশটি এই আলোচনার মূলে পৌঁছেছে। সম্ভবতঃ শেক্স্‌পিয়রের মত মানবজীবনের এত নিপুণ ও সামগ্রিক সমালোচক আর কেউ আসেননি। তাঁর বিশিষ্ট প্রতিভার উপকরণ ছিল অবশ্যই তাঁর অপরিমেয় করুণা, যাকে আমরা বলি ভালবাসা, এরই সাহায্যে তিনি প্রতিটি মানুষের প্রকৃতির ভিত্তি-মূলে নিজেকে বসিয়ে তার জীবনস্রোতের অনুকূলে এগিয়ে যেতেন, তার বিরুদ্ধে যেতেন না। বাস্তবজীবনে কি আমরা প্রত্যেকে হ্যামলেটকে দুর্বল স্বপ্নবিলাসী বলে বিদ্বেষের সঙ্গে এড়িয়ে যেতাম না? আমরা কি কেউ ওথেলো আর জঘন্য খুনীর মধ্যে পার্থক্য দেখতে পেতাম? কিন্তু একবার সেই প্রতিভার বিপুল শ্রদ্ধার দ্বারা প্রভাবিত হলে খুব হালকা স্বভাবের লোকও এমন লঘুভাবে ভাবতে সাহস করবে না। মনে হয়, মহৎ নাট্যকারের প্রতিভা যেন চিন্তার চেয়ে হৃদয়ের ক্ষেত্রে বেশী দান রেখে গেছেন।

বিদেশী জনগণের জীবন ও কর্ম যথার্থভাবে বুঝতে গেলে আমাদের এই শেক্স্‌-পিয়রীয় প্রকৃতির খুব প্রয়োজন। এটা একটা আকস্মিক ঘটনা যে, যে ইল্যাণ্ড শেক্স্‌পিয়রের জন্ম দিয়েছে, অন্য দেশের চেয়ে এই জাতীয় লোকের প্রয়োজন তার বেশী। এ কথা ভাবা যায় না যে, আমাদের মহান কবি এত অপূর্ব-ভাবে ইহুদীদের দুঃখ ও ক্রোধের বিশ্লেষণ করেছেন, অথচ তিনি তাঁর প্রশান্ত দৃষ্টি দিয়ে চীনা, হিন্দু, আফ্রিকাবাসী, রেড ইণ্ডিয়ানদের মুখোশ ভেদ করতে পারতেন না, অথবা বিশ্বমানবতার আবরণে আবৃত করে আমাদের সামনে এমনভাবে তুলে ধরতে পারতেন না, যাতে কয়েক বিষয়ে আমাদের চেয়ে তাদের একটু সংকীর্ণ মনে হলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক মহৎ মনে হয়।

যেখানে ইন্দ্রিয় শুধু বৈচিত্র্য দেখে সেখানে সর্বব্যাপী এককে দেখার ক্ষমতাকে প্রাচ্য সবচেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করে। যে মানুষ এ কাজ অনেক বেশী মাত্রায় করতে পারতেন, তাঁকে ঋষি অথবা পূর্ণদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ বলা হয়। এরকম পূর্ণ দৃষ্টিই ছিল শেক্স্‌পিয়রের বৈশিষ্ট্য। তিনি যদি বর্তমানের ব্যাপক সুযোগের মাঝে থাকতেন, তাহলে মানবতার ঋষি হওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল। অবশ্য আমাদের কাছে এখনই

তিনি মানব-প্রকৃতির ঋষি। কারণ, তাঁর কাছে প্রথা, পরিবেশ, চিন্তাধারা সবই ছিল এক বিশাল জালের মত, যার মাধ্যমে সব মানুষের মূল প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে দেখা দিত।

সব বড় বড় যুগের নিজস্ব কাব্য রয়ে গেছে। প্রাচীন যুগের ভ্রাম্যমান কবিরা বড় বড় জাতীয় মহাকাব্য রচনা করতেন। মধ্যযুগীয় ধর্ম দান্তের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করেছে। দুঃসাহসের যুগের উষাকালে শেক্‌স্‌পিয়র জন্ম নিলেন। যে যুগের শতাব্দী পার হয়ে গেছে সেও এই সব যুগের মত নিজের ক্ষেত্রে মহান। সে জীবনকে বিশ্বজীবনে পরিণত হতে দেখেছে। মানুষের শক্তি কখনো এত চরমে পৌঁছায় নি ব্যক্তির সীমা কখনো এত ব্যাপক হয় নি। তাহলে কি এই যুগের উপযুক্ত কোনো ভবিষ্যদ্বাণী নেই? আমাদের যুগের আলোড়ন-সৃষ্টিকারী বাণীর জন্য কোথায় চারণ কবিরা, কোথায় শেক্‌স্‌পিয়রীয় সহানুভূতি?

যদি এরকম কাজে সাহায্য করাই ইংল্যাণ্ডের নিয়তি হয় এবং তার বিশ্বকাব্যে একটি স্তবক যদি এখনি লেখা হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস, যে বইতে সে কাব্য আমরা পাব তার বয়স এখনো তিন বছরও হয় নি,— ফিল্ডিং হলের 'জনতার আত্মা' (সোল অফ দ্য পিপ্‌ল) অগণ্য সামরিক ও বাণিজ্যিক সাফল্যের চেয়ে এরকম একটি গবেষণার আবির্ভাবে আমাদের দেশ বেশী গৌরবমণ্ডিত হয়। — আলোচ্য লেখকের মত শত শত মন মানুষের প্রয়োজন এবং সে মন সব জাতির হওয়া চাই, কারণ, জ্ঞানী ও সতর্ক লোকেরা যা দেখতে পান না, প্রতি জাতি মানুষ তা দেখতে এবং প্রকাশ করতে পারে। সত্য ঘটনার শান্ত, নিরাসক্ত দর্শকের প্রয়োজন—তার সঙ্গে বলবার মত কিছু কথা থাকা চাই। চাই অনেকটা কবির মত কাজ, যে কবি কাজকে ভেদ করে, কাজ পেরিয়ে তার লক্ষ্যকে দেখতে পান। বিজ্ঞানের পক্ষে শিশুগাছের ডালে রোমের সংখ্যা বা ফুলের রঙের বিন্দু সঠিকভাবে দেখতে পাওয়াটা প্রথম পদক্ষেপমাত্র। দুটির ক্ষেত্রেই নিশ্চয় কোন প্রয়োজন বা বিপদ দেখা দেবে। সেটা বুঝবার পরেও জীবনের সামগ্রিক নাটকে তার স্থান চিহ্নিত করার কাজ বাকী থেকে যায়।

ফুল ও পশুর ক্ষেত্রে যা সত্য মানুষের ক্ষেত্রে তা কম নয়। যে কোন মানুষ, যত অ শিক্ষিতই হোক, ভ্রমণকাহিনীর কাছে তার তিনটি দাবি জানাবার অধিকার আছে: (১) তথ্যের নিখুঁত বর্ণনা; (২) তথ্যের অর্থের সযত্ন বিশ্লেষণ; এবং (৩) যে ভাবে তথ্য ও তার লক্ষ্য যুক্ত হয়ে আছে তাকে বোঝার কিছুটা চেষ্টা। অবশ্য নানা দক্ষতার মাত্রা অনুযায়ী এ দাবি মেটানো হবে, কিন্তু যে বিবরণে এসব তথ্যের একটিও উপেক্ষিত হয়েছে তার পক্ষে কৃতিত্ব লাভ করা অসম্ভব হবে।

এরকম পর্যায়ে পৌঁছনো কোন রচনার পক্ষে আদৌ সহজ নয়। বিদেশী জন্ম ও সংস্কৃতির জনগণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত দীপ্ত উৎসাহ না থাকলে খুব অল্প বস্তুই আমাদের অনুভূতিতে সাড়া দেবে। এই অনুভূতি আমাদের শুধু ভুললে চলবে না, সে ভোলার অস্তিবাচক অর্থও আমাদের খুঁজে পেতে হবে। সারা পৃথিবীতে সমাজ টিকে থাকে তার সদস্যদের সৌভ্রাত্র ও নিঃস্বার্থপরতার গুণে, তাদের বিদ্বেষ এবং পারস্পরিক

উদাসীনতার জন্য নয়। জৈবিক ক্ষেত্রে যা ঐক্য, নৈতিক ক্ষেত্রে সত্য হল ঠিক সেই বস্তু। অতএব, কোন জাতি কৃতজ্ঞতা, সততা বা ভদ্রতা জানে না, এ কথা বলা নিরর্থক এবং তাতে দর্শকরূপে নিজের অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়। এ কথাটা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য যে, তাদের ঐ সব অনুভূতির প্রকাশের ধরন আমাদের মত নয়, তার পথ আলাদা। একটা ছোট্ট উদাহরণ আমার মনে আসছে। যেহেতু ভারতীয় ভাষাগুলিতে 'প্লিজ' বা 'থ্যাঙ্ক্স্'-এর কোন প্রতিশব্দ নেই, অতএব ইংরেজ জনগণ সকলেই ধরে নেয় যে, ছোট ছোট কাজের জন্য কৃতজ্ঞতা জানানোর সৌজন্য ভারতীয় জীবনে স্থান পায় না এবং এরকম ক্ষেত্রে স্পষ্ট উপেক্ষাজনিত বিরক্তি অন্যদের মত আমিও অনুভব করেছি। কিন্তু একদিন এক হিন্দু বন্ধু আমার জন্য এমন এক কাজের দায়িত্ব নিলেন যার সঙ্গে তাঁর স্বার্থত্যাগ জড়িত ছিল, আমিও তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। সেদিন আমার শিক্ষা হল। সে কাজের ফল যে কি অদ্ভুত হয়েছিল তা আমি কখনও ভুলতে পারব না। তিনি ঘর থেকে যেতে যেতে গভীর বেদনার সঙ্গে বললেন, 'তুমি আমাকে এর প্রতিদান দিলে!' আজ যদি কোন হিন্দু আমায় 'প্লিজ' বা 'থ্যাঙ্ক্স' বলেন তাহলে সন্তানের কাছে অভিনন্দন-পাওয়া মায়ের মত আমার অনুভূতি হয়। 'উদাহরণটি ছোট, কিন্তু এতে বোঝা যায়, শত শত ক্ষেত্রে মানব-প্রকৃতির প্রতি একটু ধৈর্যশীল ও বিশ্বাসী হলে আমাদের প্রকাশভঙ্গী ও সহানুভূতির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়।

বৃহত্তর ক্ষেত্রে এ সত্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। নিজের জাতীয় প্রথাকে আদর্শ বলে ধরে নিয়ে তার সাহায্যে সব দেশকে বিচার করা একেবারে অবাস্তব। হিন্দু ও মুসলিম স্ত্রীলোকদের প্রকাশ্যে কেনা কাটা করতে বা বেড়াতে দেখা যায় না। আমাদের দেখা যায়: আমরা আমাদের প্রথা অনুযায়ী চলি এবং একে বলি স্বাধীনতা। এতে কি বোঝা যায় যে প্রাচ্য স্ত্রীলোকের এই নিয়ম নিয়ে অভিযোগ রয়েছে? এটা বোঝাতে গেলে যে দৈহিক ও মানসিক পরিবেশে তার অভ্যাস গড়ে উঠেছে সেটার যত সম্ভব ভাগ নেওয়া কি বুদ্ধির হবে না? এটা বোঝা যায় যে, এর পর আমরা বলব, ভারত ও পারস্যের আবহাওয়াতেও আরো দৈহিক পরিশ্রম ও সামাজিক স্বাধীনতায় মেয়েরা উপকৃত হবে; কিন্তু আমাদের বিচার বুদ্ধি যদি মারাত্মকভাবে কুসংস্কারাচ্ছন্ন না হয়, তা হলে পাল্টা এই ধারণাও আমাদের হওয়া উচিত যে, স্থিরতার শক্তি ও ধ্যানের প্রশান্তি পাশ্চাত্যের পক্ষে বিরাট লাভজনক।

কিন্তু তর্ক থেকে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের চারণ কবিরা সমালোচক ও নীতিবাদী হয়ে পড়েছেন। হায়! এ ধারণা করতে আমরা বাধ্য, কারণ অধিকাংশ কবিরা এখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, বীণায় সুর তুলে কোন অচেনা রাজার ঘরে মিষ্টি গান গাওয়া এবং সোলদান থেকে প্রত্যাগত সেণ্ট ফ্রান্সিসের মত প্রসন্ন অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তার কাহিনী নিয়ে অথবা শান্তস্বভাব বিধর্মী জনগণের সৌজন্য ও বিপুল বদান্যতার প্রশংসায় নতুন গান গাওয়া তাঁদের উদ্দেশ্য নয়। বস্তুতঃ শ্রীমতী ক্লারা অ্যানি স্টিলের ভঙ্গী এইরকম, কিন্তু এই অদ্ভুত, দুর্বোধ্য প্রতিভাময়ী গায়কদলের কেউ নন। তাঁর গল্পগুলি চারণ কবির মনোভাবের যথার্থ উদাহরণ, এতে যে প্রকৃতি

ধরা পড়ে সে ভাল না বেসে পারে না, অন্যের সৌন্দর্য সম্বন্ধে আন্তরিক আনন্দে গান গায়। কিন্তু শ্রীমতী স্টিল অন্য যুগ ও অন্য শ্রেণীর বলিষ্ঠ কবি। আজকের কাং-গায়করা তাদের পিতাদের পথ অনুসরণ করে ধর্মপ্রচারক হয়েছে এবং যা অসম্ভব তা সম্ভব করার জন্য সব শক্তি নিয়োগ করেছে, তা করতে গিয়ে যে সব কাব্য, পুরাণ, প্রথা, বিরল, সুন্দর গুণাবলী বোঝার মত জ্ঞান তাদের নেই সেগুলি নষ্ট করছে। অনেকবছর আগে ঠিক এরকম ঘটেছিল যখন রোমের দূত আমাদের আইরিশ সংস্কৃতি নষ্ট করেছিল পাছে ওদের ধর্মে আঘাত লাগে। গত শতাব্দীতে আবার এরকম ঘটে-ছিল যখন কার্কদের প্রচেষ্টায় স্কটিশ হাইল্যাণ্ডের সব লোক-কাহিনী নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, এখন কার্করা এত উন্নত যে ওদের এই বর্বরতার সঙ্গে কোন মিল নেই; কিন্তু বুনো গাছ নতুন করে বসানো যায় না। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় এত ক্ষতি কখনো হয় নি এবং সম্ভবতঃ সেই কারণই নরওয়ের জাতীয় শক্তির উৎস।

কারণ, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, কোন সম্প্রদায়ের সব শিল্প, সূক্ষ্ম আনন্দ এবং কল্পনার উন্নতি যখন গোঁড়ামিতে পরিণত হয়, একটি ভাবধারায় নিজেদের আবদ্ধ করে, বিদেশী ভাবধারায় বাঁধা পড়ে, তখন তার ফল হল সংস্কৃতির বিলোপ। তাই বাষ্পীয় কারখানা, সোজা সোজা রাস্তার মুখে পড়ে, বোর্ড স্কুল ইন্স্পেক্টরের সম্মুখীন হয়ে মে-দিবসের উৎসব পালিয়ে গেছে। কিন্তু যাদের সে রেখে গেছে তারা এর জন্য বেশী নয়, কম শিক্ষিত হয়ে পড়েছে। ইউরোপীয় রাজধানী ও তার স্থানের তালিকার দ্বারা তাদের প্রকৃতি প্রেম, সৌন্দর্য ভোগ, রূপ ও রঙের ক্ষতি কখনো পূর্ণ হবে না।

অল্পদিন আগে এক আগ্রহী সমালোচক ত্রিশ বছর আগের সঙ্গে এখনকার ইংল্যাণ্ড দর্শনের তুলনা করে বলেছিলেন, আগে প্রচলিত বহু চরিত্র এখন আর নেই। এখন আমাদের মিঃ পিকউইক বা মিসেস পয়জারের মত চরিত্র খোঁজা বৃথা। আমরা জাতীয় চরিত্রকে গড়ে তুলেছি, শেষে তা তার আদর্শ,—গজকাঠি ও দৈনিক সংবাদ-পত্রের মত একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। এক প্রজন্ম আগের সেই সব অদ্ভুত, খামখেয়ালী, প্রীতিকর, হঠকারিতা আর মানবিকতায় ভরা লোক, নিমেষে নিমেষে যাদের মানসিক দীপ্তির আশ্চর্য রূপ দেখা যেত, তারা চলে গেছে। তারা অন্য যুগের, অন্য দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ। তারা এমন সময়ের লোক, যখন বর্তমানের চেয়ে প্রতিটি মানুষ জীবনের, চষা ক্ষেতের গন্ধের অনেক কাছাকাছি ছিল, শহরে মে-দিবস 'মিডসামার্স নাইট' বা 'অল হ্যালোজ ইয়েন'-এর মত এদেরও অস্তিত্ব নেই। এরকম ঘটনায় আমরা খুশী না দুঃখিত? অন্যত্র এ ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে আমরা কি উৎসাহ দেখাব?

২

ধর্মপ্রচারকরা যদি সাধারণভাবে এরকম সামাজিক ঘটনার 'অসারতা' বুঝতে পারত, তাহলে নিশ্চয় তারা তাদের মক্কেলদের সঙ্গে ব্যবহারে আরো কম ভুল করত, এখন যে তথাকথিত সমালোচনা ইংরেজী ভাষাকে অপমানিত করছে, তাও আমরা কম শুনতাম।

এক হিন্দু পিতা আমায় বলেছেন, দুজন ইংরেজ মহিলা পরিচালিত এক স্কুলে

তাঁর বালিকা কন্যাকে পড়তে দিয়েছিলেন। আট-নমাস পরে তিনি তার পড়ার রীতি পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখে আতঙ্কিত হলেন যে, মেয়েটি প্রচুর সংখ্যায় কুৎসিত বিশেষণ শিখেছে এবং রাম ও কৃষ্ণের নামের সঙ্গে সেগুলি যথেচ্ছ ব্যবহার করছে। রাম ও কৃষ্ণ মহাকাব্যের দুই নায়ক, অধিকাংশ হিন্দু তাঁদের বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের মত ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করে। তখনি তিনি মেয়েকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিলেন; আমাদের অনেকের মনে হবে, এর পর যে ঘৃণা ও অবিশ্বাসের মন নিয়ে তিনি তাঁর ইংরেজ বন্ধুদের কথা ভাববেন, তা খুব ন্যায্য। কারণ, ঐশ্বরিক ব্যক্তিরূপে রাম ও কৃষ্ণের পূজা সম্বন্ধে যা-ই মনে হোক —আমাদের মত সম্প্রদায়, এ বিষয়ে আমাদের ধারণাও তত বিভিন্ন হবে—অন্ততঃ তাঁদের জাতীয় আদর্শ বলে স্বীকার করতে হবে, আমরা যাকে সভ্যতা ও নীতি বলি, তার আশা ও কল্পনার মিলিত সম্পদের অভিভাবক বলে তাঁদের স্বীকার করতে হবে। এটা খুব স্পষ্ট যে, এই কিংবদন্তীর নায়কদের কার্যকলাপ যদি স্বীকৃত হত, তাহলে ধর্মপ্রচারকরাও মহৎ মানুষের তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টা করত, তাহলে খ্রীষ্টধর্মের প্রতিষ্ঠাতা একেশ্বরবাদী মতের অনুসরণে অনেক কিছু তারা অক্ষত রাখত এবং এর দ্বারা সামাজিক একতা ও মৈত্রীতে সাহায্য করত। এমন হতে পারে যে, এই বিশেষ ক্ষেত্রে স্কুলের পরিচালিকা ইংরেজ মহিলাদের দোষ ছিল না, দোষ ছিল হয়ত কোন নিম্নশ্রেণীর খ্রীষ্টান ভৃত্য বা ইউরেশীয় ছাত্রীর। কিন্তু তা যদি হয়, তাহলে আরো বোঝা যায় যে, ভারতে খ্রীষ্টধর্মের উদ্দেশ্য সামাজিক একতা নয়, বরং তার বিপরীত। কারণ, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির অন্যতম কাজ হল, অনুগতদের চারদিকের জীবনের মহৎ গঠনশীল শক্তিগুলির সঙ্গে যুক্ত রাখা। মুক্তিবাহিনীর দোষ যাই থাক, তারা এখানে এই কাজ করে। তারা যে সব গুণের স্বীকৃতি দেয়, সেগুলি হয়ত প্রাথমিক—ভদ্রতা, সততা, প্রসন্নতা ইত্যাদি—কিন্তু আমরা সবাই এ সব গুণকে স্বীকৃতি দিই। যে সব স্ত্রী-পুরুষের কাছে এরা এদের কর্মীদের নিয়ে আসে, তারা হয়ত অমার্জিত, বৈঠকখানার উপযুক্ত পালিশ হয়ত তাদের থাকে না, কিন্তু চিন্তাধারা ও আদর্শ যতই সীমিত হোক, তারা সৎ, আন্তরিক, বলিষ্ঠ, হৃদয়বান নাগরিক হওয়ার জন্য তারা চেষ্টা করে। সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে কোম্‌তিজম্ একই কাজ করে। এই সম্প্রদায় তার সদস্যদের বড় বড় আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীতে আবদ্ধ করে, নিম্নস্তরের গোষ্ঠী, দলের বদলে পৃথিবী ও জাতি গড়ে তোলে, কিন্তু সেই একই পথে স্বীকৃত গুণের ওপরে জোর হয়—সত্যের জন্য গভীর বুদ্ধিভিত্তিক অনুরাগ এবং মানবিক সহানুভূতির ব্যাপকতম বিস্তার—চরিত্র ও আদর্শে এই গুণগুলির তারা বিকাশ ঘটায়।

যে গোষ্ঠী এ কাজ করতে পারে না, যে ধর্ম মানুষকে বলে যে, এ পর্যন্ত যা সে ঠিক বলে জেনেছে তা আসলে ভুল, সে গোষ্ঠী সামাজিক অন্যায় ঘটাবেই—অচিন্তনীয় সামাজিক ক্ষতি—কারণ, শিক্ষার্থী প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায় যে, এতদিন সে যা ভুল ভেবেছে, তা আসলে ঠিক। সেইজন্য ভারতে খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে মদ্যপান দেখা দিলে অবাক হওয়ার কিছু নেই এবং যারা পারে তারা খ্রীষ্টান ভৃত্য না রেখে অন্য ধর্মের ভৃত্য রাখতে চায়।

ভারতের নিজের বড় বড় ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারক এসেছেন, বার বার,

একের পর এক, অগণ্য সংখ্যায়। এমন কোন ত্রুটি নেই, যা তাঁরা সরাবার চেষ্টা করেন নি। উনবিংশ শতাব্দীতে সতীর বিরুদ্ধে রামমোহন রায় যে লড়াই করেছিলেন, চতুর্দশ শতাব্দীতে নানকের উৎসাহ তার চেয়ে কম ছিল না। আমাদের মধ্যে শিশুহত্যার শত্রুতায় বেঞ্জামিন উয়োর চেয়ে ঐ শিক্ষকের উৎসাহ কম ছিল না। বাংলার নদীয়ার চৈতন্যের মত আমাদের সমাজতান্ত্রিক বন্ধুরা সাম্যের জন্য প্রাণপণে কাজ করতে পারেননি। এই মানুষরা সামান্য স্বপ্নবিলাসী মাত্র ছিলেন না। নানক শিখজাতি গড়ে তুলেছিলেন, আজো তার প্রবল প্রভাব রয়েছে। তখনকার জীবিত যে কোন লোকের চেয়ে অনার্য জাতিগুলিকে হিন্দু করার কাজ চৈতন্য বেশী করেছেন। জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকরা কি এদের সঙ্গে এক সারিতে স্থান নিতে চান? যদি চান, তাহলে ধর্মের যে ভাবধারাই তাঁদের ভাল লাগুক, তাঁরা যেন ভারতের জীবন ও প্রচেষ্টার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন। তাঁরা এ দেশকে এমনভাবে ভালবাসুন, যেন এখানে তাঁরা জন্মেছেন, শুধু সেবা করার ও রক্ষা করার প্রবল বাসনা ব্যতীত আর কোন পার্থক্য থাকবে না। তাঁরা যেন ভারতের ভাবধারা ও রীতিনীতির অনুরাগী ভাষ্যকার হন, ভারতের আদর্শ অন্যদের বুঝিয়ে দেওয়ার সঙ্গে ভারতের কাছেও তা তুলে ধরুন। যখন কেউ জাতির আদর্শের গোপন পথ খুঁজে পাওয়ার ও অনুসরণ করার মত অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে, তখন অন্যরা তার শিষ্য হতে বাধ্য, কারণ তারা তার উপদেশে নিজেদের চরম লক্ষ্যকে খুঁজে পায়; যে লক্ষ্যে সে এদের নিয়ে চলেছে তাকে সে যে কোন নামে ডাকতে পারে—নাম নিয়ে তারা মাথা ঘামাবে না। বস্তুতঃ এদিক থেকে দেখলে ভারত এখনি বোধ হয় খ্রীষ্টান, কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রচারের প্রতি তার পরিপূর্ণ উদাসীনতা ও প্রতিরোধ প্রচুর মাত্রায় রয়েছে।

যে শিষ্যদের প্রথম পাঠাবার সময়ে টাকা, অতিরিক্ত পোষাক নেওয়ার বিষয়ে অত সতর্ক করা হয়েছিল, দেখলে অদ্ভুত লাগে যে, তারা মার্জিত ইউরোপীয় জীবনের সব আরাম তো উপভোগ করছেই, উপরন্তু জনগণকে তাদের অতিরিক্ত সরলতা ও আদিমতার জন্য ঘৃণা করছে। এটা আরো অদ্ভুত, কারণ ওদের প্রভু যদি তাঁর সিরীয় জাতির সব অভ্যাস ও ভাবধারা নিয়ে ওদের দরজায় আসতেন, ওরা নিশ্চয় তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাত এবং তিনিও শিষ্যদের চেয়ে তাদের ভারতীয় প্রতিবেশীদের কাছে বেশী সহজ হতে পারতেন। তিনি সন্ন্যাসী ভিক্ষুক ছাড়া আর কি ছিলেন, এরকম ভিক্ষুক আমরা রোজ ভারতের পথে পথে দেখি। কিভাবে তাঁর খাবার আসত? চাঁদা তুলে, দানের মাধ্যমে? তিনি কি গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন না, রাতে কোন কুঁড়ে ঘরে বা কোন সাধারণ বাড়ীতে আশ্রয় নিতেন না? জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কি তাঁর যোগ ছিল? পর্বতে, বাগানে দীর্ঘ রাত্রি তিনি প্রার্থনায় আর ধ্যানে কাটাতেন। আমরা আমাদের ধর্মীয় শিক্ষকদের প্রাচ্যে পাঠাই দিন রাত পার্থিব, সুখস্বাচ্ছন্দ্যে যাদের মধ্যে থাকার জন্য তারা আসল ঐ সহজ জীবন যাপন করে প্রচারকদের সে সত্য বোঝার বুদ্ধিই নেই, সেই ভাবে চলার ইচ্ছে তো দূরের কথা।

প্রতিটি প্রচারকের সভায় আমরা যে সমালোচনা শুনি, তার থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট আর কিছু হতে পারে না। কখনো কি আমরা এমন কোনো মহত্ত্ব দেখেছি যেখানে সকলকে মিত্র বলে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষমতা নেই? চার্লস্ ডারুইন কি করে গড়ে উঠলেন? তাঁর নিজের এবং সব জীবনের মাঝে যে এক অনন্ত প্রবাহের বিপুল স্রোত চলেছে, তা দেখে, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে এটা ঘটল। নিউটন কি করে এমন হলেন? তাঁর মন বুঝেছিল, আমাদের চালিত করছে যে শক্তি তার লীলায় পৃথিবী মহাজাগতিক ধুলার একটি কণামাত্র। এমন কি যে যোদ্ধার একমাত্র কাজ মনে হয় শত্রুতা ও বিরোধিতা, সেও শুধু বিশিষ্ট হয়ে ওঠে সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার গুণে। এমন কোন সন্ত বা কবি আসেননি যাঁর কাছে নিজের চেয়ে সব কিছু বেশী মানবিক, বেশী সুন্দর নয়। এরকম লোকের পক্ষে নিন্দা করা কঠিন, হত্যা অসম্ভব। কুৎসা রটনার দ্বারা উদ্ভূত বিচিত্র যে অনুভূতি, তা সে ব্যক্তির হোক অথবা জাতির, বিকেলের চায়ের আসরে হোক অথবা গীর্জার বেদীতে, তাঁদের কাছে অকল্পনীয় বর্বরতা বলে মনে হবে। তাঁরা এরকম পরিবেশে নিশ্বাস নিতে পারবেন না। তবু দূর দেশে আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য যারা জীবন দিয়েছে তাদের মধ্যে কিছুটা সন্তের মত, কিছুটা কবির মত স্বভাব দেখার আশা আমরা নিশ্চয় করতে পারি। সৎ উদ্দেশ্যে সাধকপ্রকৃতি নিশ্চয় দেখা যায়। মহৎ কাজে কি তাঁদের দেখা গেছে?

যদি দেখা গিয়ে থাকে, তাহলে এই দূতরা যাদের মধ্যে ছিলেন তাদের জন্য ভালো কথা এত কম বলেন কেন? যেমন, স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, এঁদের কাছে ভারতীয় স্ত্রীলোকের শক্তি ও গুণের কথা আমরা কখনো শুনি না কেন? শুধু দোষ আর ব্যর্থতার কথা শুনি?

যেখানে লোক এত অজ্ঞ যে তাদের কিছু বুঝিয়ে দেওয়া যায় জোর করে, সেখানে কেন প্রচারকরা এই গল্প তৈরী করেছেন যে, গঙ্গার তীরে মায়েরা বাচ্চাদের এনে কুমীরের মুখে তুলে দেয়? সর্বত্র আমি দেখেছি লোকে এ গল্প বিশ্বাস করেছে এবং একজনও সত্যের সাধকের কথা শুনি নি, যে এ ধারণাকে ঠিক করার চেষ্টা করেছে। দারিদ্র্য ও দায়িত্বের চাপে ভারতে শিশুহত্যা ঘটে, যেমন সব দেশে হয়; কিন্তু তার বেশী এ রকম ঘটে না, এটাকে কেউ ধর্মীয় কাজ বলেও মনে করে না; আমাদের মধ্যে এ কাজ যত প্রচলিত ভারতে বোধ হয় তাও নয়। শিশুর সংকারের খরচ যখন মাত্র ২ পাউণ্ড, তখন ৫ পাউণ্ড দিয়ে তার জীবনবীমা করার প্রথা নেই, যার ধৈর্যচ্যুতির ফলে শিশু মৃত্যুও এদেশে ঘটে না।

কেন আমরা প্রচারকদের কাছে কখনো হিন্দুর গৃহজীবনের সৌন্দর্য, ভারতীয় নারীদের প্রেরণাস্বরূপ অপূর্ব আদর্শ, কাব্য ও মাধুর্যে মণ্ডিত ভারতীয় প্রথার কথা শুনতে পাই না?

এর উত্তর কি এই যে, ভাবী দর্শককে অন্ধ করে রাখে পূর্ব-নির্ধারিত ধারণা, না কি সে বুদ্ধিতে এত অজ্ঞ যে, জানে না কি দেখার আছে কিছু না? অথবা, এর কারণ কি আরো হীন, সে কি এই ধারণা সে, যথার্থ ও উন্নত মনোভাব

গ্রহণ করলে তার নিজের জীবিকা-নির্বাহের মত অর্থ আসবে না? তিন শ্রেণীর লোকের বক্তব্য শোনার সুযোগ আমার হয়েছে, তাঁদের ভারতীয় জনগণের ঘনিষ্ঠ ধর্মীয় বন্ধু বলে মনে করা হয়, শিক্ষাব্রতী প্রচারক, মহিলা চিকিৎসক এবং আধুনিক সাধক। তাঁরা হিন্দু জীবন সম্পর্কে যা মনে করেছেন, তা তাঁদের বক্তব্যে আন্তরিক ও স্পষ্টভাবে বলেছেন। ভারতীয় সমাজ যে সব সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান করেছে তার প্রশংসা অথবা ঐ দেশের সফল প্রগতিকে বুঝতে পারার একটু ইঙ্গিত শোনার বৃথাই অপেক্ষা করেছি। সব সময়ে মনে হল, ওদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, বক্তার নিজের ধর্মের মর্যাদা ও আশা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে অন্যান্য মানুষদের শূন্যতা ও হীনতা প্রমাণ করার উপরে। শেষোক্ত বিষয়টি থেকে সহজে রেহাই পাওয়া গেল। ওটা সীমিত ছিল সতীদাহ, শিশুহত্যা ও ঠগী প্রথার আলোচনায়, ভারতীয় অভিজ্ঞতার সবচেয়ে স্পষ্ট উপাদানরূপে এগুলিকে পাওয়া গেছে; আলোচনায় জাতিভেদের নিকৃষ্টতম দিকের কথাও উঠল এবং এই মত প্রতিষ্ঠিত হল যে, প্রাচ্যের প্রতি পাশ্চাত্যের দায়িত্ব সেদিন পালিত হবে, যেদিন সে প্রাচ্য জনগণকে 'জঘন্য পুরনো অভ্যাস' ছাড়িয়ে ধর্মবাদীদের মতে যা যৌক্তিক সেই পথে আনতে পারবে। মহিলা চিকিৎসকদের কাছে আমরা ভারতীয় গ্রামের ওষুধ ও অস্ত্রোপচার-সংক্রান্ত অজ্ঞতার কথা শুনতে পাই—যদি ওদের কথা ঠিক হয়, তাহলে পঞ্চাশ বছর আগে ইংল্যাণ্ডে এই সংখ্যক লোকের যা অজ্ঞতা ছিল, এদের অজ্ঞতা তার চেয়ে বেশী। এঁদের কাছে সবচেয়ে আপত্তিকর প্রথার অন্যতম হল, শিশুর জন্মের সময়ে স্ত্রীলোকদের আলাদা করে রাখা। এ প্রথার অর্থ যাই হোক—শুরুতে যে কারণে এরকম করা হত, সম্ভবতঃ এখন সর্বত্র সে বিষয়ে পূর্ণ সচেতনতা নেই—তবু এর থেকে হিন্দু ইতিহাসের কোন অতীত যুগের চিকিৎসাবিদ্যার অতি উন্নত অবস্থার ইঙ্গিত স্পষ্টতঃ পাওয়া যায়। যে ঘরে শিশু জন্মায় সে ঘর পরে ভেঙে ফেলা হয়। সেইজন্য বাড়ীর বাইরে একটা সাধারণ মাটির ঘর তৈরী করা হয়। একবার শিশুর জন্ম হলে আর কিছুদিন মার সঙ্গে বাড়ীর কেউ দেখা পাবে না। শুধু একজন বৃদ্ধা সেবিকা এবং কোন চিকিৎসক তার পরিচর্যা করে।

তাহলে এই ব্যবহার কি এতই অমানবিক? অথচ প্লেগ বা অন্যান্য সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রে হিন্দুরা এরকম করে না বলে আমরা তাদের দোষ দিই। অবশ্য এ কথা ভাবা সহজ যে, এই ধরনের নিয়ম প্রায়শঃ ভুল ভাবে, বোকার মত প্রয়োগ করা হয়; তবু কোন সন্দেহ থাকে না যে, গোড়াতে এর মধ্যে ছিল জীবাণু-সংক্রান্ত অতি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ চিন্তাধারা। স্নান করার জাতিগত সব নিয়মের মধ্যে অনুরূপ বৈজ্ঞানিক ভাবধারা রয়েছে, যার স্বাস্থ্যরক্ষার আগ্রহ দেখে যোগ্য দর্শকরা অবাক হয়। অবশ্য দুঃখের কথা যে, সর্বত্র চিকিৎসাবিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর লণ্ডনের মান অনুযায়ী নয়; কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভারত ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ারল্যাণ্ডের চেয়ে অনুন্নত নয়। রেলপথ থেকে দূরে, প্রাচীন প্রথার অনুগামী যে সব গ্রামীণ জেলার মানুষরা বোর্ড স্কুলের শিক্ষার অতুলনীয় উপকার পায় না, সেখানে এমন চিকিৎসা

হয়, যা দেখতে শহুরে হাসপাতাল ও লণ্ডনের ডাক্তাররা অরাজী হবেন না। কিন্তু এ সত্য অজ্ঞতাজাত (অথবা সহজাতও হতে পারে); এর কারণ খ্রীষ্টধর্মের অন্যায্য, অসৎ প্রকৃতি নয়। এর জন্য মাঝে মাঝে আমরা দুঃখ করি, কখনো প্রশংসাও করি, কিন্তু কখনো এতে আমাদের বিদ্বেষ বা ঘৃণা জাগায় না। আমাদের বর্তমান শিল্প সভ্যতার অন্যতম দোষ হল, প্রথা ও সহজাত বুদ্ধির মূল্য বোঝার অক্ষমতা। ভারতীয় গ্রামের ওষুধ, ধাত্রীবিদ্যা ইত্যাদিতে দোষ বার করা সহজ; কিন্তু সাধারণ দৈহিক বুদ্ধির বিরাট সৌন্দর্য ও সাবলীলতা এবং সবরকমে চর্মরোগ থেকে মুক্ত থাকার কি যুক্তি আমরা দেখাব?

এমন দেশে এটা ঘটেছে যেখানে জঙ্গলের পশু বাঘ, সাপ ইত্যাদির মত বিপজ্জনক হল জীবাণু। এসব যুক্তি দেখাতে গিয়ে আমি আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য করার ক্ষমতাকে অস্বীকার করছি না, শুধু বলছি যে, গ্রামের সংগীতকে ঘৃণা করার তার অধিকার নেই।

অবশ্য এক পদ্ধতি অন্য সব পদ্ধতিকে অবিশ্বাস করে। এ হল দলগত কুসংস্কার। মাঝে মাঝে যে চিকিৎসক প্রচারকরা বলেন যে, বেশ স্বচ্ছল লোকেরা বলে থাকে নিজের স্ত্রী বা তার বাড়ীর কোন মহিলা সম্পর্কে, 'ওকে যদি কুড়ি শিলিং-এ (আনুমানিক দশ টাকা) সারাতে পারেন, তাহলে সারান,'—তার কারণ, এই কুসংস্কার। তখনি মহিলা চিকিৎসকের খ্রীষ্টীয় উদারতা এই ধারণা ক'রে নেয় যে, তার মক্কেলের কাছে নিজের স্ত্রী বা মায়ের স্বাস্থ্যের কোন মূল্য নেই। সুতরাং অধিকাংশ হিন্দু পুরুষ এরকম উদাসীন। এবং অধিকাংশ হিন্দু পুরুষ হিন্দু স্ত্রীলোককে ঘৃণা করে।

ধরা যাক, এ গল্প সত্য, তাই এ প্রশ্ন তুলছি, এর চেয়ে অবান্তর সিদ্ধান্ত হতে পারে? চিকিৎসকের এ কথা মনে হয় না যে, যে পুরনো, পরীক্ষিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে সকলের আস্থা আছে তার বদলে তার জ্ঞান বা সততাকে লোকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারে।

অন্যান্য আরো ব্যাপক অভিযোগ নিয়ে বিশদ আলোচনা করা অসম্ভব। প্রচারকদের চোখে জাতিভেদ নির্জলা অন্যায়। এ প্রথায় ব্যবসায়ী সংঘ ও সম্প্রদায় রক্ষার দিকগুলিকে উপেক্ষা ক'রে সে তার খারাপ দিক, বাধা নিষেধের বিবরণে নিজেকে সীমিত রাখে। ভারতে তাদের জীবনের প্রতিক্ষণ যখন সাম্রাজ্যবাদী যুগের সবচেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা, সাম্প্রদায়িক সম্মানের নতুন গোষ্ঠী হয়ে দেখা দিচ্ছে তখন তারা এই সব কথা বলে। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি যদি হিন্দু হতাম, তাহলে প্রচারকদের জ্যাতিভেদ-প্রথার সমালোচনা আমায় বেশী বিচলিত করত না। আমি বুঝতাম যে, এই বৈশিষ্ট্য আমাদের দেশের জীবনের রূপ এবং ইউরোপে 'সম্মান' কথার যা অর্থ এরও অর্থ তাই; আর আলোচ্য সমালোচকদের দেখে এখনো বোঝা যায়নি, তারা নিজেদের অথবা আমার সমাজকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেছে। ওদের যে কথাটায় আমি সত্যি বিরক্ত হতাম, তা হল ভারতের স্ত্রীলোক সম্বন্ধে ওদের সমালোচনা। এ সমালোচনা যে খুব ক্ষতিকর হ'তে পারে, তার প্রমাণ দিতে শুধু বলব যে, আমি একটা বক্তৃতা

শুনেছিলাম, তাতে তেরোটা বিবৃতি দেওয়া এবং সমর্থন করা হয়েছিল : (১) হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থায় মেয়েদের সম্মান করার ভান করা হয়, কিন্তু এ সম্মান যতটা দেখানো হয় ততটা সত্য নয় ; (২) ভারতে মেয়েদের ইচ্ছাপূর্বক অজ্ঞ রাখা হয় ; (৩) ভারতে স্ত্রীলোকেরা স্বামীর সাহায্য ছাড়া স্বর্গে স্থানলাভ করতে পারে না ; (৪) তাদের ক্ষেত্রে বৈদিক মন্ত্রসহযোগে কোন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান করা হয় না ; (৫) কিছু অদ্ভুত, প্রাচীন কবিতা, যা প্রবাদপুস্তকের 'অপরিচিতা নারীর' সাবধানবাণীর সঙ্গে তুলনীয়, সাধারণভাবে স্ত্রীলোকদের প্রতি হিন্দু পুরুষের মনোভাবের প্রতীক ; (৬) মেয়ে জন্মালে কোন অভ্যর্থনা পায় না ; (৭) পুত্রের জন্ম দেওয়ার জন্য মায়ের উদ্বেগ ভয়ঙ্কর, তার স্ত্রীত্ব এর ওপরে নির্ভর করে ; (৮) ভারতে শিশুকন্যা হত্যা সাধারণ ঘটনা ; (৯) কুলীন ব্রাহ্মণ বিবাহপ্রথা প্রামাণিক সত্য ; (১০) যে বাবা-মা মেয়েদের বিবাহ দিতে পারে না, তারা তাদের দেবতার সঙ্গে বিবাহ দেয় (তাদের গণিকা ক'রে তোলে) বিকল্প হিসাবে ('সমগ্র হিন্দু নারীসম্প্রদায়ের অবনতির কারণ হল, তারা যে কেউ দেবদাসীর জীবনে চলে যেতে পারে'), (১১) হিন্দু বিবাহপদ্ধতি আশ্চর্য স্থূল ; (১২) হিন্দু বিধবা এমন দুঃখ ও অপমানের জীবন কাটায় যে আগুনে পুড়ে মরা তার চেয়ে বোধ হয় ভাল ; (১৩) হিন্দু বিধবা প্রায় সর্বত্র চরিত্রহীন।

এরকমভাবে এর এই জবাব দেওয়া যায় :

১। নিশ্চয় দ্রষ্টার যোগ্যতা ছিল না। হিন্দু পুরুষ ও তার মায়ের মত মহৎ সম্পর্ক মানবজীবনে খুব কমই আছে। হিন্দুরা হ্যামলেটের গর্ট্রুডকে ভর্ৎসনা ও ক্ষমা করতে পারে না। সব শোনার পরেও ওরা বলে 'কিন্তু সে যে ওর মা' ; এই ছোট্ট কথাটুকু খুব গুরুত্বপূর্ণ।

২। দ্রষ্টার অযোগ্যতা আবার প্রমাণিত হ'ল। স্পষ্টতঃ এখানে অজ্ঞতা অর্থে নিরক্ষরতার কথা বলা হয়েছে। মেয়েদের ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ রাখা হয়, এ কথা সত্য নয় ; কিন্তু তাই যদি হয়, তাহ'লে তাদের সংসার চালনা এবং রান্নার জ্ঞানের কি কোন দাম নেই ? তাদের শিক্ষিত সাধারণ জ্ঞান কি অর্থহীন ? কোন স্ত্রীলোক যদি শুধু পড়তে লিখতে না পারে, অথচ বড় বড় মহাকাব্য ও পুরাণের সাহিত্য-সংস্কৃতিতে শিক্ষিত হয়, তাহ'লে তাকে কি অজ্ঞ বলা যায় ? এ কথাটা উল্লেখযোগ্য যে, বাংলার সবচেয়ে সুপরিচালিত জমিদারীগুলি রয়েছে বিধবাদের হাতে। উকিলরা অনিবার্যভাবে তাদের মতকে শ্রদ্ধা দেখায়। মারাঠা দেশে এর উদাহরণ ছিলেন রাণী অহল্যা বাঈ।

৩। এর অর্থ কি, আমি বুঝতে পারিনি। যদি বলা হত যে, স্ত্রীর সাহায্য ব্যতীত স্বামীর কোন স্থান নেই, তাহলে ব্যাপারটা আরো বোধগম্য হত ; কারণ, বৈদিক মতে পুরুষ বিবাহের পর এবং যতদিন দুজনে বেঁচে থাকে ততদিন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দায়িত্বশীল সদস্য থাকতে পারে।

উপরন্তু, সতীদাহপ্রথার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এই যে, স্ত্রীর আত্মত্যাগে স্বামীর স্বর্গলাভ নিশ্চিত হবে। বক্তা কি মুসলমানদের কথা ভাবছিলেন ? ওদের তরফ থেকেও এ কথার আমি প্রতিবাদ করছি।

৪। এটা একেবারে মিথ্যা বলে মনে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে উল্লিখিত কয়েকজন বড় গুরু হলেন স্ত্রীলোক। বহু শত বছর আগে ভগবদ্গীতা রচিত হয়েছিল যাতে স্ত্রীলোক ও শ্রমিকশ্রেণীসহ অশিক্ষিত লোকদেরকেও অধ্যাত্ম সত্য জানানো যায়।

৫। বক্তা বলেন নি যে, প্রত্যেক হিন্দু স্বামী নিজের স্ত্রীকে 'আমার লক্ষ্মী' বা সৌভাগ্য' বলে উল্লেখ করেন।

৬। ইংল্যাণ্ডের ও অন্যান্য পিতৃশাসিত সমাজের মত কয়েক ক্ষেত্রে এটা সত্য হতে পারে। আমি অনেক পরিবারকে জানি, যেখানে এর উল্টোটাই হয় এবং আমাদের এক্ষেত্রে আশানুযায়ী এরকম দৃষ্টিভঙ্গী অকল্পনীয়।

৭। সাধারণভাবে বলতে গেলে, হিন্দু স্ত্রীলোকের পুত্র জন্মদানের উপরে স্নেহের নির্ভরশীলতা ইংরেজ স্ত্রীলোকের চেয়ে বেশী নয়। ভারতে সর্বত্র দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে পুত্রের প্রয়োজন মেটানো যায়।

৮। কয়েক শ্রেণীর রাজপুতদের মধ্যেই শুধু একটি নির্দিষ্ট যুগে শিশুকন্যা হত্যার ঘটনা ঘটত। লণ্ডনে এ ঘটনা যতটা প্রচলিত ভারতে তার চেয়ে কোন ভাবেই বেশী প্রচলিত নয়।

৯। একই ধরনের আরেকটি উদাহরণ। কুলীন ব্রাহ্মণরা একটি বিশেষ উঁচু জাত। এই শ্রেণীর কোন মেয়ের যদি বিবাহ দেওয়া না যায়, তাহলে তার পিতা তাকে কোন পদস্থ ব্যক্তির হাতে দেন—বিবাহ হয়ত নামে মাত্র হয় অথবা হয়ত তার একবার মাতৃত্বলাভ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এটা জাতীভেদ প্রথার কুফল। তবে এরকম ঘটনা খুব কম ঘটে এবং যখন থেকে সংবাদ সরবরাহের আধুনিক প্রতিষ্ঠান সমাজের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করেছে তখন থেকে এ নিয়ম লুপ্ত হতে শুরু করেছে। একজন নেতৃস্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। আমি আরো বলতে চাই, আমার মতে এ প্রথা হীনতম উদাহরণ নয়—কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রলাভের ইচ্ছা সব দেশের পিতা-মাতারই থাকে—কারণ, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে কন্যার দৈহিক শক্তি এবং তার মাতৃত্বের কর্তব্য যোগ্যতার সঙ্গে পালনের প্রশ্ন।

১০। 'দেবতার সঙ্গে বিবাহ'-এর মনোভাব এখন উত্তরভারত ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নয়। মন্তব্যটিতেই তার আঞ্চলিক ইতিহাসের চিহ্ন রয়েছে। এ প্রথা দাক্ষিণী, সম্ভবতঃ পশ্চিমে ব্যবহৃত হয়। এখানে আমরা একটি নতুন ধরনের মানসিক ঘটনার সম্মুখীন হই—ভারতীয় গণিকাবৃত্তির প্রথা। কোন সম্মানিত হিন্দু কন্যার জন্য স্বামী না পেলে ইংরেজ ভদ্রলোকের চেয়ে অনেক সহজে তাকে গণিকায় পরিণত করে, এটা একেবারে অসত্য। এটা একেবারে অবাস্তব। বিপরীত স্বভাবের গভীর আবেগ থেকে এ শ্রেণীর জন্ম। হিন্দু জীবনের প্রধান সম্পদ হল, স্ত্রীলোকের পবিত্রতা। 'হিন্দু স্ত্রীলোকের সমগ্র সম্প্রদায়ের অবনতির মূল কারণ হল, সন্ন্যাসীর জীবন-যাপনের সম্ভাবনা।' ইংরেজ স্ত্রীলোক সম্পর্কে এ মন্তব্য যত সত্য হিন্দু স্ত্রীলোক সম্পর্কে তার চেয়ে বেশী সত্য নয়। এমন একটা জায়গা আছে যেখানে সব সুখী লোকের সামনেও জীবনের গহ্বর দেখা দেয়। কিন্তু সেটা সীমিত ক্ষেত্রে।

কোন হিন্দু স্ত্রীলোক যদি একবার সংসার ফেলে চলে যায় শাশুড়ী বা স্বামীকে না জানিয়ে এবং তাদের অনুমতি না নিয়ে তাহলে তাকে হয়ত আর ঢুকতে দেওয়া না হতে পারে। কিন্তু এটা নৈতিক বোধের কঠোরতার প্রমাণ, শিথিলতার নয়।

১১। 'হিন্দু বিবাহ-পদ্ধতি অত্যন্ত স্থূল।' যে লোকেরা স্থূল নয় তাদের অনুষ্ঠানে স্থূল নয়। যেমন, চার্চ অফ ইংল্যাণ্ড বিবাহ-অনুষ্ঠানে গাম্ভীর্য আনে, তেমন এই বিবাহ হয়ত বিকেলের চায়ের আসরের আবহাওয়ার চেয়ে জীবন সংগীতে আরো গম্ভীর, দায়িত্বপূর্ণ সুর যোগ করে। কোলব্রুকের 'প্রবন্ধ'-এ সব বিশদভাবে অনুবাদ করা আছে, তার সাহায্যে শিক্ষার্থী দুটি অনুষ্ঠানকে তুলনা করতে পারবে। আমি শুধু বলতে পারি যে, বহু হিন্দু বিবাহে আমি উপস্থিত থেকে সব অনুষ্ঠানের সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতায় গভীরভাবে মুগ্ধ হয়েছি। অন্দরমহলে তরুণ বরকে প্রচুর ঠাট্টাবিদ্রূপ করা হয়, যেরকম দেখা যায় 'অল ফুল্‌স্‌' ও 'সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্‌স্‌ ডে' নামক অর্ধ-বিলুপ্ত উৎসবগুলিতে। এই অনুষ্ঠানে বর তার ভাবী শ্যালিকাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। ওদের আনন্দ গম্ভীর বয়স্কদের পক্ষে একটু বেশী হালকা, কিন্তু হিন্দু সমাজে ছেলে ও মেয়েদের যে অল্প কয়েকটি সুযোগ দেওয়া হয়, এটি তার অন্যতম। এতে গুরুতর অপরাধ দেখতে পাবে স্থূলমনের লোকেরা।

১২। ভারতীয় বিধবাদের দুর্দশা সম্বন্ধে একথা বললে ভুল হবে না যে, প্রোটেস্টান্ট প্রচারকদের প্রতিটি মন্তব্যের মূলে আছে সত্য ঘটনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা। হিন্দু জনগণের মধ্যে মঠজীবনের আদর্শ প্রবলভাবে বেঁচে আছে। তাদের কাছে বৈধব্যজীবনের হেতু বিধবা ব্রহ্মচর্য পালনে বাধ্য, ফলে তাদের দারিদ্র্য, কঠোরতা, প্রার্থনা মেনে নিতে হয়। তাই তার জীবন হয় সন্ন্যাসিনীর মত, যদি সে শিশু হয়, তাহলে তাকে সন্ন্যাসিনীর জীবনের শিক্ষা নিতে হয়। এ কথা সত্য নয় যে, সমাজ তাকে বিতৃষ্ণা ও বিদ্বেষের দৃষ্টিতে দেখে। বরং উল্টোটা হয়। সে বিবাহিতা স্ত্রীলোকের অগ্রে স্থান পায় পবিত্রতর বলে। এই আদর্শের কঠোরতায় আমাদের দুঃখ হতে পারে, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে একবিবাহ প্রথার মত এক্ষেত্রেও নৈতিক উন্নতির তীব্রতা বোঝান যায়, তার অভাব নেই। ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ প্রথা কঠিন হতে পারে, কিন্তু মান নামিয়ে এর প্রতিকার হয় না; বরং যে নৈতিক শক্তি সে গড়ে তুলেছে তার নতুন পথ তৈরী করতে হবে।

১৩। শেষ যে বিতর্কের কথা বলেছি সেটা সবচেয়ে গুরুতর এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় প্রচারকদের বর্ণনায় বার বার ঐ কথা শুনেছি। এ কথা বলা বাহুল্য যে, এটা আমি একেবারে মিথ্যা বলে জানি।

উল্লেখযোগ্য যে, এই তেরোটি বক্তব্য তিনটি আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত: (ক) যে বক্তব্যগুলি সম্পূর্ণ মিথ্যা—(১), (৩), (৭), (১১), (১৩); (খ) যে বক্তব্যগুলি ভুল ব্যাখ্যা বা অতিরঞ্জনের ফল—(২), (৫), (১২); এবং (গ) যে বক্তব্য কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান, সময় বা শ্রেণীর ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সেগুলিকে সমগ্র হিন্দু জীবনের পরিচায়ক বলে উল্লেখ করে অপলাপ করা হয়েছে—(৪), (৮), (৯) এবং (১০)।

শেষ শ্রেণীটি দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ: প্রথমতঃ, এতে যে গুরুত্ব ও নিরাপত্তার ভাব

রয়েছে তা সমগ্র বক্তব্যটিকে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলে এবং দ্বিতীয়তঃ, এতে প্রমাণ গঠনের পদ্ধতি পুরোপুরি দেখা যায়।

(৪)—এর ক্ষেত্রে আমাদের বহু শত বছর আগের একটা পুরনো কথা রয়েছে: 'কোন্‌টা নরকের দ্বার? নারী। কি মদের তুল্য? নারী' ইত্যাদি। একে এমনভাবে দেখানো হয়েছে যেন, আধুনিক ভারতীয় প্রবাদের অতি সাম্প্রতিক সংগ্রহ এটি। আমরা দেখলেই এর উদ্দেশ্য বুঝতে পারি, কিন্তু প্রচারকরা অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই উক্তি দিয়ে যায়। যে কেউ বুঝবে যে, যাতে পৌত্তলিকদের ভুল ধারণা দেখানো হয়, তাই ওদের কাছে ঠিক, কিন্তু এই ছোট কথোপকথনটুকু খুবই অতিরঞ্জিত। আমি মেয়েদের বিষয়ে প্রচারকদের এমন কোন রচনা পড়িনি, যাতে এ প্রবাদ ব্যবহৃত হয়নি এবং এমন কোন হিন্দু দেখিনি, যে, যত শিক্ষিতই হোক, এরকম রচনা ব্যতীত এ কথা আর কোথাও শুনেছে। অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে যে, এ জাতীয় মনোভাব বৌদ্ধযুগের সন্ন্যাসীদের রচনায় দেখা যেত। আমাদের মধ্যযুগের সন্ন্যাসী-দের রচনাতেও হয়ত এর তুলনা পাওয়া যাবে। (৮) নম্বরে আমরা একটা সমালোচনা পাচ্ছি, যার সঙ্গে রাজপুত অঞ্চলের একটি শ্রেণী জড়িত, এমনভাবে বলা হয়েছে যেন, এটা ভারতের সর্বত্র সব শ্রেণী সম্পর্কে সত্য এবং এর বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হতে পারে জেনেও বলা হয়েছে। এটা আর স্পষ্ট করে বলার কিছু নেই যে, ভারত দেশ নয়, মহাদেশ; তার সীমানার মধ্যে সব জাতি ও প্রদেশের অস্বাভাবিক দোষ এবং অপরাধকে একত্র করে 'ভারত' বা 'হিন্দুধর্মের' বিরোধিতা করাটা যেন নরফোকের চাষীকে বলা যে, কর্সিকার রক্তপাতের দোষ তার এবং এটাই 'ইউরোপের' প্রথা। (ক)-তে আমরা আবার দেখছি, একটি ক্ষুদ্র, উচ্চশ্রেণীর অন্যায়কে সারাদেশের ক্ষেত্রে সত্য বলে অভিযোগ করা হয়েছে। বাঙালী জনগণের এক হাজারে একজনের বেশী কুলীন ব্রাহ্মণ হতে পারে না এবং এদের অস্তিত্ব রয়েছে শুধু বাংলাতে। হিন্দুরা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবাদ করেছে আমরা দেখছি তাও ইচ্ছা করে উপেক্ষা করা হয়েছে।

(১০)—নম্বরে আমরা দেখছি সাধারণভাবে গণিকাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে, যেন এরা ভারতীয় জনগণের সম্মানিত, স্বীকৃত জীবনের অংশ এবং এরকম শ্রেণী থাকায় ভারতীয় জনগণের নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে। প্রচারকরা সত্যিই কি এত অজ্ঞ? তাই যদি হয়, তাহলে তারা অন্ততঃ ভারতের তথ্যগুলি ভাল করে লক্ষ্য করুক। এই দেবতার সঙ্গে (অথবা বাংলায় গাছের সঙ্গে) বিবাহের প্রথা অদ্ভুত শোনালেও মেয়েদের খুব সুরক্ষিত করা হয়। কোনো হিন্দু যত অসামাজিকই হোক কুমারী মেয়েকে কলুষিত করে না। এই অসহায় মেয়েরা অতএব নিজেদের বৃত্তি গ্রহণ করার আগে বিবাহের নিয়ম পালন করতে বাধ্য হয়। তাই আলোচ্য প্রথার উদ্ভব। এরকম মন্তব্য কি আমরা নিজেদের সম্বন্ধে করতে পারি?

যদি আক্রমণটা অন্যদিকে হত; যদি হিন্দুদের স্বভাব হত আমাদের ভুল সংশোধনের জন্য দূত পাঠানো; এবং ঐ দূতরা যদি ফিরে এসে আমাদের আতিথেয়তার স্থূল সমালোচনা করত, অতিথির সম্মান ভুলে গিয়ে সারা জগতে

আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা ঘোষণা করত, ব্যক্তি হিসেবে আমাদের ব
সমালোচনা করত, যেহেতু আমাদের ঘরোয়া রূপ দেখার সুযোগ তারা পেয়েছে এ
বাহ্যিক জীবনের লৌকিকতা করা হয় নি—অর্থাৎ, তারা যদি আমাদের বিশ্বাস
করত, তাহলে আমাদের কি মনে হত? আমরা কি বলতাম? তবু ওদের এ
অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হত, যেহেতু ক্ষমতা ও প্রভাব আমাদের হাতে, ওদের হাতে ন
সম্ভবতঃ এই প্রচারকদের অপমানের মত আর কিছুর জন্য ভারতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদা
এত পার্থক্য বেড়ে ওঠেনি। সত্যি আর কিছু আমাদের বিদ্বেষকে এত তীব্র করেনি
কারণ, আমরা যাই বলি, ইউরোপীয়দের যে একমাত্র শ্রেণী হিন্দু গৃহে আ
ঢোকার অধিকার পেয়েছে এবং সেখানে যা দেখেছে তার খবর দিয়েছে, সে হ
প্রোটেস্টান্ট প্রচারক, চিকিৎসক প্রভৃতি। মনে হয়, তাদের কাছে কিছুই পবিত্র ন
সব দেশে চিকিৎসক ও পাত্রীরা গৃহের দুর্ভাগ্য দেখতে পায় এবং পেশাগত সম্মানে
জন্য মুখ বন্ধ করে রাখে। কিন্তু এখানে সব প্রকাশ্যে আনা হয়। চিকিৎসার বিব
(সর্বদা পড়তে বিরক্তি হয়) মঞ্চ ও বেদীতে প্রকাশ্যে পড়া হয়; যে পেশাগত কার
এ অসম্মান না ঘটানো উচিত ছিল, তা শুধু ব্যবহার করা হয় বড় জনসভায় প্রকা
প্রদত্ত বিবৃতিতে বক্তার নাম না ব্যবহার করে।

আরেকটা শোচনীয় ত্রুটি রয়েছে। হিন্দুধর্মের পাপ ও দুর্বলতার প্রমাণস্বরূ
প্রচারকরা প্রায়ই তিন শ্রেণীর লোকের মতামতের উদ্ধৃতি দেয়। এরা হল
(১) ভারতীয় সংস্কারক; (২) খ্রীষ্টান ধর্মান্তরিত; এবং (৩) যে কোন অসাধা
মূর্খ, যাকে পাওয়া যায়।

প্রথম ধরনের প্রমাণের কি মূল্য আমরা সবাই জানি। 'স্ত্রীজাতির অধিকার
সংক্রান্ত আন্দোলনকারী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নারীর অবস্থা তুলনা করছে, এক
ভেবে দেখুন! প্রাচ্যের এমন অধিকার ও কর্তৃত্ব-সংক্রান্ত যুক্তি আছে যা সে বুঝ
পারবে না, এ প্রস্তাব তার কেমন লাগে? তার কাছে এ কথা অসহ্য। অথচ
একঘণ্টা আগে সে হয়ত নিজের অবস্থার চরম অবনতির কথা বলছিল, যেহেতু তা
'অপরাধী, পাগল ও ভিখারী'র সঙ্গে এক নির্বাচক তালিকায় রাখা হয়েছে।
স্পষ্ট যে, উদ্বিগ্ন সংস্কারক তাঁর সমধর্মীদের মধ্যে যে ভাষা ব্যবহার করে সে ভাষা ত
দেশের প্রথা সম্বন্ধে ভাবী ব্যাখ্যাকারের মুখে শুনলে সে খুব দুঃখ পাবে। তখন সে
প্রথম বলবে যে, সে যে ভাষা ব্যবহার করেছিল তার মূল্য সম্পূর্ণ আপেক্ষিক।

যে সংস্কারক নিজের সমালোচনার কালিতে অন্ধ হয়ে বহু বছর কাটিয়েছে
কথার ক্ষেত্রে এটা আরো সত্য। আমরা জানি এক্ষেত্রে এমন তিক্ততা ও বিকৃ
দেখা দিতে পারে যা চিন্তাবিদকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে স
অর্থহীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায়।

খ্রীষ্টীয় ধর্মান্তরিতরা ভারতে তাদের ধর্মান্তরের জন্যই বিচ্ছিন্ন। বর্তমান প্রজ
জন্ম থেকে খ্রীষ্টান বলে নিজের দেশের লোকের অভ্যাস সম্বন্ধে প্রচারকদের বর্ণ
চেয়ে বেশী কিছু হয় না।

এ কথা ধরে নিলে চলবে না যে, শ্রীমতী স্টিলের মত লেখিকা অথবা ব্রহ্মদে